বেদ-বেদান্ত

পূর্ব খণ্ড

মহর্ষি বাদরায়ণ বেদব্যাসকৃত

ব্রহ্মসূত্র

ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

শ্রীমহানামব্রত কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট
কলিকাতা

VEDA-VEDĀNTA
PŪRVA KHAṆḌA : BRAHMA-SŪTRA

প্রকাশক :
শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট
শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন, রঘুনাথপুর (বাগুইহাটি)
ভি.আই.পি. রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৫৯
দূরভাষ : ৫৫৯-৪৪৬৬

২য় সংস্করণ : ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৯, গ্রন্থকারের মহাপ্রয়াণ- স্মরণোৎসব উপলক্ষে।

অক্ষর বিন্যাস :
প্রজ্ঞা প্রকাশনী
৮, নরসিংহ লেন, কলিকাতা - ৯ দূরভাষ - ২৪১ ৫৬৯৩

মুদ্রাকর :
চারু প্রেস, কলিকাতা - ৫৪

গ্রন্থ বাঁধাই :
শ্রীনাথ বুক-বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
৮, পাটোয়ার বাগান লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯ দূরভাষ - ৩৫০ ৪২১৫

প্রচ্ছদ চিত্র : শ্রীপল্টু মালিক

ওঁ

।। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রার্পণমস্তু ।।

"বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্।"
শ্রীকণ্ঠোক্ত গীতা মন্ত্রে রটিয়াছ স্বয়ম্।।
"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"— "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"।
শ্রুতি-মৌলি ব্রহ্মসূত্র স্বতন্ত্র সাক্ষাৎ।।
সংবিৎ শকতি মূর্ত তত্ত্ব সুবিন্যস্ত।
কত ভাষ্যকার জ্ঞানাধার সন্ধানে ধ্যানস্থ।।
সবার পদধূলি শিরে তুলি, যাচি শুদ্ধা ভক্তি।
এ প্রয়াসে প্রচোদক তব কৃপাশক্তি।।
সুখসিন্ধু তুমি, যদি বিন্দুসুখ পাও।
শ্রীপদে অর্পিণু গ্রন্থ, কটাক্ষে তাকাও।।
আকুতি সার্থক কর, চিত তপঃপূত।
তব দাসের দাসত্ব-ভিক্ষু মহানামব্রত।।

সূচীপত্র

বিষয়		পত্রাঙ্ক
ভূমিকা	: শ্রীঅমলেশ ভট্টাচার্য	এক
প্রাক্-কথন	: ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়	ছয়
প্রস্তাবনা	: ডক্টর ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী	এগার
উপোদ্ঘাত	: মহানামব্রত ব্রহ্মচারী	ষোল
ব্রহ্মসূত্র	:	**১-২৫৮**
	: আভাস	১
	: প্রথম অধ্যায় : সমন্বয়	১৪
	: দ্বিতীয় অধ্যায় : অবিরোধ	১২৪
	: তৃতীয় অধ্যায় : সাধন	১৭২
	: চতুর্থ অধ্যায় : সিদ্ধি বা ফল	২৩৪
পরিশিষ্ট-১	: অধিকরণাবলী ও প্রতিটি অধিকরণের প্রতিপাদ্য বিষয়	২৫৫
পরিশিষ্ট-২	: বিহঙ্গম-দৃষ্টিতে ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব	২৬৬
পরিশিষ্ট-৩	: ব্রহ্মসূত্রে যাবতীয় অবৈদিক মত খণ্ডন	২৬৮
পরিশিষ্ট-৪	: বেদান্ত সাহিত্যের আচার্যগণ ও তাঁহাদের অবদান	২৬৯
পরিশিষ্ট-৫	: বর্ণানুক্রমিক সূত্রসূচী	২৭৪
গ্রন্থপঞ্জী		

বেদ-বেদান্ত : ব্রহ্মসূত্র

অধ্যায়	পাদ	অধিকরণ	সূত্র	পৃষ্ঠা
প্রথম	প্রথম	১১	৩২	১৪-৭৪
	দ্বিতীয়	৬	৩৩	৭৫-৯১
	তৃতীয়	১০	৪৫	৯৫-১০৯
	চতুর্থ	৮	২৯	১১০-১২৩
		৩৫	১৩৯	
দ্বিতীয়	প্রথম	১৪	৩৮	১২৪-১৩৮
	দ্বিতীয়	৮	৪৫	১৩৯-১৫৪
	তৃতীয়	৭	৫৩	১৫৫-১৬৫
	চতুর্থ	৮	২২	১৬৬-১৭১
		৩৭	১৫৮	
তৃতীয়	প্রথম	৬	২৭	১৭২-১৭৬
	দ্বিতীয়	৮	৪১	১৭৭-১৯১
	তৃতীয়	৩২	৬৭	১৯২-২১৬
	চতুর্থ	১৫	৫২	২১৭-২৩৩
		৬১	১৮৭	
চতুর্থ	প্রথম	১২	১৯	২৩৪-২৪০
	দ্বিতীয়	১১	২১	২৪১-২৪৪
	তৃতীয়	৫	১৬	২৪৫-২৪৮
	চতুর্থ	৬	২২	২৪৯-২৫৪
		৩৪	৭৮	
সর্বমোট		১৬৭	৫৬২	

সমগ্র ব্রহ্মসূত্র অধ্যায় সংখ্যা-৪, পাদ সংখ্যা-১৬, অধিকরণ সংখ্যা-১৬৭, ও সূত্র সংখ্যা-৫৬২।

ভূমিকা

মহাভারতে বলা হয়েছে, গৃহে কোন মিষ্টান্ন এলে তা সর্বাগ্রে দিতে হয় বালক ও পরিচারকদের। সেই মত ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী তাঁর 'বেদ-বেদান্ত' নামে সদ্য প্রকাশিত এই অমূল্য গ্রন্থে যে দিব্য প্রসাদ নিবেদন করেছেন তাতে বাল্যভোগে ডাক দিয়েছেন এই অজ্ঞ অর্বাচীনকে। যদিও কোন অধিকার ও যোগ্যতা নেই। তবুও এই অমৃত আস্বাদনে নিযুক্ত হয়েছি তাঁর আশীর্বাদে। আর শাস্ত্রেও তো আশ্বাস আছে — "বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ ভবেৎ....

সাধারণত বেদান্ত শব্দের একভাবে অর্থ করা হয় : সমগ্র বেদশাস্ত্রের অধ্যয়নের অন্তে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" — অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্বের জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান। আর একটি নিবিড় অর্থ হল, বেদের অন্তঃ অর্থাৎ বেদের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তত্ত্বের অনুসন্ধান।

বেদের যে সামগ্রিক ভাবমণ্ডল, এই সৃষ্টি সংসার কি, কেন, কোন্ উদ্দেশ্যে, কোথা থেকে, কি ভাবে, এর আগে কি, পরে কি, এর হেতু কি, আদি অন্ত পরিণাম কি, ইত্যাদি যাবতীয় জিজ্ঞাসা নিয়ে সৃষ্টিতত্ত্বের ভাবনা-বিচারকে এক কথায় বলে 'ভাববৃত্তম্'। বেদান্ত হল বেদের সেই ভাববৃত্তম্— "যথেদমগ্রে নৈবাসীদ্ অসদপ্যঽবাপি সৎ। যস্তে যথেদং সর্বং তদ্ ভাববৃত্তম্ বদন্তি তু।।" (বৃহদ্দেবতা, ২/১২০) সৃষ্টি-রহস্যের উন্মেষে বেদের যে বিখ্যাত নাসদীয় সূক্ত তারও দৈবত রূপ হল ভাববৃত্তম্।

এই সমগ্র তত্ত্বকে সূত্রাকারে নির্দেশ করা হয়েছে ব্রহ্মসূত্রে। সূত্র অর্থ সংক্ষিপ্ত বচন, aphorism। অল্প দু'-একটি কথার সংকেতে ইঙ্গিতে আভাসে বিদ্যুৎ-চমকের মত সমগ্রকে উদ্ভাসিত করা। সূত্রের আর একটি গভীর অর্থ হয়। সমগ্র শ্রুতিমণ্ডল যেন ঋষিদের তপস্যার ধ্যানের এক আলোক বিতান। অধ্যাত্ম চেতনার সূক্ষ্ম তন্তু দিয়ে এই ধ্যানের বিতান বয়ন করা— "তন্তুং তন্বন্ রজসো... অনুল্বণাং বয়ত" (ঋ. ১০/৫৩/৬), দ্যুলোক থেকে ভূলোক পর্যন্ত আতত এই তন্তুর বিতান — "তন্তুং তনুষ পূর্ব্যং" (ঋ. ১/১৪২/১)। ঋষিরা সাধন পরম্পরায় এই সূক্ষ্ম তন্তু বা সূত্র ধরেই সত্যকে লাভ করেছেন। তাই তাঁরা সতর্ক ছিলেন এই ধ্যানের বিতান যেন ছিন্ন না হয়। এই সূক্ষ্ম

চৈতন্যের যোগসূত্র যেন ছিঁড়ে না যায়— "মা তন্তুচ্ছেদ বয়তো ধিয়ম্" (ঋ. ২/২৮/৫)। প্রাচীন ঋষিদের এই ধ্যানমণ্ডল দর্শন করে কাণ্ব ঋষি বলেছেন, ধ্যানীরা ইতঃপূর্বে যজ্ঞের আতনন দিয়ে যেসব সাধনার ভূমি পেয়েছেন আমি তা তপস্যার দ্বারা দেখলাম— "যানি স্থানান্যসৃজন্ত ধীরা যজ্ঞং তন্বানাস্তপসাভ্যপশ্যম্" (ঋ. ৮/৫৯/৬)— এই সূক্ষ্ম তন্তুজাল বিস্তৃত সর্বদিকে; আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায়, Psychological spiritual membrain "বিশ্বতন্তুভিস্তত" (ঋ. ১০/১৩০/১)। এই অর্থে ব্রহ্মসূত্র হল ব্রহ্মচৈতন্যের তন্তুজাল।

এর প্রতিটি সূত্রে আছে যুক্তি ও উপলব্ধির যুগলবন্দী। যুক্তি লীন হয়েছে উপলব্ধির মধ্যে। আর উপলব্ধি স্ফুট হয়েছে যুক্তির হীরকের ধারে। তবে ক্ষুদ্র মনের যুক্তি নয়, তা দিব্যমনের যুক্তি, শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন, "Logic of the gods, logic of the infinite"। তাই ব্রহ্মসূত্রের ধারণার জন্য যুক্তিও চাই, উপলব্ধিও চাই। কিন্তু ব্যাসসূত্রের ভাষা ও যুক্তি অত্যন্ত দুরূহ ও দুরবগাহ। সাধারণ মন দিয়ে অনুধাবন করতে গিয়ে সূত্রের অর্থ অনেক সময় প্রকাশ না হয়ে আচ্ছাদন হয়ে পড়ে। শব্দের অভিধা ও লক্ষণা, মুখ্য ও গৌণ অর্থ যথার্থ অনুধাবন না করলে ব্রহ্মসূত্র জটিল সব স্ববিরোধী তত্ত্বের সংশয়ে পথ হারায়।

এ বিষয়ে মহাপ্রভু স্বয়ং সাবধান করে দিয়েছিলেন পণ্ডিত-শিরোমণি বাসুদেব সার্বভৌমকে—

"প্রভু কহে— সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি হয় ত বিকল।।
সূত্রের মুখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনা-অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন।।
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ-কল্পনা।
অভিধাবৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ লক্ষণা।।
ব্যাস-সূত্রের অর্থ সূর্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন।।"

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

অতএব ব্রহ্মসূত্রের অর্থকে যথার্থ ভাব-অবগাহী করে, তাকে সাক্ষাৎ হৃদয়বেদ্য করার প্রয়োজন স্বয়ং বেদব্যাস অনুভব করেছিলেন। সূত্র রচনা করেও তিনি এর দুর্গমতার জন্য মনে মনে অতৃপ্ত ও দুঃখিত

হয়ে পড়েছিলেন।

একদিন সরস্বতী নদীর তীরে তিনি বিষণ্নচিত্তে বসে ভাবছিলেন----"তস্যৈবমখিলমাত্মানং মন্যমানস্য খিদ্যতঃ।" নিজেকে বড় অসম্পন্ন অসার্থক বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। এমন সময় সেখানে দেবর্ষি নারদ এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "পরাশরতনয়, এমন সন্তপ্ত হয়ে বসে আছে কেন ? তুমি মহাভারত রচনা করেছ। ব্রহ্মস্বরূপকে ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা বিচার করেছ। তথাপি অকৃতার্থের মত এমন বিষম হয়ে আছ কেন ?"

ব্যাসদেব বললেন, "কিন্তু দেবর্ষি, তবুও আমার আত্মা তৃপ্তি লাভ করছে না---- 'ন আত্মা পরিতুষ্যতি মে'। বলতে পারেন, কেন আমার এমন হল ?"

নারদ তখন মৃদুহাস্যে বললেন, "তুমি মহভারতে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থ বর্ণনা করেছ, কিন্তু তুমি পঞ্চম পুরুষার্থ ভক্তির কথা তেমন করে বল নাই। শ্রীভগবানের হৃদয়েব কথা, তাঁব মহিমার কথা, তাঁর নির্মল যশোগাথা বর্ণনা কর নাই। কেবল শুষ্ক জ্ঞানে আত্মা পরিতৃপ্ত হয় না। তোমার জ্ঞান অপূর্ণ। যতই সুললিত বাক্য হোক, যদি শ্রীহরির জগৎপবিত্রকারী যশ গুণ গরিমার কথা না থাকে তাহলে তা নিতান্ত কাকতীর্থ, সেখানে মানস সরোবরের দিব্যহংস বিহার করে না"---

"ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো, জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা, ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্ক্ষয়াঃ।।
(ভগবত, ১/৫/১০)

অতঃপর নারদের নির্দেশে বেদব্যাস শ্রীহরির
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতুল্য ভাগবতী সংহিতা রচনা
শ্রীমদ্ভাগবতই হল শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায় তিন প্রস্থানের হৃদয়ভাষ্য। কথা যেখানে অর্থ বিভ্রান্তিতে সংশয়াচ্ছন্ন, ভাগবত সেখানে তাঁর আকাশ মহিমা নিয়ে ব্যাপ্তি এনে দেয়। সকল তত্ত্বচিত্র তখন এক অচিন্ত্য রসময়তায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে। ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে সকল দ্বন্দ্ব সংশয় তখন এক পরম তাৎপর্যে সন্মিলিত হয়ে ধরা দেয়। ব্রহ্মতত্ত্ব অদ্বৈত, না দ্বৈত ? দ্বৈত, না বিশিষ্টাদ্বৈত ? ভেদ, না অভেদ ? না ভেদাভেদ ? বিশেষ, না নির্বিশেষ ? সাকার, না নিরাকার ? অণীয়ান্, না মহীয়ান্ ? ভাগবত বলেন, তিনি একই সঙ্গে যুগপৎ এই সব কিছু। আই ব্রহ্মসূত্রের

যদি কোন ভাষ্য থাকে তবে তা এই ভাগবতী সংহিতা— ভাগবত।

যে কোন দুইটি তত্ত্ব যখন পরস্পরবিরুদ্ধ অর্থ নিয়ে বিপ্রতীপ দুই বিন্দুতে দাঁড়ায়, তখন তার যথার্থ সমাধান ও অর্থ সমন্বয় হবে উভয়ের ঊর্ধ্বে এক তুরীয় বিন্দুতে গিয়ে। শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায় এই তিন প্রস্থানের পর মহাপ্রভু তাই চতুর্থ আর এক প্রস্থানের কথা বলেছেন, যুক্তি তর্ক বিচারের ঊর্ধ্বে এক রসের অবগাহন। নাম দিয়েছেন রসপ্রস্থান। যুক্তি সেখানে নিষেধ হয় না, কিন্তু পরমতৃপ্তিতে নীরব হয়।

মহাপ্রভু সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, কোন জীব তার খণ্ড বুদ্ধি দিয়ে যুক্তি-তর্ক দিয়ে ব্যাস-সূত্র জানতে পারে না। সূত্রকার স্বয়ং যদি ব্যাখ্যা করেন তবেই বোধগম্য হয়। তাই ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের একমাত্র ভাষ্য। অতএব ব্যাস-সূত্র বুঝতে হবে ভাগবতের আলোতে—

"চারিবেদ উপনিষদ্ যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয়।।
সেই সূত্রে সেই ঋগ্-বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক-নিবন্ধন।।
অতএব সূত্রের ভাষ্য— শ্রীভাগবত।"
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২৫শ পরিচ্ছেদ)

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা ঠিক এইখানেই। গ্রন্থের লেখক ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। তিনি যথার্থ ভাগবত-গঙ্গোত্রী। বিশ্ববন্দিত ভক্তপূজিত বৈষ্ণবাচার্য। সকল শাস্ত্র ও সাধনা, জ্ঞান-প্রেম-ভক্তির জীবন্ত বিগ্রহ। সকল প্রস্থানে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার। তিনি জ্ঞানে গম্ভীর, আবার কারুণ্যে করুণ। মমতায় মিত্র তিনি পরম বন্ধু। দৃষ্টিতে কবি, সৃষ্টিতে মৌনী। তিনি এই যুগে যথার্থ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ।

ব্রহ্মসূত্রের ভিতরে ভারতীয় সকল দর্শন ও মার্গের যত পূর্বপক্ষ, উত্থিত যত প্রশ্ন ও সংশয়, সেই সব তিনি এক নিরপেক্ষ তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেছেন। সূত্রের মধ্যেই নিহিত যত মতের সংশয় তর্কজাল, তিনি তাঁর শাণিত যুক্তির ধারে বোধির দীপ্তিতে সকল সংশয় গ্রন্থি ছিন্ন করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ব্যাস-সূত্রের মর্মার্থ। আর এসবই তিনি করেছেন ভাগবতের লীলারসের অন্তর্যামিত্ব দিয়ে। সেই সঙ্গে এক একটি সূত্রের অর্থপুষ্টির জন্য যদৃচ্ছায় তুলে নিয়েছেন বিভিন্ন উপনিষদ্, শ্রুতির মন্ত্র ও তাৎপর্য।

সাধারণ পাঠক ব্রহ্মসূত্র স্পর্শ করতে ভয় পায়, কেননা এর মধ্যে আছে অগাধ অগম্য দার্শনিকতার অতল রহস্য। কিন্তু মহানাব্রতজীর আলোচনায় শুষ্ক দার্শনিক কচকচি নেই ; এখানে সমস্তটাই হয়ে উঠেছে এক মননমধুর রসমধুর ভাব অবগাহন। উপনিষদের মন্ত্র, বেদের তত্ত্ব, ভাগবতের ভাবের সঙ্গে তিনি প্রসঙ্গত শুনিয়েছেন প্রভু জগদ্বন্ধুর লীলাজীবনের বিচিত্র সব ঘটনা, কখনো মহাপ্রভুর জীবনের নানা কথা, দক্ষিণের শ্রীখণ্ড গ্রামের বালক রঘুনাথের বিগ্রহসেবার কথা কত বিচিত্র সব সহজ সরল কাহিনীর চুম্বকে তিনি উন্মোচিত করেছেন বহু দার্শনিক সূত্রের কূটগ্রন্থি। সেসব দৃষ্টান্ত দেবার লোভ সংবরণ করলাম কথার বিস্তার-বাহুল্যের ভয়ে।

নানা সম্প্রদায়ের বেদান্ত-ভাষ্য অনেক আছে, কিন্তু সকল মত ও পথের চিন্তাধারাকে একত্রে এক সার্বিক আলোকের পরিপ্রেক্ষিতে এমন নিরপেক্ষ পর্যালোচনা ইতিপূর্বে আর হয়নি। ব্রহ্মচারীজী তাঁর বর্তমান দ্বিনবতিতম বয়সেও এমন অসামান্য গ্রন্থ রচনা করে ব্রহ্মতত্ত্ব-দর্শনের ক্ষেত্রে বঙ্গভাষায় এক শাশ্বত কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করলেন। এই গ্রন্থের মন্ত্রাত্মক ভাবমাহাত্ম্য আমাদের চিত্তে চিরকাল ভাগবতী দিব্যলোক ধারণ করে' থাকবে— "তস্তনভ দ্যাম্ মন্ত্রেভিঃ সত্যৈঃ"। বাঙালীর ভাগ্যে এ এক নিঃশব্দ সূর্যোদয়।

সিদ্ধবাক্ মহাপুরুষের কথার তলায়-তলায় নীরবতার এক তীব্র শক্তিস্রোত প্রবাহিত থাকে। ব্রহ্মচারীজীর এই গ্রন্থের বাণী তাই এমন তিমিরবিদারী, এমন বীর্যসংবিদ— যা আলোর মত প্রকাশ করে, কিন্তু পীড়ন করে না। তাঁর বাচনভঙ্গির প্রসাদগুণ হল 'মিতঞ্চ সারঞ্চ'— অল্পাক্ষরে সারকথা বলাই তাঁর বাগ্মিতা। তাই তাঁর লেখা পড়লে, তাঁর কথা শুনলে নিজের অজ্ঞাতসারেই অন্তরে এক নির্মল ভক্তিভাবের উদয় হয়। এই গ্রন্থের মাহাত্ম্য এই, ভক্ত জ্ঞানী তত্ত্বদর্শীর তো কথাই নেই, আমাদের মত সাধাণ পাঠকেরও এমন হয়, যখন মন বলে কিছু বুঝি নাই, কিন্তু তখন অন্তর বলে, সব পেয়েছি। গ্রন্থখানি আমাদের সেই সকল পাওয়ার 'পিতৃধন'।

অমলেশ ভট্টাচার্য

প্রাক্‌-কথন

ভারতীয় সংস্কৃতির মূল শ্রুতি বা অপৌরুষেয় বেদবাণী। ইহা কাহারও কৃতি নয়, আপন চেষ্টা বা কর্মের দ্বারা রচিত শব্দসমষ্টি নয়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ং উদ্ভূত, আপনি আগত, আগমরূপ বেদ বা জ্ঞান।

সেই সহজাত, সহ-জ, স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া আমরা কৃত্রিমতায়, বিকৃতিতে নিপতিত। আবার প্রকৃতিতে, স্বরূপে, স্বভাবে ফিরিবার একমাত্র উপায় এই শ্রুতি, যাহাকে আমরা বেদ-বেদান্ত বলিয়া জানি। ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-সাধনায় ইহাই একমাত্র অবলম্বন—

'বেদোঽখিলো ধর্মমূলম্।'

যুগে যুগে ভারতবর্ষের ধর্মরাজ্যে যত সম্প্রদায় প্রবর্তিত হইয়াছে, যত আচার্য আসিয়াছেন প্রত্যেকেই আপন উপলব্ধি অনুসারে এই বেদ-বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। বেদের অন্তভাগরই অপর নাম উপনিষৎ।

'বেদান্তো নাম উপনিষৎ প্রমাণম।

গুরুর 'উপ' সমীপে 'নি' নিবিষ্ট হইয়া 'সন্ন' অবস্থান-পূর্বক এই জ্ঞান লাভ করিতে হইত। গুরুমুখগম্য এই পরম রহস্যজ্ঞানের নাম তাই উপনিষৎ। আমার সমস্ত অজ্ঞান-অন্ধকারকে নিঃশেষে 'সাদন' অবসাদন, নির্মূলন করে বলিয়াও ইহা উপনিষৎ নামে পরিচিত। কেউ বা বলেন, এ দুটি অর্থই গৌণ বা অনুষঙ্গিক মাত্র, মৌল অর্থ বা রহস্যার্থ হইল "দেবতা এসে আচার্যের হৃদয়ে নিষণ্ন হ'লে তাঁর মাঝে যে তত্ত্বজ্ঞানের স্ফুরণ হয়, তা-ই 'উপনিষৎ'।"

কিন্তু সে-তত্ত্বজ্ঞান বা উপনিষৎ সকলের কাছে সহজলভ্য নহে। তাহার একটি কারণ উপনিষদের বাক্যসমূহ অনেক স্থলে পরস্পর-বিরোধী, সুতরাং সংশয়ের সঙ্কটে পড়িতে হয়। কোথাও উপনিষৎ জোর দিয়া বলেন : 'মনসৈবেদমাপ্তব্যম্' মন দিয়াই ইহাকে পাইতে হইবে, আবার কোথাও বলেন : 'নৈব বাচা না মনসা প্রাপ্তুং শক্যো', মন দিয়া পাওয়া যায় না। সাধন সম্বন্ধে যেমন এইরূপ বিভ্রান্তি জাগে, সাধ্য বা তত্ত্ব সম্বন্ধেও তেমনি পরস্পর-বিরোধী উক্তি আমাদের আকুল ক'রে, যখন একবার শুনি তিনি 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ', আবার পরক্ষণেই শুনি তিনি : 'সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ

সর্বমিদমভ্যাপ্তো'। তাই ইহার মীমাংসার জন্য মন অনুসন্ধান করে।

সেই ব্রহ্ম-মীমাংসা, উপনিষদ্-বাক্যগুলির মীমাংসা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহার 'ব্রহ্মসূত্রে', যাহার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হইল 'বেদান্তবাক্যকুসুমগ্রথনার্থত্বাৎ' বেদান্ত বা উপনিষৎ সমূহের বাক্যরূপ কুসুমের, ফুলগুলির মালা গাঁথা; একটি সূত্রে অনুস্যূত করিয়া ধরিয়া রাখা। তাহারা পরস্পর বিরোধী হইয়া যেন বিশ্লিষ্ট বা বিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতিভাত না হয়, সেইজন্য নানা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া, শঙ্কা উঠাইয়া তাহার সমাধানপূর্বক নিশ্চিত মীমাংসায় বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই ব্রহ্মসূত্র-রচনার মূল তাৎপর্য। তাই এটিকে তর্ক বা যুক্তিপ্রস্থান বলা হয়, যাহা শ্রুতিপ্রস্থানরূপ বোধি বা উপলব্ধির বিষয়কে বুদ্ধি বা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়।

ইহা ছাড়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও একটি মীমাংসা বা সমন্বয় করিয়া দিয়া গিয়াছেন শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে, যোগশাস্ত্রে; এবং তাহারও নাম ব্রহ্মবিদ্যা। সেইটি স্মৃতিপ্রস্থান নামে পরিচিত। তাহা অপৌরুষেয় শ্রুতি নয়, একটি পুরুষের, যদিও তিনি পরম পুরুষ, 'মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা'। সমস্ত উপনিষদের সার দোহন করিয়া গোপাল-নন্দন রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রুতি-স্মৃতি-যুক্তি এই তিনটি প্রস্থানের ত্রিধারায় অভিষিক্ত হইয়াই অধ্যাত্মতত্ত্বে অবগাহন করিতে হয়। এই ত্রিবেণীসঙ্গমে সকল আচার্যকেই তাই উপনীত হইতে হয় এবং এই তিনটি ধারা অবলম্বন করিয়া আপন আপন মতবাদকে প্রবাহিত ও প্রতিস্থাপিত করিতে হয়। ভারতবর্ষের ব্রহ্মবিদ্যার পাবনীধারা তাই ত্রিপথগা এবং আজও আচার্য-পরম্পরাক্রমে তেমনিভাবেই প্রবহমানা।

আমাদের অশেষ সৌভাগ্য, এই ঘোর অন্ধকারময় কলিযুগের দুর্দিনেও এমন একজন আচার্য আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন, ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারীরূপে। শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের কৃপায় আমরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের জীবনদর্শন যেমন শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীর দ্বারা ষট্-সন্দর্ভে প্রকটিত হইয়াছে, তেমনি শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের জীবনদর্শন আচার্যপ্রবর ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির দ্বারা উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তিনি খণ্ডের পর খণ্ডে "গীতাধ্যান" রচনা করিয়া যেমন স্মৃতিপ্রস্থানকে সমুজ্জ্বল সুষমায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরে তাহার একটি অখণ্ড সংস্করণও প্রকাশ

করিয়াছেন তেমনি মূল উপনিষদ্গুলির রহস্যও অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় দুইটি খণ্ডে উদ্ঘাটন করিয়া দিয়া শ্রুতিপ্রস্থানে সকলের সহজ সঞ্চরণের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। শেষ, বাকি ছিল তর্ক বা যুক্তিপ্রস্থান, যেটি এখন 'বেদ-বেদান্ত' নাম দিয়া প্রকাশ হইতে চলিয়াছে।

একদিক্ দিয়া সাধারণ সকলের পক্ষে এই তৃতীয় প্রস্থানটি সর্বাপেক্ষা দুরূহ ও দুরধিগম্য। তাহার একটি কারণ, সূত্রগুলি 'স্বল্পাক্ষরম্' অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারের অথচ 'সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্' বিশ্বের সকল সারভূত জ্ঞান ঐ কয়েকটি অক্ষর বা শব্দের মধ্যে সম্পুটিত। অর্থ নিষ্কাসিত করাই প্রায় অসম্ভব। দ্বিতীয় কারণ, সূত্রগুলির মধ্যে কোন্‌টি সিদ্ধান্তের সূচক, কোন্‌টি বা পূর্বপক্ষ বা শঙ্কার সূচক, তাহার নির্ণয়ও সব সময় সহজসাধ্য নয়। তৃতীয় কারণ, শব্দগুলিকে বিশ্লেষণ কিভাবে করা যাইবে, 'জন্মাদি+অস্য+যতঃ', না 'জন্ম+আদ্যস্য+যতঃ' এইভাবে হইবে, তাহাও অভ্রান্তভাবে বোঝা যায় না। এ ছাড়া এক এর্ক ভাষ্যকার এক এক ভাবে আপন মতবাদ অনুসারে সূত্রগুলিকে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কোন্‌টি গ্রহণ করিব ? কোন্‌টি সঠিক ? তাহাতে আরও বিভ্রান্তি।

ব্রহ্মচারীজির ব্যাখ্যার এখানেই চমৎকারিত্ব যে তিনি সূত্রের মূল তাৎপর্যটি এমন সহজ সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে মনে আর কোন সংশয়ের অবকাশ থাকে না। দ্বিতীয়তঃ তিনি একটি সূত্রের অর্থ প্রাচীন আচার্যেরা যিনি যেভাবে করিয়াছেন, তাহার যথাযথ উল্লেখও করিয়াছেন। যেমন, প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, বলদেব প্রভৃতি সকল আচার্যেরই মত তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং তাহার পর আপন অনুপম ভঙ্গীতে শব্দ যে সেই তারকব্রহ্ম নামকেই ইঙ্গিত করিতেছে তাহা শ্রীমন্ মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু, শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ ভাগবত, গোস্বামী তুলসীদাস প্রমুখের উক্তি হইতে প্রমাণ কারিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

অনেক বলিতে পারেন বা ভাবিতে পারেন যে ইহা ভক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা হইল, জ্ঞানপক্ষে নয়। আচার্য মহানামব্রতজি তাই স্থানে স্থানে সন্ন্যাসীগোষ্ঠী ও বৈষ্ণবগোষ্ঠীর মতামত পাশাপাশি তুলিয়া ধরিয়াছেন—যেমন প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় সূত্রের — এবং কেন একজন অপরজনের 'কথা শ্রদ্ধার সহিত শোনেন না' তাহার যুক্তিও উভয় পক্ষের বক্তব্যের মাধ্যমে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। পাঠকবর্গ

তাহা হইতে আপন ভাব-অনুসারে নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন, কারণ মূল কথা হইল :

"যার যেই ভাব হয় সেই সে উত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তরতম॥"

শাস্ত্রের তাৎপর্য গ্রহণে ভাবই মূল। কাহারও ভাব কখনও ভঙ্গ করিতে নাই। উত্তর-প্রত্যুত্তর, যুক্তি-তর্ক, ঊহ-অপোহ, শঙ্কা-সমাধান সব কিছুর লক্ষ্য আপন আপন ভাবকে পুষ্ট করা, সুদৃঢ় করা। ব্রহ্মসূত্র আলোচনার মূল উদ্দেশ্যটি ব্রহ্মচারীজি বড় সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন, তাহা হইল : "সূত্রকারের অন্তরের কথাটি আলোতে টানিয়া আনা।" আধুনিক যুগের এই মহান্ আচার্যপ্রবর দীপবর্তিকা হস্তে লইয়া আমাদের জন্য আগাইয়া আসিয়াছেন সেই আলোকে টানিয়া আনিতে। আমরা যেন তাহারই আলোকে দেখিয়া লইতে পারি ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত তাৎপর্যটি।

বেদান্তের তিনটি প্রস্থানের উপরই এইরূপ হৃদয়গ্রাহী সর্বজনবোধ্য মনোজ্ঞ আলোচনা সম্পূর্ণ করিয়া ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজি যথার্থ আচার্যপদে নিজেকে অভিষিক্ত করিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যে তাঁহার এই অমূল্য অবদান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এখন দেশ হইতে সংস্কৃতের পঠন-পাঠন প্রায় সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হইত চলিয়াছে, বিশেষ করিয়া এই বঙ্গভূমিতে। তাহার উপর দর্শনাস্ত্রের অবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের জটিল পরিভাষায় কণ্টকাকীর্ণ গহন অরণ্যে প্রবেশ সাধারণ সংস্কৃতজ্ঞের পক্ষেও কঠিন। সেখানে সকলের অবাধ সঞ্চরণের রাজপথ রচনা করিয়া দিয়া গেলেন এই আচার্যবর্য। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইবার ভাষা নাই। তিনি স্বয়ং মহাজন বলিয়াই এই অভাজনকে দিয়া প্রাক্-কথন লিখাইয়া তাহাকে গৌরবমণ্ডিত করিলেন, সম্পূর্ণ অনধিকারীকে এই বিশিষ্ট অধিকার দান করিলেন।

শুধু ভাবি, অনাদি বহির্মুখ আমরা তবু কি ফিরিব এই পরম অমৃতের অন্তর্মুখ আস্বাদনে, যাহাকে ব্রহ্মচারীজি এমন 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে' করিয়া সকলের জন্য পরিবেশন করিলেন ? যদি কিঞ্চিন্মাত্রও ফিরি তাহা হইলে উপলব্ধি করিব কী হিরণ্যনিধির আমরা উত্তরাধিকারী, যাহা আমাদের সমস্ত দুঃখদারিদ্র্য হইতে নিমেষেই মুক্তি দিতে পারে এবং তাহারই উপর নিত্য অধিষ্ঠিত থাকিয়াও। 'উপর্যুপরি সঞ্চরন্তো' তাহারই উপর সদা সর্বদা চলাফেরা করিয়াও আমাদের দুর্দশা দৈন্য

ঘোচে না, যাহার 'স্বল্পমপ্যস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'। নবতিবর্ষ অতিক্রমে করিয়াও অক্লান্ত এই জ্ঞানতপস্বীর উদ্‌ভাস্বর লেখনী আমাদের "অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ" ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত আমাদের সেই আলোকলোকে উত্তীর্ণ করুক্— এই একান্ত প্রার্থনা।

মহানাম কৃপাধন্য
বিনীত
গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

'শ্যামলী'
সি.এস. ১/৮, গল্ফগ্রীণ
কলিকাতা-৪৫
মহাশিবরাত্রি
১৭.২.'৯৬

শ্রীঃ

প্রস্তাবনা

ওঁ বিশাল-বিশ্বস্য বিধান-বীজং
বরং বরেণ্যং বিধি বিষ্ণু-সর্বৈঃ।
বসুন্ধরা-বারি-বিমান-বহ্নি-
বায়ুস্বরূপং প্রণবং বিবন্দে।।১।।
জগতাং বান্ধবং নিত্যং মাধুর্য-মূর্ত-বিগ্রহম্।
নমামি সততং ভক্ত্যা শ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরম্।।২।।
ওঙ্কারনাথদেবায় গুরবে পরমাত্মনে।
সীতারাম-স্বরূপায় নমস্তে বেদমূর্তয়ে।।৩।।
মহানামব্রতং বন্দে বেদ-বেদান্ত-ভাস্করম্।
জ্ঞানাম্বুধিং মহাচার্যং লোকসংগ্রহকারকম্।।৪।।

বিশ্ব-ইতিহাসের বিস্ময় সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন প্রবহমানতা— প্রখ্যাত ঐতিহাসিক Will Durant-এর ভাষায় "Wonder of World History"। পৃথিবীর প্রাচীনতম লিখিত গ্রন্থ বেদ। বেদ বনস্পতির স্নিগ্ধচ্ছায়ায় ভারতীয় প্রজ্ঞার বিকাশ। বৈদিক বাঙ্ময়ের দার্শনিক তত্ত্ব বেদান্তে বিধৃত। বৈদিক মন্ত্র এবং তার তত্ত্ব নিয়ে পূজ্যপাদ মনীষী ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর অনবদ্য গ্রন্থ— "বেদ-বেদান্ত"। ব্রহ্মসূত্রের মর্মানুধ্যানে তাঁর নন্দনী প্রয়াসকে অভিনন্দিত করি। এই ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করে, বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গীতে যুগে যুগে ভারতে বহুবিধ টীকা, ভাষ্য, তস্য ভাষ্য রচিত হয়েছে। ভগবান্ বেদব্যাসের শিষ্য মহর্ষি জৈমিনি বেদের কর্মকাণ্ডের অর্থবিচারের জন্য যে সূত্রগ্রন্থ গ্রন্থ রচনা করেছেন তার নাম "পূর্বমীমাংসা দর্শন"। আর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাদরায়ণ ভগবান্ বেদব্যাস বেদের জ্ঞানকাণ্ডের অর্থবিচার এবং বেদবিরুদ্ধ মতবাদ সমূহের নিরাকরণের জন্য রচনা করেছেন এই "উত্তরমীমাংসা দর্শন"। এরই বিভিন্ন নাম হ'ল "শারীরক-মীমাংসা", "ব্রহ্ম-মীমাংসা", "বেদান্ত দর্শন", "বেদান্ত-সূত্র", "ব্রহ্মসূত্র" ও "ব্যাসসূত্র"। তারই ব্যাখ্যাকে অবলম্বন করে, শঙ্করাচার্যের পূর্বে এবং পরে বহু ক্ষুরধার দার্শনিকের উদ্ভব হয়। আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, আচার্য আনন্দতীর্থ বা মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ, আচার্য ভাস্করের ভেদাভেদবাদ, আচার্য বলদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ,

আচার্য নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, আচার্য বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, আচার্য রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, আচার্য শ্রীকণ্ঠের শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, আচার্য শ্রীপতির বিশেষাদ্বৈতবাদ বা বীরশিব-মতবাদ, আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষুর সামঞ্জস্যবাদ, পঞ্চানন তর্করত্নের শাক্তবিশিষ্টাদ্বৈতমতবাদ এবং মহর্ষি হারিতায়নেব শাক্তাদ্বৈতবাদ বিশিষ্ট দার্শনিক-প্রস্থানরূপে স্বীকৃত। প্রাক্-শঙ্কর বেদান্তবিদ্গণের নাম হ'ল কাশকৃৎস্ন, কার্ষ্ণাজিনি, আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি, জৈমিনি, বাদরি, আত্রেয়, ভর্তৃপ্রপঞ্চ, ব্রহ্মানন্দী, টঙ্ক, ভারুচি, উপবর্ষ, ভর্তৃমিত্র, বোধায়ন, ভর্তৃহরি, সুন্দরপাণ্ড্য, দ্রবিণাচার্য, ব্রহ্মদত্ত, গৌড়পাদ এবং গোবিন্দপাদ। আচার্য শঙ্কর এই গোবিন্দপাদেরই শিষ্য। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের মতে যুক্তিসঙ্গত হওয়ায় শঙ্করমতই শ্রেষ্ঠ। ইদানীন্তনকালে এর সংগে সংযোজন হয়েছে মহানামব্রতজীর 'বেদ-বেদান্ত'। "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ", আচার্য শঙ্কর ব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যমণি। তাঁর পূর্বে ও পরে বহু ভাষ্যকার ব্রহ্মসূত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। বলদেব বিদ্যাভূষণের সংস্কৃত টীকার পর বঙ্গে আর কোন টীকা রচিত হয়নি।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রাক্-শঙ্কর ও শঙ্করোত্তর মহামনীষীদের সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণব ভেদে দু'ভাগে ভাগ করেছেন মহানামব্রতজী। সন্ন্যাসী-গোষ্ঠীর শিরোমণি আচার্য শঙ্কর। তাঁর শিষ্যপরম্পরায় রয়েছেন পদ্মনাভাচার্য, সুরেশ্বরাচার্য, ভাস্করাচার্য, বাচস্পতি মিশ্র, সদানন্দ যতি হ'তে শেষ 'অদ্বৈতসিদ্ধি'কার মধুসূদন সরস্বতী পর্যন্ত অগণিত দার্শনিক।

আর বৈষ্ণবগোষ্ঠীর পথিকৃৎ হ'লেন রামানুজাচার্য। তাঁর গুরু ছিলেন যামুনাচার্য। পরে বল্লভাচার্য, নিম্বার্কাচার্য, মধ্বাচার্য, বিজ্ঞানভিক্ষু হইতে গোবিন্দভাষ্যকার বলদেব বিদ্যাভূষণ পর্যন্ত অনেকেই এই শ্রেণীতে রয়েছেন। প্রায় প্রত্যেক বিষয়ে দুই গোষ্ঠীর মতভেদ অনুধাবনীয়, আস্বাদনীয় এবং বিস্ময়াবহও বটে। কখনো বা কৌতুকাবহ। গোষ্ঠী দুই। আলম্বন কিন্তু এক। গ্রন্থটি হ'ল "ব্রহ্মসূত্র"। ভূমি একটি, কিন্তু দৃষ্টি দুইমুখী।

প্রতীচ্যে যেমন ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মপ্রকাশে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা স্মরণীয়, তেমনি বঙ্গভারতে সনাতন ধর্মের মর্ম ব্যাখ্যানে তাঁর অনন্যসাধারণ ভূমিকা জাতির পরম সৌভাগ্য। নবতিবর্ষ অতিক্রমের পরও তাঁর মননশীলতায় জরা তো আসেইনি, বরঞ্চ নিত্য নব নব

সৃজনে, শাস্ত্রব্যাখ্যানে আরো যেন মহিমোজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। বার্ধক্যে দেহ জরাগ্রস্ত হয়। অতি বড় প্রতিভাও ম্লান হ'য়ে আসে। সৃষ্টিশক্তির ন্যূনতা ঘটে, মনে আসে বৈকল্য। ধর্মভূমি ভারতের সমসাময়িক কালে দু'জন অসাধারণ মনীষী এর ব্যতিক্রম। মদীয় গুরুদেব ভুবনমঙ্গল বিগ্রহ শ্রীমৎ সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবকে দেখেছি একটি খঞ্জ পদ নিয়ে প্রায় নবতিবর্ষ বয়সেও যুবকের চেয়ে অধিকতর উৎসাহে গঙ্গোত্রী হ'তে কন্যাকুমারী আসমুদ্রহিমাচল পরিক্রমা করেছেন। অভ্রান্তভাবে রচনাও করেছেন অমূল্য সব গ্রন্থ। আর, দেখ্‌ছি পূজ্যপাদ ভাগবত-গঙ্গোত্রী ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীকে অতি দুরূহ গ্রন্থেরও অতি মনোগ্রাহী ভাষ্যরচনায়, গভীর গবেষণায় তথ্যসমৃদ্ধ তত্ত্বের মধুর পরিবেশনে সানন্দে সোৎসাহে অভিনিবেশ। বার্ধক্যে অন্যদের সৃষ্টিশক্তি যখন বন্ধ্যা হ'য়ে যায়, তখনো দেখ্‌ছি এই ভাগবত-পুরুষের নিত্য নব সৃজনী-প্রতিভার নব নব উন্মেষ। এককালে বঙ্গভারতে ভাগবতী কথার অক্লান্ত পরিবেশনে ব্যাসাসনে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ শুকদেব। যে কোনো তাঁর ভাষা শ্রোতৃমণ্ডলীকে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে গোপীদের মতো আকর্ষণ করে নিয়ে আসতো। এই অধম তো যৌবনের চৌমাথায় তাঁর ভাষণেই আকৃষ্ট হ'য়ে পরে, একান্ত আত্মদানে পরিণত হ'য়ে ধন্য। লেখনী তখনো চল্‌ছিল অব্যাহত গতিতে। সেইসব গ্রন্থ যিনি পড়েছেন, তিনিই মজেছেন। এখন জরাগ্রস্ত রোগজীর্ণ প্রাচীন দেহটি আর ছুট্‌তে পারে না। কিন্তু, তাঁর মনটি ততোধিক দ্রুতগতিতে ছুট্‌ছে। অতি দুরূহ গম্ভীর সব বিষয় নিয়ে তাঁর লেখনী অমৃত পরিবেশন ক'রে চলছে। সাধনা এবং রচনায়, প্রবচন এবং পরিব্রজনে তিনি অদ্বিতীয়। এমন প্রাণস্পর্শী ভাষা আর তো দেখি না। দুরূহ তত্ত্বকে এমন মনোজ্ঞ করে' পরিবেশনে তিনি অতুলনীয়। বঙ্গীয় দার্শনিক রঘুনাথ শিরোমণির ভাষায় তাঁকে নিয়েই বলা যায়—– বঙ্গীয় মনীষার বৈশিষ্ট্য তাঁতেই মূর্ত্ত—–

"কাব্যেঽপি কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে
তর্কেঽপি কর্কশধিয়ো বয়মের নান্যে।
তন্ত্রেঽপি যন্ত্রিতধিয়ো বয়মেব নান্যে
কৃষ্ণেঽপি সংযতধিয়ো বয়মের নান্যে॥"

বঙ্গসাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারে তাঁর দান অবিস্মরণীয়। তাঁর শব্দচয়ন, রচনাশৈলী, প্রকাশভঙ্গী একান্ত তাঁরই। বাংলাভাষায়

ধর্মসাহিত্যে তিনি চক্রবর্ত্তী সম্রাট্। শ্রীকৃষ্ণ, এবং শ্রীচৈতন্যলীলার পরিবেশনে, মর্মানুধ্যানে শ্রীমদ্‌ভাগবত, গীতা ও চণ্ডীর ব্যাখ্যায় তাঁর চিত্তচমৎকারী রচনা সাহিত্যের এক অতুলনীয় সম্পদ্। কিন্তু, এখন তিনি বেদের উত্তুঙ্গ হিমশৈল এবং বেদান্তের গহন অরণ্যানী গভীর নিশায় এবং অনলস সাধনায় পরিব্রজন করে যে তত্ত্বসম্পদ্ বর্তমান গ্রন্থের মাধ্যমে জনগণকে উপহার দিয়েছেন, তা অনবদ্য। প্রজ্ঞার সঙ্গে মাধুর্যের, তথ্যের সঙ্গে তত্ত্বের বিরাট সমাহার এতে দেখে বিস্মিত। যে তত্ত্বজ্ঞান তিনি লাভ করেছেন কঠোর সাধনায়, তা অকাতরে তিনি দিয়ে গেলেন জাতির বোধির মুক্তির জন্য। আচার্য্য শঙ্কর 'বিবেকচূড়ামণি'তে বলেছেন "যারা মহাপুরুষ, তাঁরা বসন্ত ঋতুর মতই নিষ্কামভাবে লোকহিত সাধন করেন। ভীষণ ভাবসমদ্রু নিজেরা উত্তীর্ণ হয়ে অহেতুক ভাবে অন্যদেরও উত্তীর্ণ করান।"

"শান্তো মহান্তো বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।
স্বয়ং তীর্ণা ভীমভবার্ণবম্ অহেতুনা অন্যানপি তারয়ন্তি।।"

সেই শ্রেণীরই লোকোত্তর মহাপুরুষ পূজ্যপাদ মহনামব্রতজী সেই দৃষ্টিতে মহোত্তম আচার্য।

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ে তাঁর রচনাই স্বতঃপ্রমাণ। তাঁর সম্বন্ধে মাদৃশ অজ্ঞ প্রস্তাবকের আলোচনার প্রয়োজন নেই। সারা জীবন ধরে সারস্বতরূপ, বহু আচার্য মনীষীর সঙ্গে পাঠ গ্রহণ করে, শত সংখ্যক গবেষককে নিজ তত্ত্ববধানে গবেষণান্তে পি.এইচ.ডি. উপাধি প্রদান করিয়ে এই অধমও জীবনসীমান্তে এসে তাঁর এই গ্রন্থ পড়ে মুগ্ধ, কৃতকৃতার্থ। জাতির জ্ঞান-নেত্র উন্মীলনের জন্য তিনি জাতীয় গুরুরূপে আজ বন্দনীয়।। এই গ্রন্থের বিষয় ধর্ম ও দর্শন। বীরসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ এই বিষয়ে আশা প্রকাশ করেছিলেন—

"এই সেই ভূমি যেখানে হইতে ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বন্যাকারে প্রবাহিত হইয়া সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে। আর এখান হইতে আবার তদ্রূপ তরঙ্গের অভ্যুদয় হইয়া নিস্তেজ জাতি সমূহের ভিতর জীবন ও তেজ সঞ্চার করিবে।"

দুরূহ গ্রন্থের "স্বাদু স্বাদু পদে পদে" এই বঙ্গভাষাবিধৃত ভাষ্য পাঠ করে বঙ্গবাসী ধন্য হোক্। সবাই মাইকেল মদুসূদনের ভাষায়—

"আনন্দে করুন পান সুধা নিরবধি।"

বলি—

বেদ-বেদান্তবেদ্যো যো ব্রহ্মরূপঃ সনাতনঃ।
মহানাম-ধিয়া স্ফূর্তো যাতু নো মানসে রতঃ

ফাল্গুনী পূর্ণিমা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ
'ঋষিধাম'
দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগণা

ইতি—
বিনত
শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী
(প্রজ্ঞাভারতী, বাচস্পতি, ভারতীয় সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক প্রবক্তা, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অবসরপ্রাপ্ত প্রধান, শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ সংস্কৃত প্রজ্ঞা মহাবিহারের কুলপতি, ভারত সরকারের বেদবিদ্যাবিষয়ক জাতীয় গবেষণাচার্য)।

জয় জগদ্বন্ধু হরি

উপোদ্ঘাত

ব্রহ্মসূত্র যে কত প্রাচীন সেই কথাটি একটু বলা প্রয়োজন মনে করি। বেদ-উপনিষদ্ অপৌরুষেয়। তাহার বয়স অনুসন্ধান আমরা করি না। ব্রহ্মসূত্র বেদব্যাসের বলিযাই ঐতিহ্য। সুতরাং তাহার বয়স কত তাহা নির্ণয়ের চেষ্টা করা যায়।

বেদব্যাস মহাভারতের সমসাময়িক, ইহা মহাভারত পাঠ করিলেই বুঝা যায়। ভগবদ্গীতা মহাভারতের অংশ, সুতরাং মহাভারত, গীতা ও ব্রহ্মসূত্র সমসাময়িক। মহাভারতের কাল স্থির হইলেই ব্রহ্মসূত্রের কাল ঠিক হইতে পারে।

মহাভারতের আদিপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৩শ শ্লোকে আছে—

"অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।
সমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ ॥"

অর্থাৎ কলি ও দ্বাপব যুগের মধ্য সময় উপস্থিত হইলে সেই সমন্তপঞ্চকতীর্থে কুরুসৈন্য ও পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল।

এখন কল্যব্দ কত তাহা নিরূপণীয়। ভাস্করাচার্য তাঁহার 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"নন্দাদ্রীন্দুগুণাস্তথা শকনৃপস্যান্তে কলের্বৎসরাঃ।"

অর্থাৎ শকাব্দ আরম্ভ হইবার পূর্বে কলিযুগের ৩১৭৯ (নন্দাঃ ৯, অদ্রয়ঃ ৭, ইন্দুঃ ১, গুণাঃ ৩। 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' নিয়মানুসারে ৩১৭৯) বৎসর অতীত হইয়াছিল। বর্তমানে শকাব্দ ১৯১৭। অতএব ৩১৭৯+১৯১৭ = ৫০৯৬ বৎসর। অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রের বয়স কিঞ্চিদধিক পাঁচ হাজার বৎসর। ভারতের ঐতিহ্য এই কথাই বলে, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে বেদব্যাস ছিলেন এবং তিনি মহাভারত, ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছিলেন।

এই সিদ্ধান্ত মানিতে একটু অসুবিধা আছে, তাহার উল্লেখ করিতেছি। সমাধান করিতে পারিব না। গীতার মধ্যে ১৩/৪ শ্লোকে ব্রহ্মসূত্র শব্দটির উল্লেখ আছে। "ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ।" ইহাতে মনে হয় ব্রহ্মসূত্র গীতার পূর্ববর্তী। আবার ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে স্মৃতিকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি সূত্র আছে।

সূত্রের সিদ্ধান্ত স্মৃতির দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। স্মৃতি বলিতে সকল ভাষ্যকারই গীতা মহাভারত বুঝিয়াছেন। গীতা দ্বারা নিজসূত্র সমর্থন করিতে হইলে গীতা ব্রহ্মসূত্রের পূর্ববর্তী হইলেই সুন্দর হয়। সুতরাং ব্রহ্মসূত্র পূর্ববর্তী না গীতা পূর্ববর্তী ইহা বলার উপায় নাই। সমসাময়িক বলিলে কোনও প্রকারে সমাধান হয়। দুইই বেদব্যাসের হইলেও কোন্‌টি পূর্বে কোন্‌টি পরে বুঝা যায় না। স্মৃতি বলিতে মনুসংহিতা হারীত সংহিতা প্রভৃতি বলিলে কোনও প্রকারে সমাধান হইতে পারে। কিন্তু কেহ তাহা করেন নাই।

সাধারণত ব্রহ্মসূত্রই বেদান্ত নামে পরিচিত। বেদান্তের আচার্যগণের মতে বেদান্তশাস্ত্র প্রস্থানত্রয়ে বিভক্ত। উপনিষৎ শ্রুতিপ্রস্থান, ভগবদ্‌গীতা স্মৃতিপ্রস্থান ও ব্রহ্মসূত্র ন্যায়প্রস্থান। সুতরাং ব্রহ্মসূত্র ও গীতা বেদান্তের অন্তর্গত। এইরূপ হইলে গীতার মধ্যে পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্লোকে যে বলিয়াছেন, "বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্‌", এইস্থানে "বেদান্তকৃৎ" শব্দের কি অর্থ হইবে? উপনিষৎ তো অপৌরুষেয়; ব্রহ্মসূত্র ও গীতা সমসাময়িক, তাহা হইলে "বেদান্তকৃৎ" শব্দের কি অর্থ হইতে পারে? 'ঈশ্বরকৃৎ' হইলেও অপৌরুষেয় বলা ঠিক হয় না। দ্রষ্টা ঋষি মন্ত্রাক্ষর দর্শন করিয়াছেন, এইরূপ বলিলে অপৌরুষেয়ত্ব অক্ষুন্ন থাকে। এইরূপ হইলেও "বেদান্তকৃৎ" অর্থ করা কঠিন হইবে। তবে বেদান্তের ন্যায়প্রস্থান ব্রহ্মসূত্র যে অন্তত পাঁচ হাজার বৎসর যাবৎ সগৌরবে বিরাজমান আছেন এই কথায় সন্দেহ নাই।

আর একটি কথা বলিব। "তত্ত্বমসি" কথাটি বেদান্ত-দর্শনের একটি বড় কথা। এই কথাটি প্রায় সকল লোকই জানেন। এই কথা লইয়া গ্রন্থটির মধ্যে কিছু আলোচনা আছে, কিন্তু বিস্তারিত নাই। গ্রন্থে এই কথা লইয়া কোনও সূত্র না থাকায় একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। "তত্ত্বমসি" কথাটি ছান্দোগ্য উপনিষদে ৬/৮/৭ হইতে ৬/১৬/৩ মন্ত্র পর্যন্ত নয় বার বলা হইয়াছে। একই কথার নয় বার পুনরুক্তিতে বুঝা যায় কথাটি খুব মূল্যবান। আচার্য শংকর এই বাক্যটিকে চারিটি মহাবাক্যের অন্যতম ধরিয়াছেন। বৈষ্ণবগোষ্ঠী ইহাকে মহাবাক্য বলিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, ওঙ্কারই বেদের মহাবাক্য। "তত্ত্বমসি" বাক্যের শঙ্কর অর্থ করিয়াছেন জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। বৈষ্ণবেরা অর্থ করেন, জীব ব্রহ্মের নিজ জন।

আচার্য শঙ্কর কিভাবে অর্থ করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে আলোচনা

করিতেছি। তিনি 'তৎ' এবং 'ত্বম্' কে সমানধিকরণে দেখাইয়া ঐক্য স্থাপন করিয়াছেন। ভিন্নার্থবোধক শব্দের বৃত্তি যদি একই বস্তুতে হয় তাহা হইলে সমানাধিকরণ হয়। 'পদ্মটি নীল' বা 'নীলপদ্ম' বলিতে বুঝায় নীলবর্ণ ও পদ্ম একই অধিকরণে আছে। নীলবর্ণ কিন্তু পদ্ম ছাড়া অন্যত্রও থাকিতে পারে। পদ্মও নীলবর্ণ ছাড়া থাকিতে পারে। এখন কিন্তু 'নীলপদ্ম'-তে উভয়ই একই অধিকরণে আছে।

আচার্য শংকর বৃত্তি কথাটির সঙ্গে 'ঐক্য' শব্দ যোগ করিয়াছেন। ভিন্নার্থবোধেক পদদ্বয়ের বৃত্তি যদি একই বস্তুতে হয় এবং তাহাদের যদি ঐক্য হয় তাহা হইলে সমানাধিকরণ হইবে। এই ঐক্য কথাটির যোগ বৈষ্ণবাচার্যেরা অযৌক্তিকর মনে করেন।

'তৎ' শব্দের অর্থ হইতেছে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম, আর 'ত্বম্' শব্দের অর্থ অজ্ঞাত অল্পশক্তিমান্ জীব (এখানে শ্বেতকেতু)। এই দুই কখনও এক হইতে পারে না। মধ্যে 'অসি' পদ থাকায়, সামানাধিকরণ্য করিতে হইলে মুখ্যার্থে অন্বয় না হইলে গৌণার্থ অর্থাৎ লক্ষণা করিতে হইবে। লক্ষণা তিন প্রকার। তন্মধ্যে একপ্রকার লক্ষণা জহদজহৎ লক্ষণা বা ভাগ-লক্ষণা। আচার্য শংকর এই ভাগ-লক্ষণার সহায়তায় বলেন যে 'তৎ' পদের অনভীষ্ট অংশ বাদ দিলে থাকে শুদ্ধচৈতন্য। ব্রহ্মবাচী 'তৎ' পদের অর্থ হইল শুদ্ধচৈতন্য আর জীব বাচী 'ত্বম্' পদের অর্থ হইল শুদ্ধচৈতন্য। সুতরাং জীবও যাহা ব্রহ্মও তাহাই। জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। ''জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ''।

বৈষ্ণবগোষ্ঠী শংকরের এই ব্যাখ্য স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন——

১। বেদবাক্যের অর্থ মুখ্যার্থেই করা বিধেয়। লক্ষণা করিলে শ্রুতির স্বতঃপ্রমাণতার হানি হয়। মুখ্যার্থ অর্থ যদি না হয় তাহা হইলে সবিনয়ে বলিতে হইবে, অর্থ বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু গৌণার্থ কল্পনা করিলে শ্রুতির অমর্যাদা হইবে।

২। ব্রহ্ম শংকরের মতে নির্গুণ। নির্গুণ ব্রহ্ম শব্দ বাচ্য নহেন। মুখ্যার্থ বা গৌণার্থ সকলই শব্দবিষয়ক কথা। যাহা শব্দের অবাচ্য সেই 'তৎ'-সম্বন্ধে লক্ষণার্থ গ্রহণ করা অযুক্তিকর।

৩। সামানাধিকরণ্য সংজ্ঞায় ঐক্য শব্দ যোগ করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। দুই বস্তুতে ঐক্য থাকিলে সমানাধিকরণ্যের কোন প্রসঙ্গই

থাকে না।

৪। মুখ্যার্থ সঙ্গতি না থাকিলেই গৌণার্থ করিতে হইবে। বৈষ্ণবেরা বলেন, মুখ্যার্থেই সঙ্গতি আছে সুতরাং গৌণার্থ করিব কেন? গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, জীব সাধনার দ্বারা আমার সাধর্ম্য লাভ করে (মম সাধর্ম্যমাগতাঃ, ১৪/২) অর্থাৎ জীব তখন ভগবানের অনেক গুণ প্রাপ্ত হয়। সাধর্ম্যলাভ করা অর্থ, ব্রহ্মের অনেক কল্যাণগুণের মধ্যে জীব অনেকগুলি লাভ করে। লৌকিক দৃষ্টান্তে বলা চলে পুত্রের মধ্যে পিতার অনেকগুণ থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ হন নাই। গান্ধীজির পুত্র গান্ধীজি হন নাই, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সন্তানও বঙ্কিমচন্দ্র হন নাই। আবার কবি দ্বিজেন্দ্রলাল (D.L. Roy)-এর পুত্র দিলীপ রায় পিতার স্বাধর্ম্য লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রকার যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ঈশ্বরের স্বধর্মতা লাভ করেন তাঁহাকে ভগবৎতুল্য বলা যায়। Godliness বা God likeness মানুষ যখন লাভ করিতে পারে তখন খানিকটা ঈশ্বরতুল্য হয়। লোক কথায় বলে, ভগবান্ বুদ্ধ ভগবান্ শংকর ইত্যাদি। ইহারা ভগবান্ নহেন, কিন্তু অনেকগুণে ভগবানের তুল্য। এই ভাবে জীব ব্রহ্মের তুল্যভাব লাভ করে। কিন্তু কখনই ব্রহ্ম বা ভগবান্ হইতে পারেন না।

৫। "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য হইলে ব্রহ্মসূত্রকার তাহা লইয়া একটি সূত্র করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই, বরং জীব ব্রহ্মতুল্য হইলেও কখনও যে ব্রহ্ম হইতে পারে না এইরূপ উক্তি করিয়াছেন ৪/৪/১৭ সূত্রে— "জগদ্ব্যাপারবর্জং" ইত্যাদি। মুক্তপুরুষের যে ঐশ্বর্য-প্রাপ্তির উল্লেখ আছে তাহা জগৎসৃষ্ট্যাদি যে পরমেশ্বরের ব্যাপার তাহা ব্যতীত বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ জগদ্ব্যাপারে মুক্তাত্মার কোন সম্পর্ক নাই, ইহা সম্পূর্ণ ব্রহ্মের ব্যাপার। অতএব জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন এইরূপ অর্থ করিলে শংকরের পক্ষে শ্রুতিবিরুদ্ধ উক্তি হয়।

৬। গীতা বলিয়াছেন, "মমৈবাংশো জীবলোকে" (১৫/৭), মুণ্ডকশ্রুতি (৩/১/৯) বলিয়াছেন "এষোঽণুরাত্মা", কঠোপনিষৎ (১/২৮) "অনুপ্রমাণাৎ", শ্বেতাশ্বতরে—

"বালাগ্রশতভাগব্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্প্যতে।।" ৫/৯

মহাপ্রভু বলিয়াছেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি পর্বে ৭ম পরিচ্ছেদ—

"ঈশ্বরতত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবর স্বরূপ যেন স্ফুলিঙ্গের কণ।।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও উদ্ধবের কাছে বলিয়াছেন ভগবান্—

'সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ' — সূক্ষ্ম সমূহের মধ্যে আমি জীব। এতগুলি প্রমাণকে উপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাসীগোষ্ঠী কি করিয়া জীবকে ব্রহ্ম বলিলেন তাহা বুঝা কঠিন।

'অদ্বৈতসিদ্ধি'কার মধুসূদন সরস্বতী অবশ্য উক্ত আপত্তিসকলের যথাযথ উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন, সভ্যতার আলো কিছু মাত্র প্রবেশ করে নাই, তখন ভারতীয় বেদান্তের আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। মানবীয় সভ্যতায় বেদান্তের দান সর্বশ্রেষ্ঠ। ভারতীয় জাতীয় জীবনের মূলাধার বেদান্ত। বেদান্ত ভারতবাসীর আত্মা। বেদান্তের আলো নিভিয়া গেলে ভারতীয় জাতীয জীবন ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। বেদান্তের মূল সত্যগুলি ভারতের প্রত্যেকটি নরনারীর জানা কর্তব্য।

এই গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছি তাহাকে 'ভাষ্য' নাম দিলে 'ভাষ্য' শব্দটির অমর্যাদা করা হয়। ইহাকে 'সূত্রার্থ সংক্ষেপ' বলা যাইতে পারে। ইংরাজী-নবীসরা হয়ত ইহাকে 'Scholasticism' বলিবেন। এই পর্যন্ত যে সকল ভাষ্য রচিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যথা—

১। আচার্য শংকরের 'শারীরকভাষ্য' — ৭ম-৮ম শতাব্দী
২। আচার্য ভাস্করের 'ভেদাভেদবাদ' — ৯ম-১০ম শতাব্দী
৩। আচার্য রামানুজের 'শ্রীভাষ্য' — ১১শ শতাব্দী
৪। আচার্য নিম্বার্কের 'বেদান্তপারিজাতসৌরভ' — ১১শ শতাব্দী
৫। আচার্য মধ্বের 'পূর্ণপ্রজ্ঞভাষ্য' — ১৩শ শতাব্দী
৬। আচার্য শ্রীকণ্ঠের 'শিবাদ্বৈতবাদ' — ১৩শ-১৪শ শতাব্দী
৭। আচার্য বল্লভের 'অনুভাষ্য' — ১৬শ-১৭শ শতাব্দী
৮। আচার্য বলদেবের 'গোবিন্দভাষ্য' — ১৮শ শতাব্দী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর আচার্য বলদেব বিদ্যাভূষণের পর ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বেদান্তের কোন মৌলিক ভাষ্য রচিত হয় নাই। এই দুই শতাব্দী বেদান্তচর্চার ক্ষেত্র ছিল অনুর্বর, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা অবশ্য এই দুই শতাব্দীতে বেদান্তচর্চার ক্ষেত্রে অনেক কাজ করিয়াছেন। পূর্ব পূর্ব কালের মত আবার কেহ বেদান্তসূত্রের ভাষ্য লিখিবেন এইরূপ

ভাবনা করাও আজ দুরাশা। এই যুগে যাঁহারা বেদান্ত-ভাষ্য লিখিবার যোগ্য মহাত্মা ছিলেন তাঁহারা কেহই ভাষ্য লিখেন নাই। শ্রীঅরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী দয়ানন্দ, মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ ও অনির্বাণ ইঁহারা কেহ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখেন নাই, লিখিলে তাহা অবশ্যই উপাদেয় হইত। আমি তাঁহাদের পদধূলির যোগ্য নহি। তথাপি কালিদাসের ভাষায়— "তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ।" এই চাপল্যের দোষ-ত্রুটি সুধীজনের ক্ষমার্হ।

গ্রন্থমধ্যে ছাপার ভুল-ত্রুটি অনেক রহিয়া গেল, সেইজন্য ক্ষমা প্রার্থী। গ্রন্থ মধ্যে অনেক কথায় পুনরাবৃত্তি আছে। পুনরাবৃত্তি সাহিত্যে দোষের, কিন্তু দার্শনিক সাহিত্যে বিশেষ দোষের নহে। দর্শনের পরিভাষায় পুনরাবৃত্তিকে 'অভ্যাস' বলা হয়। ব্রহ্মসূত্রকার অভ্যাসকে একটি যুক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছে। 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ'— সূত্রে সূত্রকার বলিয়াছেন, পরব্রহ্ম আনন্দময়; তাহার প্রমাণ বারংবার উক্তি। নানা ভাবে নানা স্থানে ব্রহ্মকে 'আনন্দময়', 'আনন্দঘন', 'আনন্দপ্রচুর' বলা হইয়াছে। শাস্ত্রকারদের মতে কোন একটি কথা যদি গ্রন্থের উপক্রমে একবার, উপসংহারে আর একবার ও মধ্যে বারংবার উক্ত হয় তবে তাহাকে একটি প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করা যায়। আমার পুনরুক্তি সেইরূপ হইয়া না থাকিলেও তাহাকে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখিবেন সুধীগণ।

এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি শ্রীঅরবিন্দ ভবনের 'শৃণ্বন্ত' পত্রিকায় কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশটি প্রবন্ধরূপে বাহির হইয়াছিল। পত্রিকায় যেরূপ ছাপা হইয়াছিল সেইরূপই গ্রন্থে ছাপা হইয়াছে। আর কোন সংশোধনের সুযোগ-সুবিধা হয় নাই। সেই সময় 'শৃণ্বন্ত' পত্রিকার। সম্পাদক ছিলেন "বেদমন্ত্রমঞ্জরী"র দ্রষ্টা শ্রীযুক্ত অমলেশ ভট্টাচার্য। উৎসাহদানে তাঁহার ও নবদ্বীপের অধ্যাপক ড. কুমারনাথ ভট্টাচার্য মহোদয়ের সহায়তা একান্ত আপনজন সুলভ। ঋগ্বেদের কুৎস ঋষির ভাষায় উপসংহারে এই কথা বলি, আমাদের নিকট তোমার দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া খুলিয়া দাও, "বি দুরো ন আবঃ" (ঋ. ১/১১৩/৪)।

শ্রীশ্রীদোলপূর্ণিমা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ | আশ্রব
শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন | **মহানামব্রত ব্রহ্মচারী**
রঘুনাথপুর, ভি.আই.পি. রোড।
কলিকাতা-৭০০ ০৫৯

জয় জগদ্বন্ধু হরি

"হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা"
মহাকবির এই শোভন উক্তি
অন্তরাকাশে উদয়ে
বৈদিক বাঙ্ময়ে অগ্নির তিন স্বরূপে আহুতি বিধান ধ্যানে
যাঁহাদের লিখন গম্ভীর, ভাষণ ভাস্বর
তাদৃশ
ভট্টাচার্য আচার্য শ্রীঅমলেশ
মুখোপাধ্যায় মুখ্য উপাধ্যায় শ্রীগোবিন্দগোপাল
চক্রবর্তী শাস্ত্রচারণ-চক্রবর্তী শ্রীধ্যানেশনারায়ণ
তিন উদ্‌গাতৃ করে
সমর্পণ করিলে—
তাঁহারা স্বকীয় উদার দৃষ্টিতে অণুকে মহান্ পদবী দানে
নিজ যজ্ঞাগ্নিপূতকরতঃ কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন।
ধন্যবাদ উক্তি দ্বারা মলিনতা দুষ্ট না করিয়া
তাঁহাদের ভজন-জুষ্ট প্রসাদ-পুষ্ট প্রজ্ঞানালোক-পরামৃষ্ট
অগ্রলেখ নিবন্ধত্রয় সম্বলিত
এই পুরট-পরমাণু-পুঁথিটি
উপস্থাপন করিলাম
শাস্ত্র-চক্ষু সহৃদয়-সজ্জন-সভাঙ্গনে
"আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে..."
এই সাধু উক্তি স্মরণে॥

অলমিতি—
বয়োভারে 'কর-ধৃত-কম্পিত...'
অবিদ্যাভারে নম্র নত
ব্রহ্মচারী মহানামব্রত।

বেদ-বেদান্ত : পূর্ব খণ্ড

ব্রহ্মসূত্র

বেদ-বেদান্ত

ব্রহ্মসূত্র

আভাস

বেদ হিন্দুধর্মের আদি ও সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। ইহা কত প্রাচীন তাহা লইয়া বিস্তর গবেষণা হইয়াছে। জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার স্থির করিয়াছেন খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দে বেদের জন্ম। ভারতীয় শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ৬০০০ খ্রীষ্টপূর্ব হইতে খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দ মধ্যে বৈদিক যুগ। কোথায় ১২০০, কোথায় ৬০০০ হাজার !

অতি প্রাচীন বেদজ্ঞ ঋষির কাছে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এই প্রশ্নকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। তিনি বলিবেন, বেদের আবার বয়স কি ? অপৌরুষেয় গ্রন্থের বয়সের প্রশ্ন তোলা বালকোচিত। একখানি গ্রন্থের বয়স জিজ্ঞাসা করা বালকোচিত কেন ? ঋষি বলিবেন, বেদ একখানি গ্রন্থমাত্র নহে, বেদ জ্ঞানভাণ্ডার। জ্ঞানের আবার বয়স কি ? দুই-এ দুই-এ চার হয়— ইহা গণিত শাস্ত্রের জ্ঞান। ইহার বয়স কত কেহ কি জিজ্ঞাসা করে ?

জ্ঞান অর্থ সত্যজ্ঞান। সত্যজ্ঞান মাত্রই অপৌরুষেয়। কোনও পুরুষ তৈয়ারী করেন নাই। তবে কি তাহা ঈশ্বর-কৃত ? বাইবেল যেমন ঈশ্বর- কৃত, 'Word of God' বলিয়া খ্রীষ্টান সম্প্রদায় বলেন— সেইমত ? বেদের ঋষি কিন্তু এইরূপ উত্তরও দিবেন না। বেদের ঋষি, বেদ ঈশ্বর-কৃত একথা কোথাও বলেন নাই। বেদ ঈশ্বর-কৃত বলিলে প্রশ্ন উঠিতে পারে, ঈশ্বরকে কে করিয়াছেন ? যদি উত্তর দেন, ঈশ্বরকে আবার কে করিবে ? তিনি স্বয়ম্ভু। ঋষি বলিবেন— বেদকে ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইয়া তাঁহাকে স্বয়ম্ভু না বলিয়া বেদকেই স্বয়ম্ভু বলিতে আপত্তি কোথায় ? সত্যকে সত্য করিতে ঈশ্বর লাগে না। বেদ যদি সত্য হয় তবে সত্যকে সত্য বানাইতে ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা কোথায় ? ঈশ্বর যে সত্য তাহার প্রমাণ বেদ। বেদ বলিয়াছেন ঈশ্বর আছেন, এই

জন্যই ঈশ্বর মানি। বেদকে দাঁড় করাইতে ঈশ্বরের অপেক্ষা নাই। বেদ নিজেই দাঁড়াইয়া আছেন। অনাদিকাল হইতে আছেন। অনন্তকাল থাকিবেন। সকলে বেদ ভুলিয়া গেলেও বেদের সত্যতার হানি হইবে না। পৃথিবীর সকলে যদি দুই-এ দুই-এ চার অস্বীকার করে বা ভুলিয়া যায়—— তাহা হইলেও দুই-এ দুই-এ চার—— এ সত্য অক্ষুন্ন রহিবে। এই কথাটি বুঝিলে ঋষির বাক্য 'বেদ অপৌরুষেয়' কথার কিছু তাৎপর্য আমরা বুঝিলাম।

কোনও এক সময় ছিল যখন বেদ লিপিবদ্ধ ছিল না। পিতা-পুত্র পরম্পরায় বা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল—— তাই বেদের নাম ছিল শ্রুতি।

করণাপাটব যাহার ছিল না—— অর্থাৎ উচ্চারণের করণ মুখের কোন অপটুতা বা অযোগ্যতা যাহার নাই, যাহার উচ্চারণযন্ত্র দিব্য—— সে-ই বেদ উচ্চারণ করিতে পারিত। যাহার শ্রবণযন্ত্র কর্ণের কোন দোষ নাই—— যাহার কর্ণ দিব্য—— সে-ই শ্রবণ করিত। সত্যদ্রষ্টা ঋষি দিব্য দৃষ্টিতে বেদজ্ঞানকে দেখিয়াছেন। ঋষি কিন্তু সত্যের স্রষ্টা নহেন, দ্রষ্টা। ঋষি দিব্য কণ্ঠে বেদ উচ্চারণ করিয়াছেন। দিব্য কর্ণ হইয়াছে যাহার গুরু কৃপায—— সে শ্রবণ করিত। বেদ শ্রুতি—— এই কথার ইহাই তাৎপর্য। সত্য সৃষ্টি হয় না। সত্য দৃষ্ট হয়, শ্রুত হয়, অনুভূত হয়, সত্যের সঙ্গে একাত্মতা হয়। সত্য ও তাহার দ্রষ্টা বা শ্রোতা বা অনুভবিতা—— সত্যের সঙ্গে একাকার হইয়া যায়। এইরূপ একাকারতা যাঁহাদের হইয়াছিল তাঁহাদের কণ্ঠ হইতেই উৎসারিত হইয়াছিল "একমেবাদ্বিতীয়ম্", "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা" মন্ত্র।

বেদ শ্রুতি। তাহা কখন লিপিবদ্ধ হইযাছে তাহা লইয়া গবেষণা চলিতে পারে; বেদের জন্মদিন লইয়া নহে। শব্দের তাৎপর্য অর্থে। কিন্তু বেদে তাহা নহে, বেদের রহস্য শব্দেই বিরাজমান। তার অর্থ আপনি আপনার যোগ্যতা বা দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যাহাই করুন না কেন—— সব অর্থই অর্থ, অথবা কোনটিই ঠিক অর্থ নহে। মন্ত্রের শব্দগুলি আপনাকে যথাযথভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে। তাহাতেই ফল বা শক্তি।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি—— গায়ত্রী একটি বৈদিক মন্ত্র। ইহার অর্থ আপনার সামর্থ্যমত যাই করুন—— বাংলা, ইংরেজী, জার্মান, রাশিয়ান অনুবাদ করুন, কিন্তু সেই তর্জমা পাঠে গায়ত্রী পাঠের ফল বা শক্তি বা রহস্য

ব্যক্ত হইবে না। যেভাবে সংস্কৃত অক্ষরে ব্যক্ত আছে সেই ভাবেই বলিতে হইবে। ঋষিরা ঐ অক্ষরগুলিই দর্শন করিয়াছেন। তাহাতেই বেদের তাৎপর্য সংস্থিত। অর্থের অনুগত শব্দ নহে। শব্দের অনুগত অর্থ। এই রহস্য অনুধাবন করা আমাদের মত অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য নহে।

আমরা হতভাগ্য বাঙালী। বহু শতাব্দী পূর্বেই আমরা বেদ হইতে সরিয়া গিয়াছি। যাঁহার তাৎপর্য উচ্চারণেই পর্যবসান, তাহা উচ্চারণ করিতে জানি না। সত্য ও শান্ত একই ভাবেই উচ্চারণ করি। দন্ত্য 'স' তালব্য 'শ'-এর ভেদ জানি না। দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ'-এর পার্থক্য জানি না। লিখিতে ভুল করিলে 'প্রুফ-রীডার' কাটিয়া দেয়। পরীক্ষার খাতায় ভুল লিখিলে শিক্ষক নম্বর কাটিয়া দেন— কিন্তু জিহ্বা যে উচ্চারণ ভুল করে, সে জন্য কাহারও কোন উদ্বেগ হয় না— একমাত্র বেদই ক্ষুণ্ণ হইয়া বিমুখ হইয়া থাকেন। গান গাইতে কড়ি কোমল বুঝি, সুরের উদারা, মুদারা, তারা বুঝি ; বৈদিক উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত বুঝি না। না বুঝিলে অন্য কোন অপচয় হয় না— কেবল বেদ পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন।

নিখিল বিশ্বমধ্যে যে একটি শাশ্বত সত্তা প্রচ্ছন্নভাবে প্রতিনিয়ত ক্রিয়মাণ, তৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাহাই প্রকৃত সত্যজ্ঞান। বেদ সেই জ্ঞানের ভাণ্ডার। যাঁহারা সেই জ্ঞানের সঙ্গে একীভূত হইয়াছেন তাঁহারাই নিগূঢ়তম অর্থ জানিতে পারেন, অন্যে পারে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন বেদের ছাত্র ছিলাম, দুইজন ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিতের কাছে বেদ পড়িয়াছি— সীতারাম শাস্ত্রী ও অনন্ত শাস্ত্রী। তাঁহারা অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। বেদ যেন প্রায় কণ্ঠস্থ এইরূপ মনে হইত। অতি গভীর মনোযোগে শুনিতাম। কিন্তু মনে হইত, বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা যেন অন্তর স্পর্শ করিল না। সায়ণকে অবলম্বন করিয়া পড়াইতেন। ম্যাক্সমূলার ও ম্যকডোনাল্ডের ইংরেজী ব্যাখ্যা পড়িয়াছি। রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ পরিশ্রম করিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু দশ সহস্র ঋকের একটিও বুঝিতে পারি নাই। যাহা বুঝিয়াছি তাহা প্রাণ স্পর্শ করে নাই। ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যায় যে কত পার্থক্য তাহার একটা নমুনা দিতেছি—

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তে অগ্নি দেবতা। মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। পঞ্চম ঋক্ হইতে অষ্টম ঋক্—

"অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ। দেবো দেবেভিরাগমৎ।।
যদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি। তবেত্তৎসত্যমঙ্গিরঃ।।
উপত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্। নমো ভরন্ত এমসি।।
রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিম্। বর্ধমানং স্বে দমে।।"

ঋগ্বেদের ঐ মন্ত্র কয়টির রমেশচন্দ্র দত্তকৃত অনুবাদ— "অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী, সিদ্ধকর্মা, সত্যপরায়ণ ও প্রভূত ও বিবিধ কীর্তিযুক্ত; তিনি দেব, দেবগণের সঙ্গে এ যজ্ঞে আগমন করুন। হে অগ্নি! তুমি হব্যদাতা যজমানের যে কল্যাণ করিবে, হে অঙ্গিরা, সে কল্যাণ প্রকৃত তোমারই। হে অগ্নি! আমরা দিনে দিনে দিনরাত মনের সাথে নমস্কার সম্পাদন করিয়া তোমার সমীপে আসিতেছি। তুমি দীপ্যমান, তুমি যজ্ঞের রক্ষক, যজ্ঞের অতিশয় দীপ্তিকারক এবং যজ্ঞশালায় বর্ধনশীল।"

এই চারি মন্ত্রের অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীঅরবিন্দ—

"May Agni, priest of the offering whose will towards action is that of the Seer, who is true, most rich in varied inspiration, come, a god with gods. The good that thou wilt create for the giver that is that truth of thee, O Angiras.

To thee day by day, O Agni, in the night and in the light we by the thought come bearing our submission—

To thee who shinest out from the sacrifice (or who governest the sacrifice) guardian of the Truth and its illumination increasing in thy own home."

এই ইংরেজী অনুবাদ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ নিজেই লিখিয়াছেন— "The defect of the translation is that we have had to employ one and the same word for সত্যম্ and ঋতম্, whereas we see in the formula ঋতং সত্যং বৃহৎ there was a distinction in the Vedic mind between the precise significances of the two words." *(The Secret of the Veda.* pp-59-60)

শ্রীঅরবিন্দ প্রশ্ন তুলিয়াছেন— "Who then, is this God Agni to whom language of so mystic a fervour is addressed, to whom functions so vast, so profound are ascribed? who is this guardian of the Truth ......What is the truth that he

guards? What is this good that he creates for the giver? Is it gold or horses or cattle that he brings or is it some divine riches?"

বৈদিক ঋষির মুখ্য বক্তব্য বেদশাস্ত্র ভরিয়া কি তাহা শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন— "The conception of a Truth-consciousness Supramental and divine, the invocation of the gods as powers of the Truth to raise man out of the falsehoods of the mortal mind, the attainment in and by this Truth of an immortal state of perfect good...."

এই আলোচনা পড়িলে মনে হয় যে, বেদের মন্ত্র দর্শনের জন্য একটা নূতন আলোকরশ্মি দৃষ্টিগোচর হইল।

বেদের সঙ্গে বেদান্তের যোগ কোথায় এই কথা বলিবার জন্য আমার প্রয়াস। বেদের তিনভাগ— কর্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। উপাসনাকাণ্ডকে কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করিলে দুই ভাগ থাকে। কর্মকাণ্ড লইয়া যত আলোচনা, শৃঙ্খলা ও সমন্বয়-সাধন তাহা করিয়াছেন জৈমিনি মুনি মীমাংসাসূত্রে। এই মীমাংসার নাম 'পূর্ব-মীমাংসা'। এই সূত্রগুলি বারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই সূত্রের উপর শবর স্বামীর ভাষ্য আছে।

জ্ঞানকাণ্ডকে শৃঙ্খলিত ও সমন্বয়যুক্ত করিয়াছেন বেদব্যাস বা ঋষি বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে। ইহার অপর নাম 'উত্তর-মীমাংসা'। এই সূত্রের উপর ভাষ্য করিয়াছেন— আচার্য শঙ্কর, রামানুজ, মধ্বাচার্য, নিম্বার্কাচার্য, বলদেব বিদ্যাভূষণ, প্রমুখ অনেকে। এই সকল ভাষ্যের অনুভাষ্যও আছে।

আমাদের অনেকেরই ধারণা বেদের সংহিতা অংশই কর্মকাণ্ড আর উপনিষদ্ অংশ জ্ঞানকাণ্ড। কিন্তু এই চলতি ধারণা ঠিক নহে। সংহিতার মন্ত্রমধ্যে বেদান্তের গভীর তত্ত্ব নিগূঢ় ভাবে নিহিত আছে, কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট। শ্রীঅরবিন্দ, অনির্বাণের দৃষ্টিতে দেখিলে কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া কোন ভেদ নাই। সমগ্র বেদ ভরিয়াই জ্ঞানতত্ত্বের কথা। দুই-একটি দৃষ্টান্ত— দশম মণ্ডলের একাশি সূক্তে বিশ্বকর্মা দেবতা—

'য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বদৃষির্হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ।'

'বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।'

'বাচস্পতিং বিশ্বকর্মাণমূতয়ে মনোজবং বাজে অদ্যা হুবেম।
স নো বিশ্বানি হবনানি জোষদ্বিশ্বশম্ভূরবসে সাধুকর্মা।।'

'আমাদের পিতা তিনি যিনি বিশ্বভুবন হোম করিতে বসিয়াছিলেন। হে প্রভু, তাঁহার সকল দিকে চক্ষু সকল দিকে মুখ, সকল দিকে হস্ত, সকল দিকে পদ। অদ্য এই যজ্ঞে যে বিশ্বকর্মাকে রক্ষার জন্য ডাকিতেছি, তিনি বাচস্পতি অর্থাৎ বাক্যের অধিপতি, মন তাহাতে সংলগ্ন হয়। তিনি সকল কল্যাণের উৎপত্তিস্থান, তাঁহার কর্ম মাত্রই চমৎকার। তিনি আমাদের সকল যজ্ঞ স্বীকার পূর্বক রক্ষা করুন।'

আবার দেখুন নাসদীয়সূক্ত (১০/১২৯) যাহাতে পরমাত্মা দেবতা—

"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো ন ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্।।" ইত্যাদি।

যে কালে কিছু নাই তাহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না, পৃথিবীও ছিল না, অতিদূরবিস্তার আকাশও ছিল না, আবরণ করে এমন কিছু ছিল না, তখন কি ছিল, কোথায় কাহার স্থান ছিল ? দুর্গম গম্ভীর জল কি তখন ছিল ? তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সে একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তখন অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্বব্যাপী বস্তু আবৃত ছিল।

এই নাসদীয়সূক্তে যে সুগম্ভীর প্রশ্ন তোলা হইয়াছে— যখন অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল তখন কি ছিল ? এই প্রশ্নের উত্তর যেন দেওয়া হইয়াছে পুরুষসূক্তে (ঋগ্বেদ, ১০/৯০)—

"পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি।।"

যাহা হইয়াছে, যাহা হইবে, সকলই সেই পুরুষ। তিনি অমরত্ব লাভে অধিকারী হন, কেননা তিনি অন্নদ্বারা অতিরোহণ করেন। তাঁহার এরূপ মহিমা, তিনি কিন্তু বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর। বিশ্বজীবসমূহ তাঁহার এক পাদ মাত্র। আর তিন পাদ আকাশে অমৃতময়। এই সকল মন্ত্রের স্থান কর্মকাণ্ডে কোথায় হইবে ? সকলই তো আত্মতত্ত্ব— বেদান্তের

কথা।

বেদগ্রন্থ আগাগোড়াই জ্ঞানময়। বেদের জ্ঞানতত্ত্ব শৃঙ্খলিত হইয়াছে ব্রহ্মসূত্রে। ব্রহ্মসূত্র বলিতে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" হইতে "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" পর্যন্ত পাঁচশত বাষট্টিটি সূত্রকে বুঝায়। ব্রহ্মসূত্রের চলিত নাম বেদান্তসূত্র। ব্রহ্মসূত্র ও বেদান্ত দুইটি শব্দই গীতায় পাওয়া যায়।

"ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ।" ১৩/৪

"বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্।" ১৫/১৫

গীতায় উল্লেখ থাকায় বুঝা যায় ব্রহ্মসূত্র গীতা হইতে প্রাচীন। বেদান্তের অপর নাম 'উত্তর-মীমাংসা' পূর্বে বলিয়াছি। উত্তর অর্থ, পরবর্তী। 'পূর্ব-মীমাংসা'র পরবর্তী। বেদান্তে ব্রহ্মতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি গূঢ় বিষয়ের গূঢ়তম বিচার আছে। যখন পৃথিবীর অন্যান্য স্থান অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন তখন ভারতীয় ঋষিরা পরম-তত্ত্বের চরম মীমাংসা করিয়াছেন। বেদান্ত ভারতের আত্মা, জাতির প্রাণের মূলাধার। এই সূত্রগুলির লেখক বাদরায়ণ। চলিত ঐতিহ্যমতে বেদব্যাস। বেদব্যাস ও বাদরায়ণ একই ব্যক্তি এই মত অনেকের বিশ্বাস, কারণ, ভাগবতে বেদব্যাসের পুত্র শুকদেবকে বাদরায়ণি বলা হইয়াছে। বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের প্রণেতা এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। কারণ ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে দুইটি সূত্রে বাদরায়ণ নাম আছে— তিনি যেন তৃতীয় ব্যক্তি এইরূপ ভাবে।

"তদুপর্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ॥" (১/৩/২৬)

অর্থাৎ, বাদরায়ণের মতে দেবতাদিগেরও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকার আছে। "ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি॥" (১/৩/৩৩)— অর্থাৎ আদিত্য প্রভৃতি কেবল জ্যোতিঃপিণ্ড নহেন, ঐ নামে চেতন দেবতাও আছেন।

মনে হয়, সূত্রকার বাদরায়ণের মত দ্বারা নিজপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। নিজের সম্বন্ধে নিজের ঐরূপ উক্তি প্রায়শ দৃষ্টিগোচর হয় না। বেদব্যাস সম্বন্ধে কথিত আছে, বেদ বিভাগ করিয়া চারিজন শিষ্যকে শিক্ষা দেন। পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ ও সুমন্তকে অথর্ববেদ উপদেশ করেন। তারপর ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন। বাদরায়ণ নামের মত আরও সাতজন পূর্বাচার্যের নাম সূত্রকার সূত্রমধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন— জৈমিনি, আশ্মরথ্য,

বাদরি, ঔড়ুলোমি, কাশকৃৎস্ন, কার্ষ্ণাজিনি, আত্রেয়। ইঁহারা সূত্রকারের পূর্ববর্তী বৈদান্তিক। ইঁহাদের মতামত পড়িলে কে কোন্ ধারায় তাহা খানিকটা অনুমান করা যায়।

যেমন, বৈদান্তিক কাশকৃৎস্ন। তাঁহার কথা ১/৪/২২ সূত্রে আছে। সূত্রটি এইরূপ—

"অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ॥"

অর্থাৎ আচার্য কাশকৃৎস্ন বলেন, পরমাত্মাই জীবভাবে অবস্থিত। ইহাতে বুঝা যায় ইনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন। পরবর্তীকালে আচার্য শঙ্কর সর্বশ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদী।

আচার্য আশ্মরথ্যের নাম আছে ১/২/৩০ সূত্রে— "অভিব্যক্তেরিতি আশ্মরথ্যঃ।" অর্থাৎ আচার্য আশ্মরথ্য বলেন যে, যদিও ব্রহ্ম সর্বব্যাপী ও মহান্, তথাপি উপসাকগণের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ তাঁহাদের প্রাদেশ-প্রমাণ হৃদয়েও তিনি আত্মপ্রকাশ করেন।

ইহাতে বুঝা যায় তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। পরবর্তীকালে আচার্য রামানুজ সর্বশ্রেষ্ঠ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী।

আচার্য ঔড়ুলোমির নাম আছে ১/৪/২১ সূত্রে। "উৎক্রমিষ্যত এবং ভাবাৎ ইতি ঔড়ুলোমিঃ॥" অর্থাৎ দেহ হইতে উৎক্রমণকারী জীবের ঐরূপ ভাব— ব্রহ্মভাব হয়। জীবাত্মা যখন মুক্ত তখন পরামাত্মা-ভাব প্রাপ্ত হয়। জীব বদ্ধাবস্থায় ভেদবিশিষ্ট। মুক্তাবস্থায় অভিন্ন। বদ্ধাবস্থায় ভিন্ন। ইহাতে মনে হয়, ঔড়ুলোমি ভেদাভেদবাদী ছিলেন। পরবর্তীকালে নিম্বার্কাচার্য সর্বশ্রেষ্ঠ ভেদাভেদবাদী। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যেরা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী।

বহু মতবাদের মধ্যে সূত্রকার নিজে কোন বাদী তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে পরবর্তী আচার্যপাদগণ সকলেই সূত্রকারকে সত্যবাদী জানিয়া তাঁহার প্রচারিত সত্যকে প্রপঞ্চিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। আমরাও তাহাই মনে করিয়া বেদান্তসাগরের মধ্যে কদলীবৃক্ষের এক টুকরা ক্ষুদ্র খণ্ড ভাসাইতেছি। বড় বড় জাহাজগুলির ঢেউয়ে-ঢেউয়ে চলিতে পারিব এই ভরসা।

প্রাচীনকালে ষোল অঙ্কটি পূর্ণতার জ্ঞাপক ছিল। চন্দ্রের ষোলকলা। বৈদিক পুরুষসূক্তের পুরুষ ষোড়শকল। ষোড়শী বলিলে বুঝায় পূর্ণযৌবনা। এক সময় ছিল ষোল আনায় এক টাকা। লোকটি চৌকোশ

বা 'স্কোয়ার' (Squre) বলিলে সর্বতোমুখী প্রতিভাশালী বুঝায়। ঐরূপ চারিটি স্কোয়ারে ব্রহ্মসূত্র। ব্রহ্মসূত্রের চারিটি অধ্যায়। প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটি পাদ। গোবিন্দভাষ্যের মনোহর ভাষায়—

"প্রথমাধ্যায়ে— সর্বেষাং বেদানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ,

দ্বিতীয়ে— সর্বশাস্ত্রাবিরোধঃ,

তৃতীয়ে— ব্রহ্মাপ্তি-সাধনানি,

চতুর্থে— তদাপ্তি ফলমিতি,

অধিকারী— নিষ্কামকর্ম-নির্মলচিত্তঃ সৎপ্রসঙ্গলুব্ধঃ শ্রদ্ধালু-শমদমাদিসম্পন্নঃ,

সম্বন্ধঃ— বাচ্যবাচকভাবঃ,

বিষয়ঃ— বিশুদ্ধানন্তগুণগণোঽচিন্ত্যানন্তশক্তিঃ সচ্চিদানন্দ-পুরুষোত্তমঃ,

প্রয়োজনম্— অশেষদোষবিনাশপুরঃসরঃ তৎসাক্ষাৎকার ইতি।"

বেদান্তের ভাষ্যকার-অনুভাষ্যকার আছেন অগণিত। তাঁহাদিগকে প্রধানত দুইটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা চলে। একটি নূতন পরিভাষা সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসীগোষ্ঠী ও বৈষ্ণবগোষ্ঠী দুইটি নাম দেওয়া চলে। সন্ন্যাসীগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী এইরূপ : পরমবস্তু যে পরব্রহ্ম তিনি এক অদ্বিতীয়। তিনি স্থির সর্বগত স্থাণু অচল। তিনি ব্যক্তি নহেন, নৈর্ব্যক্তিক সত্তা (Impersonal)। পক্ষান্তরে, বৈষ্ণবগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন, পরমবস্তু যে পরমব্রহ্ম তিনি এক অদ্বিতীয় তো নিশ্চয়ই কিন্তু ক্রিয়াশীল, ক্রিয়াশীল একটি পুরুষ, পুরুষোত্তম, একটি ব্যক্তিপুরুষ (Personality)। সন্ন্যাসীদের অনুভব, পরব্রহ্ম একটি স্থির (Static)সত্তা। বৈষ্ণবগোষ্ঠীর অনুভব, তিনি একটি গতিমান (Dynamic) সত্তা। এই দুইটি দৃষ্টিভঙ্গি ভালভাবে বুঝিলেই তাঁহাদের ভাষ্য অনুভাষ্য, পরস্পরের দোষ দেখানো, ভুল ধরা, খণ্ডন, মণ্ডন, পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, বিচার, সিদ্ধান্ত ও সর্ববিধ আলোচনা সম্বন্ধেই অভিজ্ঞতা লাভ করা যাইবে।

সন্ন্যাসীগোষ্ঠীর শিরোমণি আচার্য শঙ্কর, তাঁহার গুরুদেব গৌড়পাদ গোবিন্দপাদ, তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যধারায় পদ্মনাভাচার্য, সুরেশ্বরাচার্য, ভাস্করাচার্য, বাচস্পতি মিশ্র, সদানন্দ যতি, প্রমুখ হইতে শেষ 'অদ্বৈতসিদ্ধান্ত'কার মধুসূদন সরস্বতী পর্যন্ত অগণিত।

বৈষ্ণবগোষ্ঠীর সর্বাগ্রগণ্য রামানুজাচার্য, তাঁহার গুরুদেব যামুনাচার্য,

বল্লভাচার্য, নিম্বার্কাচার্য মধ্বাচার্য, বিজ্ঞানভিক্ষু, প্রমুখ শেষ গোবিন্দভাষ্যকার বলদেব বিদ্যাভূষণ পর্যন্ত বহুজন। প্রায় প্রত্যেক বিষয়ে দুই গোষ্ঠীর মতভেদ অনুধাবনীয়, আস্বাদনীয়, কখনও-বা বিস্ময়াবহ। কখনও কৌতুকাবহ। বলি এই জন্য যে, উভয় গোষ্ঠীর অবলম্বন একটি গ্রন্থ, ব্রহ্মসূত্র। ভূমি একটি কিন্তু দৃষ্টি দুইমুখী।

ব্রহ্মসূত্রের মুখ্য উপজীব্য শ্রুতি বা উপনিষদ্। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ও কৌষিতকী, সামবেদীয় কেন ও ছান্দোগ্য, যজুর্বেদীয় ঈশ, কঠ, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর, এবং অথর্ববেদীয় প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য এই তেরোখানি উপনিষদ্ই বিশেষভাবে বেদান্তের ভিত্তিভূমি। এইসব হইতেছে শ্রুতিপ্রস্থান। মহাভারত, তদন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও মনুসংহিতা— এইসব হইল স্মৃতিপ্রস্থান। ব্রহ্মসূত্রই ন্যায়প্রস্থান সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত।

শ্রুতিতে যতগুলি বিশিষ্ট মন্ত্র আছে তাহাদের তাৎপর্য যে ব্রহ্মবস্তু-স্থাপন ইহা ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের বিষয়। যেখানে যেখানে শ্রুতিবাক্যে আপাতবিরোধ দৃষ্ট হয়, বিচার দ্বারা তাহাদের বিরোধ সমাধান করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বেই যে তাহাদের পর্যবসান ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে তাহার সাধনা কি কি তাহা তৃতীয় অধ্যায়ে নির্ধারণ করা হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যা লাভের ফল কি তাহা চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। অধ্যায়গুলির সংক্ষিপ্ত নাম— সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন ও ফল।

পণ্ডিতেরা বলেন, প্রত্যেক শাস্ত্রের চারিটি মুখ্য জ্ঞাতব্য বিষয়। তাহাদের পারিভাষিক নাম অনুবন্ধ। অনুবন্ধ চতুষ্টয় : অধিকারী, সম্বন্ধ, বিষয় ও প্রয়োজন। বেদান্ত শাস্ত্রানুশীলনে অধিকারী কে ? বৈষ্ণবগোষ্ঠী বলেন যে— বেদের দুইভাগ, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডের জ্ঞান হইলে পরে জ্ঞানকাণ্ড বিচারণীয়। কর্মকাণ্ড অনুশীলনে বোধ জাগিবে যে কর্মফলমাত্রই অনিত্য। এই বোধ প্রকৃত পক্ষে জাগ্রত হইলে নিত্যবস্তু পরব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। তখন সে সকাম কর্ম ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম কর্ম করিতে আরম্ভ করে। নিষ্কাম কর্মফলে চিত্ত নির্মল হয়। তখন সর্বদা সৎপ্রসঙ্গে লোভ জন্মে ও শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা জন্মে। দেহ-মনের ইন্দ্রিয়লালসা দূরীভূত হয়। তখন সেই ব্যক্তি বেদান্ত অনুশীলনে অধিকারী হয়।

সন্ন্যাসীগোষ্ঠী বলেন, কর্মকাণ্ডের কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নাই।

শম-দম-তিতিক্ষা-গুণসম্পন্ন হইয়া ইহামুত্রফলভোগবিরোধী হইলে সঙ্গে সঙ্গে মুমুক্ষুত্ব জাগিলে সে বেদান্তে অধিকারী হয়। "ইহামুত্র-ফলভোগবিরাগ" অর্থ হইল— ইহ জগতের ধনৈশ্বর্যমানপ্রতিষ্ঠা-কামনাশূন্যতা ও পরলোকের স্বর্গলোক অমরাবতীর সুখ ভোগের লালসাশূন্যতা। আর মুমুক্ষুত্ব অর্থ মুক্তিলাভের প্রবল ইচ্ছার অন্তরে জাগরণ। ইহা না থাকিলে কোন ব্যক্তি বেদান্ত-শাস্ত্রপাঠে অধিকারী হয় না। যদি অনধিকারী হইয়া শাস্ত্র পাঠ করে তাহা হইলে সে শাস্ত্রজ্ঞ হইতে পারে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারে না।

প্রথম অনুবন্ধ অধিকারী বিচার। দ্বিতীয় অনুবন্ধ বিষয়। এই শাস্ত্রের বিষয় অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়বস্তু ব্রহ্ম। সন্ন্যাসীরা বলেন— বেদান্তের বিষয় নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম। বস্তুত ব্রহ্ম কোন জ্ঞানের বিষয় নহেন। কখনও জ্ঞানের তিনি বিষয় (object) হইতে পারেন না কারণ, তিনি 'অবাঙ্‌মনসো গোচরঃ'— একথা বেদ বলিয়াছেন যে তিনি বাক্য-মনের অগোচর। বাক্য দ্বারা যার কথা বলা যায় না, মন দ্বারা যাঁহাকে জানা যা না, তিনি জ্ঞানের বিষয়বস্তু হইতে পারেন না। কাজেই শ্রুতিও ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই। তবে শ্রুতি কি করিয়াছেন ? নিষেধ-মুখে প্রতিপাদন করিয়াছেন। ব্রহ্ম এই বস্তু ইহা বলেন নাই ; ব্রহ্ম এই বস্তু নহে এইরূপ বলিয়াছেন যথা— তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অনাদি, অনন্ত, অসীম ও অপ্রমেয়।

বৈষ্ণবেরা একরূপ কথা বলেন না। তাঁহারা বলেন, ব্রহ্ম আমাদের মত জীবের বাক্য-মনের অগোচর হইতে পারেন, কিন্তু তিনি শাস্ত্রগম্য। এই জন্যই তো শাস্ত্র। শাস্ত্রের আবির্ভাবও হইয়াছে ব্রহ্ম হইতে, আবার শাস্ত্রই ব্রহ্মকে জানাইয়া দিবে। শাস্ত্র জানাইয়াছেন, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দঘন, তিনি সবিশেষ, চিদাকার। তিনি পুরুষোত্তম, তিনি অশেষ-কল্যাণগুণের আকর। ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই সকল তত্ত্বকথা তো শাস্ত্র হইতেই জানিয়াছি। সুতরাং তিনি শাস্ত্রের বিষয়। শাস্ত্রই তাঁহাকে জানেন। আর জানেন, যাহাকে তিনি জানান, তিনি কৃপা করিয়া যাহার কাছে আপনাকে প্রকাশ করেন। একথাও শাস্ত্রই জানাইয়াছেন।

এই গেল দ্বিতীয় অনুবন্ধ "বিষয়"। তৃতীয় অনুবন্ধ "সম্বন্ধ"। শাস্ত্রের সঙ্গে ব্রহ্মবস্তুর সম্বন্ধ কি ? বৈষ্ণবেরা বলেন— প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক সম্বন্ধ। ব্রহ্মবস্তু প্রতিপাদ্য। শাস্ত্র তাঁহার প্রতিপাদক। সন্ন্যাসীরা বলেন, ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য বস্তু হইতে পারেন না। কে তাঁহাকে

প্রতিপাদন করিবে ? কি উপায়ে করিবে ? শাস্ত্র কেবলমাত্র নিষেধমুখে 'নেতি নেতি নেতি'— তিনি ইহা নহেন, উহা নহেন, আমরা যাহা জানি বুঝি তাহার কিছুই নহেন, এই ভাবে তাঁহার কথা বলিয়াছেন। সুতরাং শাস্ত্রের সঙ্গে ব্রহ্মের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক সম্বন্ধ এই কথা বলা সুষ্ঠু নহে।

চতুর্থ অনুবন্ধ "প্রয়োজন"। বেদান্তশাস্ত্র-অনুশীলনের প্রয়োজনটি কি ? প্রয়োজন কি না জানিলে কেহ কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। বৈষ্ণবেরা বলেন, বেদান্তানুশীলনের প্রয়োজন ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার- লাভ। সাধনা দ্বারা চিত্তদর্পণ মার্জিত হইলে, দেহ মনের মালিন্য দূর হইয়া গেলে, সুনির্মল চিত্তদর্পণে তিনি বিম্বিত হন। তারপর গুরুকৃপানুগত্যে ভজনফলে তাঁহার দর্শন মিলে। ঈশ্বরসাক্ষাৎকার হয়। তাঁহার ক্রীড়া, তাঁহার লীলা পরম আস্বাদনীয় বস্তু হয়। তাঁহার নিত্যলীলায় সঙ্গী হওয়া যায়। বেদান্তপাঠের এই প্রয়োজন। সন্ন্যাসীগোষ্ঠী একথা বলেন না। তাঁহারা বলেন— ভজন-সাধন বা কৃপাবলে যাঁহার দর্শন পাওয়া যায়, তিনি ব্রহ্ম নহেন ; তিনি ব্যবহারিক ব্রহ্ম, ঔপচারিক ব্রহ্ম, মায়োপহিত ব্রহ্ম। যিনি পারমার্থিক সত্য তাঁহার সাক্ষাৎকার হয় না, হইতেই পারে না। ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতি হয়। এই ঐকাত্ম্যবোধই শাস্ত্রানুশীলনের প্রয়োজন। একথাও ঠিক হইল না। শাস্ত্র এই ঐকাত্ম্যবোধ আনিয়া দিতে পারে না। এই ঐকাত্ম্যবোধ স্বতঃসিদ্ধ। কেহ তাহা করিয়া দিতে পারে না। করিয়া দিবার প্রয়োজনও নাই। ঐকাত্ম্যবোধের পক্ষে কিছু বাধা আছে। সেই বাধার নাম অবিদ্যা। গৃহে দ্রব্য আছে দেখিতে পাই না কারণ, গৃহ অন্ধকার। আলো আসিলে অন্ধকার দূর হয় তখন গৃহস্থিত দ্রব্য দেখি। আলো দ্রব্যকে সৃষ্টি করে না। দর্শনের বাধাকে দূর করিয়া দেয় মাত্র। তদ্রূপ ব্রহ্মৈকাত্ম্যবোধের পক্ষে বাধক অবিদ্যা। শাস্ত্রানুশীলনে সেই বাধাস্থানীয় অবিদ্যা দূরীভূত হইলে স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বানুভূতি লাভ হয়। লাভ হয় কথাও যথার্থ নহে। কারণ, যার অনুভূতি আর অনুভূতি পৃথক্ বস্তু নহে। সে তাঁহার শাশ্বত অনুভূতিতে স্থিত হয়। তখন অনুভাবিতা আর অনুভূতি দুইটি বস্তু থাকে না। যাহা থাকে তাহা চিন্ময়ানুভূতি-মাত্রম্।

সুতরাং শাস্ত্রের প্রয়োজন—— অবিদ্যার বিনাশ।

ব্রহ্মসূত্রে চারিটি অধ্যায়ে একথা বলা হইয়াছে। চারিটি অধ্যায়ে ষোলটি পাদ। সূত্রের সংখ্যা পাঁচশত বাষট্টি (৫৬২)। প্রত্যেকটি পাদে

অনেকগুলি অধিকরণ। অধিকরণ শব্দটি প্রকরণ অর্থে ব্যবহৃত। গ্রন্থে মোট একশত সাতষট্টি (১৬৭)টি অধিকরণ আছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় ব্রহ্মসূত্রে কতগুলি বিষয় বিবেচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। অধিকরণ- সূত্রগুলিই মুখ্যসূত্র। অপর সূত্রগুলিকে গৌণসূত্র বলা চলে।

অনেক সূত্র অতি সংক্ষিপ্ত। সূত্রকারের অন্তরের কথাটি যে কি তাহা বুঝা অনেকস্থলেই দুঃসাধ্য। কোনও না কোনও ভাষ্যকারের চশমা চোখে না লাগাইয়া ব্যাখ্যায় অগ্রসর হওয়া একরূপ অসম্ভব। ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত আমরা, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকা উচিত সূত্রকারের অন্তরের কথাটি আলোতে টানিয়া আনা, ইহার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইলেও চেষ্টায় ব্রতী হইতে হইবে। আমরা অধিকরণ ধরিয়া অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক। ভরসা, যিনি 'বেদান্তকৃৎ' তাঁহার কারুণ্য।

ব্রহ্মসূত্র

প্রথম অধ্যায় : সমন্বয়
প্রথম পাদ

১। জিজ্ঞাসাধিকরণ—

সূত্র— অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা॥ ১/১/১

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম সূত্রে চারিটি শব্দ। অথ, অতঃ, ব্রহ্ম, জিজ্ঞাসা। অতঃপর অতএব ব্রহ্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা। অথ শব্দটি অব্যয়। মঙ্গল-দ্যোতক। ইহার অর্থ করা হয় অতঃপর। কাহার পর অতঃপর? প্রশ্ন জাগে। ইহা লইয়া আচার্যপাদগণের বহুবিচার। সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বলেন, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্র-ফলভোগবিরাগ, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষর, শ্রদ্ধা, সমাধান ও মুমুক্ষত্ব এই কয়টি গুণ থাকিলেই ব্রহ্ম- বিচারে অধিকার জন্মে। বৈষ্ণবগোষ্ঠী একথা মানেন না। তাঁহারা বলেন, ঐ সকল গুণ অত সহজ নহে। মানুষ শুকদেব হইয়া জন্মে না। সকল কর্ম ও কর্মফলের অনিত্যতার জ্ঞান হইলে ব্রহ্মবিদ্যায় প্রবৃত্তি জন্মে। ঐ অনিত্যতার জ্ঞানের জন্য কর্মমীমাংসা-শাস্ত্র পাঠ করিতে হইবে। শুধু পাঠ করিলে হইবে না— সেই অনুসারে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ তিন আশ্রম অতিক্রম করিতে হইবে। শাস্ত্রপড়া জ্ঞান নহে। উহা বাস্তব জীবনে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া পরিপক্ক হইবে। তারপর সকল কর্মই অনিত্য, একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য, এই জ্ঞান হৃদয়ে উদয় হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের যোগ্যতা হইবে যখন, তখন ত্যাগব্রত লইলে বর্ণাশ্রম ধর্ম ধ্বংস হইবে। পণ্ডিত কালিদাসের কথা—

"শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্দ্ধকে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্॥"

শৈশবে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনে বিষয় ভোগ, বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি। তারপর চতুর্থাশ্রমে সংসার ত্যাগ করিয়া প্রকৃত সন্ন্যাসী হইয়া ব্রহ্মচিন্তা করণীয়।

কর্মমীমাংসা ধর্মমীমাংসার পর ব্রহ্মমীমাংসা। যখন তখন নহে। সন্ন্যাসীগোষ্ঠী বলেন— কর্মমীমাংসার সঙ্গে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কোন যোগ নাই। বৈষ্ণবগোষ্ঠী বলেন, কর্ম ও ব্রহ্ম একটি জীবনধারার মধ্যে। সন্ন্যাসীরা সে কথায় ভ্রূক্ষেপ করেন না।

দুই গোষ্ঠীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারের মধ্যে না গিয়া আমরা সহজ-সরলভাবে একটা কথা বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছি। অতঃপর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। জীবনের কর্মব্যস্ততার পর যখন অবসর পাওয়া যায়, দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদনের পর যখন অবকাশ মিলে, তখন দিনান্তে, সপ্তাহান্তে, মাসান্তে, বৎসরান্তে ও কর্মব্যস্ত জীবনের শেষ ভাগে বানপ্রস্থ কালে ব্রহ্মচিন্তা করণীয়। অবসরকালে কি করণীয়? বেদান্ত বলেন, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করণীয়। কেন করণীয়? তার কারণ বলি: মানুষ মাত্রই শান্তিকামী। কিন্তু মানুষের জীবন অশান্তিতে ভরা। এই অশান্তির কারণ ক্ষুদ্রত্ব অল্পত্ব। ক্ষুদ্রচিন্তায় জীবনে ক্ষুদ্রতা আনে। ক্ষুদ্রতায় অশান্তি আনে। শাস্ত্র বলিয়াছেন 'নাল্পে সুখমস্তি'। অল্পতায় সুখ নাই। ক্ষুদ্রতায় সীমাবদ্ধতায় শান্তি নাই। শান্তি যদি চাও তবে বড় বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক করিতে হইবে। যিনি সর্বাপেক্ষা বড় তিনি ভূমা, তিনি ব্রহ্ম। তাঁহার সঙ্গ প্রসঙ্গ করিলেই বড় হইয়া যাইবে। ব্রহ্ম অর্থ বড়, সর্বাপেক্ষা বড়। শুধু তাহাই নহে। ব্রহ্ম শুধু বড় নহেন, তিনি অপরকে বড় করেন। যে তাঁহার সংস্পর্শে আসে সে-ই বড় হইয়া যায়। বড় হইলেই শান্তি। সংসারের কার্যে দিবস-রজনী ছোট বিষয় লইয়া থাকিতে হয়। ক্ষুদ্র বিষয়ের চর্চা করিতে হয়। সেইজন্য বলা হইয়াছে যখনই অবকাশ আসিবে— সারা দিনে, সারা মাসে, সারা বৎসরে, সারা জীবনে— যখন অবকাশ তখনই ব্রহ্মবস্তু লইয়া আলোচনা করিবে।

বর্তমানে অবসর বিনোদন একটা মহাসমস্যা। কর্মের দিন তো কর্ম করি। ছুটির দিনে কি করিব? শাস্ত্র বলিতেছেন, ছুটির দিনে সর্বাপেক্ষা যিনি বড়, যিনি পরম মহান্, পারমার্থিক সত্য, অসত্য-স্পর্শশূন্য সত্য, ঋতম্— তাঁহার বিষয় জানিতে চেষ্টাপরায়ণ হও। অবসর সার্থক হইবে। জিজ্ঞাসাধিকরণের মোটামুটি কথাটি এই। এই কথাটিতে কিন্তু দুই গোষ্ঠীর মত-বিরোধ নাই।

'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'— ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসা। এই ষষ্ঠী বিভক্তি, সম্বন্ধে নহে; 'কর্মণি ষষ্ঠী'। জিজ্ঞাসার কর্ম ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কি বস্তু তাহা পরবর্তী সূত্রে বলিবেন। এখন জিজ্ঞাসা কথাটির তাৎপর্য অনুসন্ধেয়। জ্ঞাতুমিচ্ছা— জিজ্ঞাসা। জানিবার ইচ্ছা। ইচ্ছার একটি তাৎপর্য থাকে। অভিলাষিত বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান লাভ হইতেছে এই তাৎপর্য। "ইচ্ছয়া ইষ্যমান জ্ঞানম্ ইহ বিধীয়তে"— তাপত্রয়ক্লিষ্ট জীবের মোক্ষলাভের জন্য জিজ্ঞাসা। এইটিই প্রয়োজন।

পূর্বে বলিয়াছি প্রকরণ অর্থ অধিকরণ; মাত্র তাহাই নহে। অধিকরণ শব্দটি মীমাংসা শাস্ত্রের একটি পরিভাষা। ইহার অর্থ—

"বিষয়ঃ সংশয়শ্চৈব বিচারো নির্ণয়স্তথা।
প্রয়োজনেন সহিতমেতৎ স্যাদঙ্গপঞ্চকম্।।"

অধিকরণের পাঁচটি অঙ্গ : বিষয়, সংশয়, বিচার, নির্ণয় ও প্রয়োজন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অধিকরণে ১। বিচার্য বিষয়— ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ২। সংশয়— ব্রহ্মবিষয় জিজ্ঞাসা কর্তব্য কি না। ৩। বিচার— স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর প্রতিপাদনে শব্দের সামর্থ্য নাই। ব্রহ্ম একটি সিদ্ধান্ত নহে, ইহা একটা স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। তাঁহার প্রতিপাদনে বেদান্তবাক্যের প্রামাণ্য নাই। ৪। নির্ণয়— স্বতঃসিদ্ধ বস্তুবোধনেও শব্দের নিশ্চয় সামর্থ্য আছে। অতএব ব্রহ্মবোধক বেদান্তবাক্যেরও নিশ্চয় প্রামাণ্য আছে। ৫। প্রয়োজন— মোক্ষপ্রাপ্তি ইহার বিশেষ প্রয়োজন। অতএব ব্রহ্ম-মীমাংসা শাস্ত্র আরম্ভ করা উচিত।

২. জন্মাদ্যধিকরণ—

যে ব্রহ্মবস্তু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা সেই বস্তুর পরিচয় কি তাহা বলিতেছেন পরবর্তী অধিকরণে। এই অধিকরণের নাম— 'জন্মাদ্যধিকরণ'। একটি মাত্র সূত্র—

সূত্র— জন্মাদ্যস্য যতঃ।। ১/১/২

জন্মাদি—জন্ম, স্থিতি ও লয়। অস্য—এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চের। যতঃ—যাহা হইতে। যাহা হইতে এই দৃশ্যমান জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে— তিনিই ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম সূর্যের মত স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। তাঁহার এই পরিচয় দিবার কি প্রয়োজন আছে? প্রয়োজন আছে। আমরা ছান্দোগ্য শ্রুতিতে (৭/২৩/১) পাই—

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্ ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।"

ভূমাতেই সুখ। অল্পে সুখ নাই। অতএব ভূমাকে জানা প্রয়োজন। আবার বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে (২/৪/৫) পাই—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"

আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মননীয় ও অবিচ্ছিন্নভাবে তৈলধারার ন্যায় ধ্যানের যোগ্য। এই দুই মন্ত্র একত্র পাঠে মনে সংশয় জাগে ভূমাকে জানিতে বলিয়াছেন, আবার আত্মাকেও জানিতে বলিয়াছেন। তবে ভূমাই কি আত্মা? আত্মা বলিতে আমরা সাধারণতঃ আমাদের জীবাত্মাকেই বুঝি। তাহা হইলে জীবাত্মাই ভূমা এইরূপ সংশয় জাগিতে

পারে। তাই ব্রহ্মের লক্ষণ বলিতেছেন— ব্রহ্ম ভূমা, সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত। এই সকল তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ। জগতের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধের উল্লেখে যে পরিচয় তাহা তটস্থ-লক্ষণ। সেই লক্ষণ বলিতেছেন, ব্রহ্ম জীবাত্মা নহেন, তিনি পরমাত্মা। ঐ স্থানে পরমাত্মা অর্থেই আত্মা বলিয়াছেন। কারণ, ব্রহ্ম এই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ। ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি, ব্রহ্ম দ্বারা স্থিতি, ব্রহ্মেই লয়প্রাপ্তি। বিশ্বজগৎ সম্পর্কে তিনি অপাদান, করণ ও অধিকরণ কারক। ব্রহ্মই পরমাত্মা, জীবাত্মা নহে।

ব্রহ্মের এই তটস্থ পরিচয় তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে (৩/১) স্পষ্ট— "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি। তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি।"

শ্রুতিতে অন্যত্র আরও সংক্ষেপে আছে— 'তজ্জলানিতি' অর্থাৎ তজ্জ, তল্ল, তদন্। তাহাতে জাত, তাহাতে লয়প্রাপ্ত ও তাহাতে প্রাণবন্ত (অনিতি প্রাণিতি = জীবন্তি)। তৎ+জ+ল+অন্।

ব্রহ্মের এই পরিচয় শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকেও দৃষ্ট হয়।

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্" ইত্যাদি। এই প্রত্যক্ষ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যাঁহা হইতে হইতেছে, যিনি জাগতিক সকল বস্তুতে অন্বয় ও ব্যতিরেকরূপে বর্তমান, অর্থাৎ যাঁহার সত্তায় সমুদয়ের সত্তা, যাঁহার অসত্তায় অসত্তা, তিনি সর্বজ্ঞ, স্বরাট, তিনি সত্য, তাঁহাকে ধ্যান করি। এই প্রথম শ্লোকের পর দ্বিতীয় শ্লোকে ভাগবত তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন— 'বেদ্যং'। তিনি "অবাঙ্মনসো গোচরঃ" হইলেও সমকালেই বেদ্যও বটেন। যদি তাহা না হইতেন তাহা হইলে ব্রহ্মসূত্র রচনার বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কোন প্রয়োজন হইত না।

'জন্মাদ্যস্য' সূত্রের আক্ষরিক ব্যাখ্যা বৈষ্ণবগোষ্ঠী যেরূপ করিয়াছেন সন্ন্যাসীগোষ্ঠীও তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু সন্ন্যাসীগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন, ব্রহ্ম জগৎসৃষ্টি করেন নাই। সৃষ্টিক্রিয়ার কর্তা ব্রহ্ম হইতে পারেন না। কর্তা তো হইতেই পারেন না, কোন ক্রিয়ার সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্কও থাকিতে পারে না। অপাদান, করণ, অধিকরণ, কোন কারক হইতে পারেন না। কোন ক্রিয়ান্বয়ী হওয়াই ব্রহ্মের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। ক্রিয়া অর্থাৎ শক্তির ক্রিয়া। ব্রহ্ম নিঃশক্তিক নিষ্ক্রিয়। সুতরাং কোন প্রকার ক্রিয়ার সঙ্গে

যুক্ত নহেন। কোন ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হইতে হইলে প্রথমে চাই 'প্রয়োজন'। তারপর চাই 'ইচ্ছা', তারপর চাই 'উদ্যম'। এই তিনটির একটিও ব্রহ্মতে থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম পূর্ণতম। তাঁর কোন প্রয়োজন বা ইচ্ছা জাগিতে পারে না। উদ্যমের তো কথাই নেই। কেহ কেহ মনে করেন, ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান্, তিনি সবই পারেন— ইহা ঠিক নহে। কারণ, ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ নহেন। তবে যে শাস্ত্র তাঁহাকে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ বলিয়াছেন ; তাহা পারমার্থিক নহে, ঔপচারিক।

কথাটি আরও ভাল করিয়া বুঝা দরকার। সত্য দুই প্রকার— পারমার্থিক সত্য ও ব্যাবহারিক সত্য। প্রাচীন দৃষ্টান্ত না দিয়া, অতি আধুনিক দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছি। সূর্য প্রত্যহ সকালে উদিত হয় ও সন্ধ্যায় অস্ত যায়। এইজন্য দিবারাত্র হয়। সূর্য আমাদের নিকটে আসে আবার দূরে যায়, এইজন্য শীত গ্রীষ্ম অনুভূত হয়। ইহা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। কিন্তু ইহা ব্যাবহারিক সত্য। পারমার্থিক সত্য এই যে, সূর্য একই স্থানে স্থির আছেন, তাঁহার কোন গতি নাই, উদয় অস্ত নাই। তিনি দিবা-রাত্র ভেদ বা শীত-গ্রীষ্ম ভেদের কারণ নহেন। পারমার্থিক সত্যের ভিত্তিতে স্থিত আছে ব্যাবহারিক সত্য। ব্যাবহারিক সত্যের অপর নাম ঔপচারিক সত্য। ইহারই অপর নাম মিথ্যা বা সত্যের উপরে মিথ্যার অধ্যাস। এই সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটি পারমার্থিক সত্য ব্রহ্মের উপরে অধ্যস্ত।

জগৎ ব্রহ্মতে অধ্যস্ত বা মিথ্যা — সন্ন্যাসীদের নিকট হইতে ইহা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। তবেই বৈষ্ণবগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁহাদের পার্থক্য পরিষ্কার হইবে। পূর্বে বলিয়াছি, আচার্য শঙ্কর সন্ন্যাসীগোষ্ঠীর শিরোমণি। তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের উপর সমগ্র বেদান্ত-দর্শন প্রতিষ্ঠিত। আচার্য শঙ্করের ভাষ্য প্রশান্ত, গম্ভীর ও প্রাঞ্জল। ভাষ্যারম্ভের পূর্বে তিনি একটি ভূমিকা লিখিয়াছেন। এইরূপ ভূমিকা আর কেহ লেখেন নাই। এই ভূমিকার চলতি নাম 'অধ্যাস-ভাষ্য' এই অধ্যাস-ভাষ্যে তাঁহার যে প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছে তাহা দার্শনিক জগতে অতুলনীয়।

ভূমিকায় অধ্যাস-ভাষ্যে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার মূল কথাটি হইতেছে—

প্রত্যেক লোকই নিজেকে 'আমি' বলিয়া জানে। 'আমি'র প্রকৃত স্বরূপ অনেকেই জানে না। মানুষ কখনও বলে— আমার দেহ,

আমার ইন্দ্রিয়, আমার মন, আমার বুদ্ধি। আবার বলে— আমি অন্ধ, আমি খঞ্জ, আমি দুঃখী, আমি ক্ষুব্ধ, আমি সুখী। অন্ধ বা খঞ্জ তাহার দেহের অঙ্গ। তাহার বলা উচিত আমার দেহ অন্ধ, দেহ খঞ্জ। দুঃখী বা সুখী তাহার মন, কিন্তু বলে— আমি দুঃখী, আমি সুখী। অতি সাধারণ মানুষেরও আমি জ্ঞানের কোন স্থির অবলম্বন নাই। মানুষের সামান্য তারতম্য জ্ঞান থাকিলেও, 'আমি'র প্রকৃত স্বরূপবোধ তাহার নাই। সুতরাং 'আমি' কে? এই আত্মবোধ তাহার প্রয়োজন। আমি কি বা কে? এই বিচার করিতে গেলেই দেখা যায় যে, 'আমি'-জ্ঞান কখনও দেহাদিকে অবলম্বন করিয়া, কখনও চেতনাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয়। আত্ম-চেতনা হইল 'চিৎ' বস্তু, দেহ হইল 'জড়' বস্তু। আত্মা—চিৎ বস্তু, অতএব প্রকাশক। দেহাদি প্রকাশ্য। আমি বা আত্মা হইল দ্রষ্টা, দেহ হইল দৃশ্য। প্রকাশক ও প্রকাশ্য, দ্রষ্টা ও দৃশ্য অবশ্যই পৃথক্। অতএব যখন দেহাদিতে আত্মজ্ঞান হয় তখন তাহা ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তিরই দার্শনিক নাম—অধ্যাস। অবিদ্যাহেতু আমাদের সত্য-মিথ্যা একীভূত করিয়া— এই আমি, ইহা আমার, এই প্রকার স্বাভাবিক লোকব্যবহার চলিয়া থাকে। ইহার মূলে আছে 'অধ্যাস'।

এই 'অধ্যাস' বস্তুটি কি—তাহার সংজ্ঞা বলিয়াছেন শঙ্কর— "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টেরবভাসঃ"। আমি পশুপক্ষীর গমনাগমন দেখি। ইহার দ্বারা গতি সম্বন্ধে একটা জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞানটি স্মৃতিরূপে আমার মধ্যে থাকে। যখন প্রভাতে সূর্যকে উপরে উঠিতে দেখি তখন স্মৃতিরূপ গতিজ্ঞান সূর্যতে আরোপ করি এবং মনে করি সূর্য গতিমান। এই আরোপটি হইতেছে 'অধ্যাস'। যে আধারে 'অধ্যাস' হয় তাহার নাম 'অধিষ্ঠান'। যাহা অধ্যস্ত হয় তাহা মিথ্যা। মিথ্যা অর্থ অলীক নহে। আকাশকুসুম শশশৃঙ্গ ইহারা অলীক। ইহাদের কোন সত্তা বা অধিষ্ঠান নাই। রজ্জুতে সর্পভ্রম— রজ্জুতে যে সর্পজ্ঞান হয় তাহা মিথ্যা। কিন্তু অলীক নহে। সর্প এই মিথ্যা-জ্ঞান অধিষ্ঠিত হইয়াছে রজ্জুতে। রজ্জু কিন্তু সত্য।

সুতরাং 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সূত্রের অর্থ হইবে এইরূপ— জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যাঁহাতে উপচারিত বা অধ্যস্ত তিনি ব্রহ্ম। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'—ইহা হইল সন্ন্যাসীগোষ্ঠীর মত।

সুতরাং "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রের অর্থ, সন্ন্যাসীগোষ্ঠীর মতে হইবে এইরূপ : জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যাঁহাতে অধ্যস্ত বা উপচারিত তিনি

ব্রহ্ম, ব্রহ্মই সত্য। দৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা।

সন্ন্যাসীগোষ্ঠীর এই অধ্যাসবাদ বৈষ্ণবগোষ্ঠী গ্রহণ করেন নাই। যত্নের সহিত কঠোরভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, অধ্যাস কথাটি বুঝিতে ও বুঝাইতে যতই মুখরোচক হউক—ঐ শব্দ বৈদিক শাস্ত্রে কোথাও নাই। উহা ঐ গোষ্ঠীর মন-গড়া। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হয়, মরীচিকায় জলভ্রম হয়— ইহা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার (psycological fact)। উহার সঙ্গে বিশ্বজগতের আধ্যাত্মিক (metaphysical) কোন সম্পর্ক নাই। উহা তাত্ত্বিক নহে, মানসিক। ঐ ভ্রান্তি স্থায়ী নহে, সাময়িক। যদি ধরিয়া লই উহা তাত্ত্বিক তাহা হইলেও যুক্তিতে দাঁড়ায় না কারণ, রজ্জুতে সর্পভ্রম হইতে অন্তত তিনটি বস্তু লাগে। রজ্জু, সর্প ও যাহার ভ্রম সেই ব্যক্তিটি। জগতে ব্রহ্ম ছাড়া যখন কিছুই নাই, সব মিথ্যা, তখন ঐ তিনটি বস্তু কোথায় মিলিবে? মিথ্যাদৃষ্ট সর্পটি ঐ স্থানে না থাকুক, কোথাও না কোথাও তো আছে। জগৎটা মিথ্যা হইলেও তাহার সত্তা কোথাও না কোথাও থাকিতে হইবে।

অধিকন্তু রজ্জুতে যে সর্প দেখা উহা সবটাই মিথ্যা নহে— আংশিক দর্শন। রজ্জুতে ও সর্পে যে যে অংশে সাদৃশ্য আছে তাহাই দেখিয়াছি, তাই সর্প মনে করিয়াছি। আলো হাতে লইয়া দেখিলে সর্পের সঙ্গে রজ্জুর যে বৈসাদৃশ্য তাহা দেখিতে পাইব, তখন ভ্রান্তি দূর হইবে। সুতরাং রজ্জুতে সর্প দর্শন মিথ্যা-জ্ঞান নহে, আংশিক জ্ঞান।

অধ্যাসবাদের আর এক নাম মায়াবাদ। বৈষ্ণবগোষ্ঠী বলেন, "মায়াবাদ ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ।" বৈষ্ণবদের ভক্তিবাদের আরাধ্য হইলেন সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্তা পরমেশ্বর। জগৎ লইয়া ভক্তের সকল কাজ। জগৎ মিথ্যা হইলে ভক্তিবাদ উঠিয়া যায়। এই জন্য সে সর্বনাশ মনে করে।

'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সূত্রের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা লীলা-রসিকেরা করিয়া থাকেন। তাঁহারা সূত্রের সন্ধি বিচ্ছেদ অন্যরূপে করেন। জন্মাদি+অস্য='জন্মাদ্যস্য'— এইরূপ না করিয়া তাঁহারা করেন জন্ম+আদ্যস্য='জন্মাদ্যস্য' এইরূপ। এইরূপ সন্ধিবিচ্ছেদে অন্যরূপ অর্থ ফুটিয়া উঠে। আদ্যস্য জন্ম যতঃ। আদ্যস্য পদে আদিরসস্য। আদিরসের জন্ম বা প্রকটন হইয়াছে যে পরমবস্তু হইতে তিনি ব্রহ্ম, তিনি শ্রীকৃষ্ণ।

রস একটি তত্ত্ব। ইহাতে আস্বাদককেও বুঝায়, আস্বাদ্য বস্তুকেও

বুঝায়। আস্বাদক রস, ব্রহ্ম আস্বাদ্য বস্তু; নিজেকে নিজে আস্বাদন করেন। তাই তিনি আত্মারাম। যিনি নিজেকে নিজে রমণ করেন। তাঁহার আস্বাদন হইতেই নিত্যলীলা বা সৃষ্টিলীলার প্রকটন। রসের আস্বাদন হয় রমণে। আত্মরমণে বা স্বাস্বাদনে রস পরিস্ফুট হয়। রস আস্বাদন হয় আত্মাস্বাদনে, কিন্তু একাকী রসের নির্যাস আস্বাদন হয় না। "একাকী নৈব রমতে", তাই তিনি আপনাকে "দ্বেধা অপাতয়ৎ"— আপনাকে দুই করিলেন। দুই ভাগের নাম আশ্রয়ালম্বন ও বিষয়ালম্বন। ছান্দোগ্যশ্রুতির ভাষায় "শ্যামাৎ শবলং প্রপদ্যে, শবলাৎ শ্যামং প্রপদ্যে" (ছান্দোগ্য, ৮/১৩/১) শ্যামঃ গম্ভীরঃ বর্ণঃ। শ্যামঃ শ্যামসুন্দর। শবল বিবিধ ভাব মিশ্রিত অশেষ বৈচিত্র্যময়ী শ্রীরাধা। প্রপদ্যে— প্রণতোঽস্মি। শরণাগতি গ্রহণ করি। প্রথমে শ্যামসুন্দরের শরণ লই, তারপর তাঁহাকে গভীর ভাবে আস্বাদন করিবার জন্য লীলাময়ী শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর শরণ লই। ইহা হইতেই রস নিষ্পন্ন হয়।

রসের পঞ্চভেদ। শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্য রস ও মধুর রস। মধুর রসকেই বলে আদিরস। এই রসই সকল রসের জনক বা উৎস। মধুর রসে আশ্রয় ও বিষয় দুই জনের এক আত্মা দুই দেহ।

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥"
(চৈতন্যচরিতামৃত)

এক আত্মা দুই দেহ বলিয়াই এই রস অন্য সকল রসের উৎসভূমি। গীতা এই রসকে 'পুরাণী প্রবৃত্তিঃ' বলেন। গীতা ব্রহ্মের পরিচয় দিয়াছেন— "যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী" (১৫শ অধ্যায়)।

সখ্যরসে রসের আশ্রয় ও বিষয়, দুইজন দুইজনকে সমান মনে করে। সেইজন্য ব্যবহার সর্ববিধ সংকোচশূন্য। বাৎসল্য রসে যিনি রসের আশ্রয় তিনি অনুগ্রহকারক। যিনি বিষয় তিনি অনুগৃহীত। এই ভাব। দাস্যরসে যিনি আশ্রয় তিনিই অনুগৃহীত, যিনি বিষয় তিনি অনুগ্রহকারক। রসের আস্বাদনের মূল হইল মমত্ববুদ্ধি। শান্তরসে উভয়ে উভয়ের প্রতি নিষ্ঠা আছে কিন্তু মমত্ববোধ নাই। মমত্ববোধের অভাব হেতু ইহা বস্তুতঃ রসবাচ্য হয় না। ফুলের কলিতে যেমন গন্ধটা ফোটে না, তদ্রূপ শান্তরস মমত্বহীন। মধুর রস মমত্বপূর্ণ।

এই রসপঞ্চক অপ্রাকৃত। নিত্যলীলালোকেই ইহার বাস। নিত্যলীলালোক কামবাঞ্ছাহীন। বিশুদ্ধ প্রেমের ভূমি। প্রাকৃত প্রপঞ্চে ঐসব রসের আভাসমাত্র দৃষ্ট হয় কারণ, প্রাকৃত জগতের ভালবাসা কামযুক্ত। ভালবাসায় লুক্কাইত থাকে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা। অপ্রাকৃত ভূমির প্রেম আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছাহীন। সেইক্ষেত্রে কেবল বিষয়ের অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রীতি-ইচ্ছা। আত্মসুখশূন্য হইয়া তাহা কৃষ্ণসুখে পর্যবসিত হইয়াছে। এই মধুর রতিই আদ্যরস।

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় নামক একজন শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন— "রসগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ মান কায়?" উপাধ্যায়জী উত্তর দিয়াছিলেন, "আদ্য এব পরো রস কহে উপাধ্যায়।" এই রসের আদ্য উদ্ভব স্থান ব্রহ্ম। এই পরিচয়ে শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম এই কথা বলা হইল। ব্রহ্ম ও কৃষ্ণ একই বস্তু। তবে একটু পার্থক্য আছে। ব্রহ্ম রসস্বরূপ, কিন্তু রসবিলাসী নহেন। ব্রহ্ম রসবিলাসী হইলেই শ্রীকৃষ্ণ। বস্তুত বিলসিত রসই রস। অ-বিলসিত রস নামমাত্র রস। যে সন্দেশটি কাহারও রসনার সঙ্গে যুক্ত, সেই সন্দেশটিই মিষ্ট। যে সন্দেশটি দোকানে সজ্জিত আছে তাহা মিষ্ট নহে; মিষ্টত্বের সম্ভাবনাপূর্ণ। এই সূত্রে, রসবিলাসময় রসের ঘনমূর্তি, সকল রসের উৎপত্তিস্থল শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম এই পরিচয় দেওয়া হইল। ইহা লীলা-রসিকদের অনুভূতি।

৩। শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণ—

সূত্র— শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ ১/১/৩

'শাস্ত্রযোনি' শব্দটি দুইভাগে নিষ্পন্ন হইতে পারে। শাস্ত্রের যোনি— উদ্ভবস্থান, ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাস। আর বহুব্রীহি সমাস করিলে হইবে শাস্ত্র হইতেছে যোনি— কারণ, প্রতিপাদক বা প্রমাণ যাঁহার — তিনি শাস্ত্রযোনি। প্রথম অর্থে বুঝা যাইবে ব্রহ্ম সকল শাস্ত্রের উদ্ভবস্থান। আর দ্বিতীয় অর্থ হইবে, ব্রহ্মবস্তুকে জানিতে হইলে শাস্ত্রই একমাত্র সহায়। শাস্ত্র ব্রহ্ম হইতেই আসিয়াছে বলিয়া ব্রহ্মের সংবাদ কিছু বলিতে পারে।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে (২/৪/১০) আছে— "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদঃ অথর্বাঙ্গিরসঃ চ।" আর্দ্রকাষ্ঠ জ্বালাইলে অগ্নি হইতে ধূম পৃথক্ হইয়া বহির্গত হয়। সেইরূপ

সেই মহৎ সত্তা পরব্রহ্মের অযত্ন-ত্যক্ত-নিঃশ্বাসই বেদাদি-শাস্ত্র। সেই বেদাদি শাস্ত্র দ্বারাই তাঁহার কিছু তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

উপনিষৎ পাঠ করিলে মনে একটি সংশয় জাগিতে পারে। তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্মকে জানা যায় না— "যতো বাচো নিবর্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ" (২/৯)। আবার শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি ২/৮ মন্ত্রে বলিয়াছেন, "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি", সেই ব্রহ্ম বস্তুকে জানিয়াই অতিমৃত্যু হওয়া যায়— মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব লাভ করা যায়।

ব্রহ্মবস্তুকে জানা যায় না একথাও বলিলেন, আবার তাঁহাকে জানিয়া অমৃতত্ব লাভ করিতে হয় একথাও বলিলেন— সুতরাং সংশয়, জানা যায় কি না বা জানা যায় কিভাবে ? সেই সংশয় নিরসন করিতেছেন— এই তৃতীয় অধিকরণ "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই সূত্র দ্বারা। তাঁহাকে জানা যায় না একথা ঠিক। কারণ, প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি জ্ঞানলাভের যে-সকল উপায় তাহা দ্বারা ব্রহ্মবস্তু জানা যায় না। আবার, জানা যায় একমাত্র শাস্ত্র দ্বারা। শাস্ত্র ছাড়া আর কোন উপায়েই তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় না।

তত্ত্বদ্রষ্টাদের শ্রীমুখ হইতেই জানিতে হইবে পরব্রহ্ম বস্তুটি কিরূপ। তাঁহাকে জানিয়া সাধনা দ্বারা উপলব্ধি করিতে হইবে। কোন নিপুণ বংশীবাদক বংশী বাজাইয়া সভাস্থ লোকগণকে মুগ্ধ করিতেছেন। এই মুগ্ধ করার কর্তা কে ? বংশীবাদক। মুগ্ধ কি উপায়ে করিলেন ? বংশীর মধ্যস্থতায়। সেইরূপ পরব্রহ্মের হাতের বংশী যেন শাস্ত্র। শাস্ত্র মধ্যস্থতাতেই ব্রহ্মের সংবাদ জানা যাইবে। তাই গীতা বলিয়াছেন— "তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং"— ভক্তগণ বলেন "মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ।" "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্রের এই বার্তা।

এই প্রসঙ্গে সন্ন্যাসীগোষ্ঠীর কিছু অন্য প্রকার কথা আছে। অধ্যাসের কথা বলা হইয়াছে। সন্ন্যাসীরা অধ্যাসকে বলেন অবিদ্যা। ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন, "তমেতমবিদ্যাখ্যম্ আত্মানাত্মনোঃ ইতরেতরাধ্যাসং পুরস্কৃত্য সর্বে প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবহারাঃ লৌকিকাঃ বৈদিকশ্চ প্রবৃত্তাঃ সর্বাণি চ শাস্ত্রাণি।" বেদ-উপনিষদ সকল শাস্ত্রই অধ্যাসমূলক অর্থাৎ ভ্রান্তি বা মিথ্যা। সুতরাং সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে মিথ্যা শাস্ত্রদ্বারা জানা যায় না। ব্রহ্মবস্তু নির্বিশেষ। কোন কিছু দ্বারাই তাঁহাকে বিশেষিত বা প্রমাণিত করা যায় না।

তবে যে ব্রহ্মসূত্র বলিলেন "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ", এই সূত্র তবে কি ব্যর্থ? না, ব্যর্থ নহে। কোন কথা বলা যায় দুই প্রকারে— অন্বয়-মুখে ও ব্যতিরেকমুখে। কুবেরের ধন আছে— এইটি অন্বয়মুখে— ইতিবাচক ভাবে (positively) বলা। কুবের ধনহীন নহেন— এইটি ব্যতিরেকমুখে, নেতিবাচক ভাবে (negatively) বলা। ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন কথা শাস্ত্র অন্বয়মুখে বলিতে পারেন না। বলিতে পারেন না, তিনি ইহা বা এইবস্তু বা এইরূপ। বলিতে পারেন ব্যতিরেকমুখে, তিনি ইহা নহেন। এইভাবে বলিতে পারেন— ব্রহ্মবস্তু অসীম, অনন্ত, অদ্বিতীয়, অনাদি, অপাপবিদ্ধ, অপাণিপাদ (তাঁহার হাত পা নাই), অচক্ষু, অকর্ণ, অকায়, অব্রণ— ইত্যাদি। ব্রহ্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রের উক্তি ব্যতিরেকমুখে। অন্বয়মুখে যেসব কথা আছে তাহাও ব্যাতিরেকমুখে বুঝিয়া লইতে হইবে। তিনি সৎ বা সত্য বলিলে বুঝিতে হইবে অসৎ বা অসত্য নহেন। চিৎ বলিলে বুঝিতে হইবে অচিৎ বা জড় নহেন। আনন্দ বলিলে বুঝিতে হইবে সর্ববিধ দুঃখস্পর্শহীন। ইহা এক দুঃসাহসিক কথা, শাস্ত্রও অধ্যস্ত! শাস্ত্রও মিথ্যা! সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম সম্বন্ধে কেহই কিছু জানেন না! ব্রহ্ম কি বস্তু নহে এই বিষয় বেদাদিশাস্ত্র কিঞ্চিৎ বলিতে পারেন। তবে ব্রহ্মকে বলিবে কে? সন্ন্যাসীরা বলেন, যে ব্রহ্ম হইয়া গিয়াছে, ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা যার হইয়াছে, সেই বলিবে। না, তাহাও ঠিক নহে, ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা যার হইয়াছে সে কিছুই বলিতে পারিবে না, মৌন হইয়া থাকিবে। এইরূপ গুরুর পার্শ্বে বসিয়া থাকিলেই জিজ্ঞাসু শিষ্য অন্তরের ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসার উত্তর পাইবে।

সন্ন্যাসীগোষ্ঠীর মতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ। নির্বিশেষ বস্তুকে কিছু দ্বারাই বিশেষিত করা যায় না। ব্রহ্ম আছেন এইকথাও বলা যাইবে না। "অস্তি" ক্রিয়ার কর্তাও ব্রহ্ম হইবেন না। একজন ইংরেজ দার্শনিকের কথা আছে "To define God is to defile Him"।

বৈষ্ণবগোষ্ঠী ঐ সব কথা শ্রদ্ধার সহিত শোনেন না। তাঁহারা বলেন, অধ্যাস কথাটিই সন্ন্যাসীদের মিথ্যা-কল্পনা। ব্রহ্ম যদি নির্বিশেষ হন, বৈষ্ণবগোষ্ঠীর প্রশ্ন, তাহা হইলে সবিশেষ জগৎটি তাহাতে অধ্যস্ত হইল কি করিয়া? রজ্জুটি সবিশেষ বলিয়াই তার অধিষ্ঠানে সর্পটির অধ্যাস বা ভ্রান্তি হইতে পারে। নির্বিশেষ ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে এই সবিশেষ জগৎটির ভ্রান্তি কি করিয়া সম্ভব?

সন্ন্যাসীগোষ্ঠী ইহার উত্তরে বলেন— আকাশটি তো নির্বিশেষ।

তাহাতে এক নীলবর্ণ কড়াই কেহ উল্টাইয়া ধরিয়াছে, এইরূপ ভ্রান্তি হয় কি প্রকারে? নির্বিশেষ অধিষ্ঠানেও সবিশেষ ভ্রান্তি সম্ভব।

বৈষ্ণবগোষ্ঠীর কথা হইল এই যে, শাস্ত্রই সত্য। শাস্ত্র ব্রহ্মের যত গুণ-মহিমা কীর্তন করিয়াছেন তাহা পরমসত্য। সত্যের মধ্যে ব্যবহারিক পারমার্থিক কোন ভেদ নাই। যে সত্য নিত্য ব্যবহারে আসে তাহাই ব্যবহারিক সত্য। পারমার্থিক সত্যটি কি? যে সত্য কোনদিন কাহারও কোন ব্যবহারে আসে না। সে আবার সত্য কি? সে তো কল্পনা। অব্যবহার্য সত্য সত্যই নহে। একথা স্বীকার করি যে, ব্রহ্মের দুইটি লক্ষণ আছে—স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। তন্মধ্যে তটস্থ লক্ষণ মিথ্যা বা অধ্যাস নহে। অর্জুন একজন মহাবীর, ইহা তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ। অর্জুন অভিমন্যুর পিতা, ইহা তাঁহার তটস্থ লক্ষণ। তটস্থ লক্ষণ মিথ্যা নহে, অর্জুনেরই একটি বিশেষণ। এই বিশেষণ ছাড়াও অর্জুন থাকিতে পারেন। অভিমন্যুর জন্মের পূর্বেও অর্জুন ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেও থাকিলেন। ব্রহ্ম সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্— এইটি তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ। ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হইয়াছে—ইহা তাঁহার তটস্থ লক্ষণ। তটস্থ বলিয়া মিথ্যা নহে। জগৎ দ্বারা ব্রহ্মের পরিচয়—সত্য পরিচয়। তবে ইহা ব্রহ্মের মত নিত্য শাশ্বত নহে। জগৎ-সৃষ্টির পূর্বেও ব্রহ্ম ছিলেন। জগৎ ধ্বংস হইয়া গেলেও তিনি থাকিবেন। ব্রহ্ম হইতেই জগৎ সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মতেই লয়প্রাপ্ত হয়। মাকড়সার নাভি হইতে সূত্র বাহির হয়, তাহা দ্বারা সে জাল পাতে। আবার ইচ্ছা করিলে মাকড়সা এই সূত্রগুলিকে তার মধ্যে লইয়া যাইতে পারে। তাই বলিয়া মাকড়সাটি সত্য আর জালটি মিথ্যা নহে। আর জগজ্জীবের কাছে ব্রহ্মের পরিচয়— "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইহাই। এই তত্ত্ব শাস্ত্রগম্যই। আমরা ক্ষুদ্র জীব, আমাদের কাছে ব্রহ্মের প্রকৃষ্ট পরিচয় তিনি বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ। এই বার্তা অভ্রান্তশাস্ত্রই আমাদিগকে জানাইতে সক্ষম। ইহার মধ্যে অণুমাত্রও মিথ্যার স্থান নাই। সূর্য একাকীও সত্য, সমগ্র সৌরজগৎ গ্রহ উপগ্রহ লইয়াও সে সত্য। ইহার মধ্যে ব্যবহারিক পারমার্থিক কিছুই নাই। যাহারা এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে মিথ্যা বলে ও জগতের প্রতি আমার কর্তব্যগুলিকে মিথ্যা বলে, তাহাদের উক্তিই মিথ্যা কিনা তাহাদিগের ভাবিয়া দেখা উচিত। এই হইল বৈষ্ণবগোষ্ঠীর বক্তব্য।

৪। সমন্বয়াধিকরণ—

সূত্র— তত্তু সমন্বয়াৎ।। ১/১/৪

ব্রহ্মবস্তু যে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য ইহা শাস্ত্রীয় সমন্বয় হইতেও জানা যায়। বেদশাস্ত্রে যতসব কথা আছে সবই ব্রহ্মপর। প্রত্যেকটি বাক্যই ব্রহ্মের নির্দেশক। আপাতদৃষ্টিতে তাহা বোধগম্য হয় না। গভীর দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিলে অনুভব হয়, সকল কথাই এক লক্ষ্যাভিমুখী।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বলিয়াছেন—

"মুখ্যাবৃত্তি গৌণীবৃত্তি কি অন্বয় ব্যতিরেকে।"
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয় কৃষ্ণকে।।"

শাস্ত্রের অক্ষরগুলিকে মুখ্যাবৃত্তিতে ব্যাখ্যা কর কিংবা গৌণীবৃত্তিতে ব্যাখ্যা কর অথবা অন্বয়মুখে ব্যুৎপত্তি গ্রহণ কর কিংবা ব্যতিরেকমুখে ব্যুৎপত্তি কর— বেদ যেন একটি প্রতিজ্ঞা করিয়াই বসিয়াছে যে, সে কৃষ্ণকথা ছাড়া আর কোন কথা বলিবে না।

বেদশাস্ত্রের যেন একটিমাত্র উদ্দেশ্য তাহার নাম সমন্বয়। সমগ্র শাস্ত্রার্থের সমন্বয়, ও সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জীবজগতের সৃষ্টিরহস্যের সমন্বয়। সকল দিক্ দিয়া ব্রহ্মবস্তুর সমন্বয় সাধন করতঃ বিশ্বের বৈচিত্র্যময় মহারহস্যের সমাধানই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। বেদশাস্ত্র কোন ব্যক্তি-র রচিত নহে। বিচারবুদ্ধি দ্বারা রচিত নহে। ঋষি সত্যকে দর্শন করিয়াছেন। মহাসত্যতত্ত্বকে শ্রবণ করিয়াছেন। যুগ যুগ ধরিয়া সাধনা ও কৃপাবলে সত্য ব্যক্ত হইয়াছে। সকল কিছুই একটি মহাসত্যের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। একই মহাসত্যের বিশ্বতোমুখী প্রকাশ।

মূল মহাসত্য ব্রহ্ম সুষ্ঠুভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে জগতের বিভিন্ন প্রকার সংশয়ের সমাধান হইয়া যায়। ব্যষ্টি জীবন বা সমষ্টি জীবন, সকল জীবের সর্ববিধ কর্ম ও সর্বকালের সর্ববিধ সমাধান সংসাধিত হয়।

শাস্ত্র শব্দের অর্থ হইল যাহা দ্বারা বিশ্বসংসার ও মানবজীবন শাসিত হয়। এই বিশ্বজনীন শাসন (Universal administration)-এর মূলে আছে ঋতম্। ঋতম্‌কে জানিলেই মানুষ জ্ঞানী হয়। অথবা যথার্থ জ্ঞান লাভ করিলেই ঋতম্‌কে জানা যায়। জ্ঞানী হইলেই মানুষ ঋতম্-এর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। সুতরাং সকল প্রকার সমন্বয়ের মূলে শাস্ত্র। ঋতম্-এর মহাভিত্তিতেই শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

সংক্ষেপে 'তত্তু সমন্বয়াৎ' সূত্রের ইহাই তাৎপর্য। এই কথায়

অনেকের আপত্তি আছে। বহু মতভেদ আছে। মীমাংসাশাস্ত্র দুইখানি— পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা। পূর্বমীমাংসার প্রথম মন্ত্র 'অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা।' উত্তরমীমাংসার প্রথম সূত্র আমরা দেখিয়াছি 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।' দুই মীমাংসা শাস্ত্রের নামান্তর ধর্মমীমাংসা ও ব্রহ্ম-মীমাংসা।

ধর্মমীমাংসা মতে, ধর্ম অর্থ হইল কর্ম। কর্ম অর্থ বেদবিহিত কর্ম। জৈমিনি ধর্মমীমাংসার প্রধান আচার্য। তিনি ধর্মের সংজ্ঞা করিয়াছেন, "চোদনালক্ষণো ধর্ম। চোদনেতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্তকম্।" Vedic utterences which impels men to action— চোদনা অর্থ কর্মপ্রেরণা, কর্মে প্রবর্তনা। বেদের যে বাক্যগুলি মানুষকে কোনও কর্মে প্রবৃত্ত করিবার প্রেরণা দান করে তাহাই ধর্ম। বৈদিক নির্দেশমত সেই বেদবিহিত কর্মসাধন করাই জীবের কর্তব্য। জীবকে শুভ কল্যাণময় কর্মে প্রবৃত্তি জন্মাইতেই বেদবাক্যের সার্থকতা।

পূর্বমীমাংসকেরা বলেন, ধর্ম জীবনের সারবস্তু। বেদনির্দিষ্ট কর্ম বিহিতভাবে পালন করাই ধর্ম। কি দৈনন্দিন কর্ম কি সমাজকল্যাণকর ইষ্টাপূর্ত কর্ম, সকলই করিতে হইবে বেদানুগতভাবে। নিত্যকর্ম-সন্ধ্যাবন্দনা স্বাধ্যায় গায়ত্রীজপ। নৈমিত্তিক কর্ম— স্বর্গাদি কামনা করা যজ্ঞাদি।

অন্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনার্থ যজ্ঞাদি সকলই করিতে হইবে বেদের নির্দেশ ও বিধিমত। যথাযথভাবে করিলেই ফলপ্রাপ্তি অনিবার্য। অন্যথায় নিষ্ফলতা বা প্রত্যবায়ভাগী হওয়া। বেদমন্ত্রের উদ্দেশ্যই হইল কর্মে প্রবর্তন করা। সুতরাং যে সকল মন্ত্রে ঐরূপ প্রবর্তনা নাই সেই সকল মন্ত্র নিরর্থক। যেমন 'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত' প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনা করিবে— এই বাক্য সার্থক। কিন্তু 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইহা নিরর্থক বাক্য; বিশ্বের সকলই ব্রহ্ম এই বাক্য আমাদিগকে কিছুই করিতে বলিতেছে না। শুধু ঐ কথাটি জানিয়া আমার কি ফল ? ব্রহ্মমীমাংসা বা বেদান্ত মতে যে মন্ত্রগুলি ব্রহ্মবোধক বা সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ববোধক তাহা সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র, মহামূল্যবান মহাবাক্য। কর্মমীমাংসা মতে সেই বাক্যগুলি অলংকার সদৃশ শোভাবর্ধক মাত্র।

কথা দুইটি আর একটু তলাইয়া বুঝা প্রয়োজন। দুই প্রকার বস্তু দৃষ্ট হয়, স্থিতিশীল ও গতিশীল। স্থিতিশীলেরাও বস্তুতঃ গতিশীল। গতিটা কোন ক্রিয়ার ফল। নিখিল বিশ্বসংসার ক্রিয়াময়। অনন্ত বিশ্বময়

একটি বিরাট ক্রিয়াযজ্ঞ চলিতেছে ; সকলই এই ক্রিয়াধীন।

"রাম বনে যাইতেছে"—এই বাক্যটির ধর্মমীমাংসা মতে ব্যুৎপত্তি হইবে, রাম কর্তৃক বনগমন ক্রিয়া। বিশ্বময় অশেষ জনের বনগমন ক্রিয়া চলিতেছে। এই বনগমন ক্রিয়াটির রাম কর্তা। ব্রহ্মমীমাংসা মতে, রাম বনগমন করিতেছে— এই বাক্যটির ব্যুৎপত্তি হইবে বনগমন-ক্রিয়াবিশিষ্ট রাম। রাম শত-সহস্র প্রকার ক্রিয়াবিশিষ্ট হইতে পারে। এখন রাম বনগমন-ক্রিয়াবিশিষ্ট। বেদান্তের দৃষ্টি বস্তুনিষ্ঠ। মীমাংসার দৃষ্টি ক্রিয়ানিষ্ঠ। মীমাংসক বলেন, বস্তু নির্দেশে কোন ফল নাই। ব্রহ্ম কি জানায় কোন উপকারিতা নাই। আমার কি করণীয় শুধু তাহাই জ্ঞাতব্য। দৈনন্দিন বর্ণাশ্রম নির্দিষ্ট কর্তব্য বেদবিধানমত প্রত্যেকেরই করণীয়। এই করণীয় কর্ম করার ফলেই দুঃখস্পর্শশূন্য স্বর্গলাভ হইবে। স্বর্গই একমাত্র লক্ষ্যস্থল।

ধর্মমীমাংসার এই মত একটি প্রাচীন মতবাদ মাত্র নহে। ইহা আজও জীবন্ত, মৃত নহে। হিন্দুর জীবনের যত কর্ম—গর্ভাধান হইতে সপিণ্ডকরণ পর্যন্ত সকলই স্মৃতিশাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল। সেই স্মৃতিশাস্ত্রের ভিত্তি হইল ধর্মমীমাংসা। আজ পর্যন্ত হিন্দু-সমাজের সামাজিক ক্রিয়াকর্ম বেদনির্দিষ্ট পথে চলে ও কর্ম যথাযথ হইলে শুভ ফল হইবে, পরিণামে স্বর্গলাভ হইবে, ইহাই সাধারণের মনের তলে বিশ্বাস।

ব্রহ্মমীমাংসা বলেন, যে সকল ফল কর্মদ্বারা লব্ধ তাহাই নশ্বর। স্বর্গ কর্মফললব্ধ। সুতরাং নশ্বর। যে পুণ্যকর্মফলে স্বর্গ প্রাপ্তি সেই পুণ্য ক্ষয়শীল। ক্ষয় হইয়া গেলে আবার মর্ত্যভূমিতে গতায়াত চলিবে। সুতরাং স্বর্গ লক্ষ্যবস্তু নহে। জীবের লক্ষ্য বস্তু মোক্ষ। ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে হয় মোক্ষলাভ। মীমাংসকেরা প্রশ্ন করেন, মোক্ষও তো উপাসনাদি কর্ম-লব্ধ। তাহাও নশ্বর হইতে পারে।

এই বিচার অনেক, প্রসঙ্গতঃ আলোচনীয়। এইস্থলে এই কথা তুলিবার উদ্দেশ্য— ব্রহ্মসূত্র ঘোষণা করিলেন যে, সর্বত্র সমন্বয় আছে। মতবিরোধিতার দিকে দৃষ্টি করিলে সেই সমন্বয় তো আপাতত দৃষ্ট হয় না। এ সকল মতবিরোধিতা সত্ত্বেও সূত্র বলেন যে, চরম সমন্বয় আছেই। বেদের অর্থ তাৎপর্য যখন ঠিক ঠিক ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে তখনই সমন্বয় দৃষ্ট হইবে।

শ্রীঅরবিন্দও এই কথা বলিয়াছেন। তিনি অনুভব করেন যে, বেদের

মধ্যে একটি বিরাট সমন্বয় আছে। তবে তাহা অনুভব করিতে হইলে মন্ত্রগুলির স্বরূপ ও আবির্ভাব রহস্য পূর্বাহ্নে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। তিনি *The Secret of the Veda* গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন—

"The language of the Veda itself is শ্রুতি —a rhythm not composed by the intellect but heard, a divine Word that come virbrating out of the Infinite to the inner audience of the man who had previously made himself fit for the impe-rsonal knowlege. The Rishi had acquired them by a progre-ssive self-culture Knowledge itself was a travelling and reaching or a finding and a winning. The revelation came only at the end. The light was the prize of a final victory."

সুতরাং বেদের অন্তর্নিহিত মহাসমন্বয়টি দর্শন করিতে হইলে মন্ত্রের আবির্ভাবের নিগূঢ় রহস্যটি ভেদ করিতে হইবে। "তত্তু সমন্বয়াৎ" বেদান্তসূত্র ঐ গূঢ়ভাবে অন্তর্নিহিত মহাসমন্বয়েরই বার্তা বহন করিতেছে।

ব্রহ্মসূত্রের এই প্রথম চারিটি সূত্র, 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা', 'জন্মাদ্যস্য যতঃ', 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' ও 'তত্তু সমন্বয়াৎ' —ইহাদের মধ্যেই বেদে অন্তর্লীন যে মহাসত্য বিরাজমান, তাহার দিগদর্শন হইয়াছে, এই কথা প্রায় সকল বেদান্ত-ভাষ্যকারগণই বলিয়াছেন।

যে সমস্যাগুলি তোলা হইয়াছে তাহার দুইটির সমাধান স্মৃতিপ্রস্থান গীতাশাস্ত্র সংক্ষেপে করিয়াছেন। (১) যাঁহারা শুধু বেদের অক্ষরগুলিই ধরিয়া আছেন— তাঁহাদের নিগূঢ় অর্থ-তাৎপর্যের দিকে দৃষ্টি নাই। কেবলমাত্র মন্ত্রের যথাযথ উচ্চারণ করিয়া বিহিত কর্মাদির অনুষ্ঠানই যাঁহারা কর্তব্য মনে করেন, গীতাকার তাঁহাদিগকে বেদবাদী বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে 'অবিপশ্চিৎ' (অবুদ্ধিমান) বলিয়াছেন। তাঁহাদের মুখে স্বর্গাদির চমকপ্রদ বর্ণনা মাত্র আছে। তাহাদের স্বর্গপ্রাপ্তি ছাড়া আর কোন লক্ষ্য নাই— তাহাদিগকে সাজানো গোছানো কথা (পুষ্পিতা বাক্) বলিয়াছেন, এবং ঐ পথে চিত্তের শান্তভাব আসিবে না— 'সমাধৌ ন বিধীয়তে' বলিয়াছেন কোন একটি বিষয়ে স্থির হয় না তাহাদের চিত্ত।

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ" ইত্যাদি ২/৪২ শ্লোক হইতে তিনটি শ্লোকে উক্ত আলোচনা দৃষ্ট হয়।

(২) আর কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড লইয়া যে বহু কথা তাহার সমাধান গীতা করিয়াছেন একটি মন্ত্রে।

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।।"

(গীতা, ৪/২৪)

যজ্ঞের পাত্রও ব্রহ্ম, যজ্ঞের ঘৃতও ব্রহ্ম, যজ্ঞের অগ্নিও ব্রহ্ম, হোমকারী ব্যক্তিও ব্রহ্ম, এই জ্ঞানে ব্রহ্মরূপ কর্মে একাগ্রচিত্ত পুরুষ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। দ্রষ্টা ব্রহ্মজ্ঞানীর সকল কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডে পর্যবসান হয়। তাঁহার কর্ম মাত্রই যজ্ঞস্বরূপ। যজ্ঞ মাত্রই ব্রহ্মস্বরূপ।

"তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রের লক্ষ্য যদি শাস্ত্রসমন্বয় হয় তাহা হইলে আর্য ঋষিগণ কোন্ কোন্ গ্রন্থকে শাস্ত্র-শব্দে বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহার একটা নির্দিষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। শাস্ত্র বহু, কিন্তু চারিবেদ ছাড়া অন্য সকল শাস্ত্র বেদের পরিপূরক, বেদের রহস্যের উদ্‌ঘাটক, বেদের প্রকৃত তাৎপর্য প্রকাশক।

বেদ চারিখানি— ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। তাহা ছাড়া উপবেদ চারিখানি— আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র। বেদাঙ্গ আছে ছয়খানি— শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। বেদের উপাঙ্গ চারিখানি— পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্মশাস্ত্র। পুরাণ দুই প্রকার— মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। মীমাংসার দুইভাগ— কর্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা। এই ব্রহ্মমীমাংসা ব্রহ্মসূত্র। শাস্ত্রবিষয়ক একটি নির্ঘণ্ট আছে ভাগবতে— সন্দীপনি মুনি কৃষ্ণ-বলরামকে কি কি শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গে ছয়খানি বেদাঙ্গ ও উপনিষদ্ সহিত সমগ্র বেদ, সরহস্য ধনুর্বেদ, ধর্মশাস্ত্র সকল, মীমাংসাদি দর্শনবিদ্যা, তর্কবিদ্যা, সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি ষড়ঙ্গ রাজনীতির উল্লেখ আছে। কৃষ্ণ বলরাম—

"অহোরাত্রৈশ্চতুঃষষ্ট্যা সংযত্তৌ তাবতীঃ কলাঃ।।"

(ভা. ১০/৪৫/৩৫)

চৌষট্টি দিনে চৌষট্টিকলা বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। শ্রীধর ভাবার্থ দীপিকায় তাদের নাম করিয়াছেন। তার মধ্যে কয়েকটি নাম বলিতেছি যথা— গীতং, বাদ্যং, নৃত্যং, নাট্যম্, আলেখ্যং, পুষ্পাস্তরণম্, মণিভূমিকাকর্ম, ভূষণযোজনম্ ঐন্দ্রজালম্, হস্তলাঘবম্ সূচীবায়কর্ম, সূত্রক্রীড়া, রূপ্যরত্ন-পরীক্ষা, আকরজ্ঞানম্, অভিধানকোষঃ, ছন্দোজ্ঞানম্, বালক্রীড়নকানি, দ্যূতবিশেষঃ, বৈতালিকীনাঞ্চ বিদ্যানাং জ্ঞানম্। ইহা এক বিস্ময়কর সংবাদ যে, এক গুরুগৃহে বসিয়াই কৃষ্ণ-বলরাম এইরূপ চৌষট্টি বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সেই কালে

গুরুগৃহে এই সমস্ত বিষয় শিক্ষাদান করা হইত। ইহা বিশেষ-ভাবে ভাবিবার বিষয়।

সে যাহা হউক, উপরে যতগুলি বিদ্যার কথা বলা হইল, সবগুলি বেদানুগ। সকলই বৈদিকভিত্তিতে স্থাপিত। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, সর্বপ্রকার বিদ্যানুশীলন ও শাস্ত্রানুশীলনের মধ্যে একটি বিরাট সমন্বয় আছে। 'তত্তু সমন্বয়াৎ' সূত্র এই সমন্বয়ের কথাই জানাইয়াছেন।

'তত্তু সমন্বয়াৎ' সূত্রকে শাস্ত্রযোনিত্বাৎ সূত্রের সঙ্গে একত্র করিয়া ভাবিলে উপরোক্তরূপ অর্থ দাঁড়াইবে। যদি 'তত্তু সমন্বয়াৎ' সূত্রকে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সূত্রের সঙ্গে যুক্ত করি তাহা হইলে অন্যরূপ অর্থ হইবে। এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা স্থিত আছে, ও যদভিমুখে পূর্ণতাপ্রাপ্তির জন্য ছুটিতেছে তিনি হইতেছেন ব্রহ্ম। এই কথাটিকে প্রমাণ করিতে হইবে। উপনিষদের প্রমাণ দিয়া স্থাপন করা হইয়াছে। বেদ ব্রহ্মসত্তা মানিয়াছেন। বেদ স্বতঃপ্রামাণ্য বলিয়া আমরা ব্রহ্মসত্তা মানি। ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে দুই প্রকার। স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ। স্বরূপলক্ষণে "সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম"। ইহা ব্রহ্মের পরিচয়। আর তটস্থলক্ষণে যাহা হইতে জগতের সৃষ্ট্যাদি হইয়াছে। ব্রহ্মের দ্বারা জগতের পরিচয় হইয়াছে। জগদ্দ্বারা ব্রহ্মের পরিচয় হওয়া দরকার। জগতের মধ্যে যাবতীয় ব্যাপারের মধ্যে যদি একটি সূত্র আবিষ্কার করা যায় তাহা হইলে জগতের সৃষ্ট্যাদিকর্তা একজনই তাহা অনুমিত হইতে পারে। সত্যের উদ্‌ঘাটনের জন্য শাস্ত্রপ্রমাণ অর্থাৎ বেদপ্রামাণ্যই স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে উপেক্ষা করা হয় নাই। বেদ-প্রমাণের আনুগত্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমিতিও সহায়ক হইবে। জগদ্ব্যাপার দৃষ্টে জগৎকর্তাকে প্রমাণিত করার চেষ্টা আমাদের দার্শনিকদের মধ্যে বিশেষভাবে দৃষ্ট হয় না। তন্ত্রাচার্যেরা ঐ দৃষ্টি নিয়া কিছু গবেষণা করিয়াছেন। 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' নামক নব্যনৈয়ায়িকদের একটি গ্রন্থ ঐ রূপ চেষ্টা করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য জগতের দার্শনিকেরা ভগবৎ সত্তা স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন Cosmological, Teleological এবং Ontological প্রকারের যুক্তি সহায়তায়।

তন্ত্রকে ভারতীয় বিজ্ঞান বলা যায়। কিন্তু সেই বিজ্ঞানের চর্চা অধুনা বিলুপ্ত বলিলেই চলে। বর্তমানে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান জগতের সৃষ্টি-স্থিতির রহস্য বিশ্লেষণ করিতে করিতে এমন এক স্থানে পৌঁছিয়াছে যে, ব্রহ্মসত্তা প্রায় স্থাপিত হইতে চলিয়াছে। ইহা এক রহস্যময় সংবাদ

যে, ঈশ্বরসত্তাকে অস্বীকার করিয়া বিজ্ঞান তার বিশ্লেষণ আরম্ভ করে। কিন্তু তিনশত বৎসরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণের ফলশ্রুতি হইয়াছে ব্রহ্মসত্তার দ্বারদেশে উপস্থিতি। কিরূপে তাহা বলিতেছি।

'তত্তু সমন্বয়াৎ' বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যানে বর্তমান বিজ্ঞানের আলোচনার উপযোগিতা কোথায় এইরূপ প্রশ্নের উত্তর এই যে— বেদান্ত দ্বিতীয়সূত্রে বলিলেন, ব্রহ্ম হইতে জগতের উদ্ভব। পরে বলিলেন— ইহা সমন্বয় দ্বারাও স্থাপন করা যায়। নিখিলবিশ্ব মধ্যে একটি বিরাট সমন্বয় আছে— এত সুষ্ঠু এবং সুন্দর শৃঙ্খলাযুক্ত সেই সমন্বয় যে, ইহার মূলে এক ব্রহ্মসত্তা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সূত্রের এই অর্থ গ্রহণ করিলে বর্তমান বিজ্ঞান সেই সমন্বয়ের আবিষ্কর্তা— এই কথা বলা প্রয়োজন। বর্তমান বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ দান আমার মনে হয়— ঋষিগ্রন্থ চণ্ডীর "যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা" মন্ত্রটিকে প্রাণবন্ত করা, অনন্ত বিশ্বময় একটিমাত্র শক্তি ক্রিয়মাণ ইহা প্রকাশ করিয়া। কিরূপে যে আবিষ্কার হইল তাহা সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন। এই দৃশ্যমান জগতে আমরা দেখি বিভিন্ন স্তরের কার্যকারিতা। দেখি অভিনব সৃষ্টি। দেখি আকস্মিক ধ্বংস। কত নিয়মের বাঁধন আছে আবার নিয়মের ব্যভিচারও আছে। বর্তমান বিজ্ঞান এই কথা স্বীকার করিতেছে যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি রহস্যময় ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। ইহার মধ্যে একটি আভ্যন্তরীণ যোগসূত্র আছে। ইহার সর্বাবয়বের একটি সামঞ্জস্য আছে। একটি বিচিত্র সমন্বয় আছে।

এই বিরাট বিশ্বের একটা ক্ষুদ্র অংশ এই পৃথিবীটি। ইহার ক্রমবিকাশ সাক্ষ্য দেয় যে, একটি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ক্রমবিকাশ অগ্রসর হইয়াছে। সূর্য হইতে একটি টুকরা খসিয়া আসিল। তাহা একটি নির্দিষ্ট কক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। প্রচণ্ড তাপ বিশিষ্ট একটি অগ্নিগোলক কি প্রকারে আকাশে বাতাসে জলে স্থলে পর্বতে বনে বিভক্ত হইয়া সর্বসমাবেশে কেমন করিয়া জনবসতির যোগ্যতা লাভ করিল। কি রহস্যময় প্রণালীতে জড়পিণ্ডের মধ্যে প্রাণের জন্ম হইল। কেমন করিয়া প্রাণের মধ্যে মনের বিকাশ হইল। আবার মনের মধ্যে বুদ্ধির উদয় হইল। ক্রমে পৃথিবী মানবসভ্যতার লীলাভূমিতে পরিণত হইল। কত সৃষ্টি ও ধ্বংসের সমাবেশে কি বিচিত্র এই সংগঠন। ইহাতে মনে হয় সর্বদা একটি বিরাট শক্তির খেলা এবং ইহার একটি প্রাণকেন্দ্র

আছে। বিজ্ঞান ইহা অস্বীকার করিতেছে না। বিজ্ঞানের কথা আরও একটু গোড়া ধরিয়া বলি— আগে ছিল পরমাণুই চরম। ক্রমে পরমাণু ভাঙিয়া ইলেকট্রন প্রোটন ইত্যাদি বাহির হইয়াছে। আরও ভিতরে গেলে দেখা যায় কেবল একটা এনার্জি (energy) বা শক্তি। এই শক্তির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া বিজ্ঞান একটু ধাঁধায় পড়িয়াছে। এতকাল পদার্থবিদ্যা (Physics)-এ Law of Determinism-এ চালু ছিল। কিন্তু এখন Law of Indeterminism অর্থাৎ অনির্ণেয়ের আসরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। একটি পরমাণুর মধ্যে যে একটি ইলেক্‌ট্রন ঘুরিতেছে, সেটি যেন একটি সৌরজগতের মত। ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন বস্তু (element)-এ বিভিন্ন রূপ। সেইটি নির্ভর করে পরমাণুর সংখ্যা (atomic number)-এর উপর। যেমন হাইড্রোজেনের পরমাণুতে মাত্র একটি ইলেকট্রন আছে। সৌর জগতের গ্রহগুলি যে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তারা তাহাদের কক্ষপথ পরিবর্তন করে না। কিন্তু ইলেকট্রনগুলি ঘনঘন তাহাদের কক্ষপথ পরিবর্তন করে। একটি পথ হইতে যেন আর একটি পথে লাফ দিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু কখন যে তারা লাফ দিবে এবং তখন তার গতিবেগ কত হইবে তাহা পূর্ব হইতে অঙ্ক কষিয়া তার কোন ভবিষ্যৎ উক্তি আজও করা সম্ভব হয় নাই। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন, বোধহয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ইলেকট্রনের মধ্যে একটি চেতনা আছে। এই জন্যই গতিবেগ কত হইবে তাহা আগে হইতে হিসাব করা যাইতেছে না। যদি তাহা হয় তাহা হইলে "যা দেবী সর্বভুতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে" এই চণ্ডীবাক্যই সত্য হইয়া যায়। তিনি সর্বত্র চেতনারূপে বিরাজিতা।

বিজ্ঞান জানিত, জড় পরমাণুগুলি নিত্য, সত্য ও অবিভাজ্য। বর্তমান বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, পরমাণুগুলি বিভাজ্য। এক একটা পরমাণু এক একটি শক্তিব্যূহ। আজ জড় এবং শক্তি এক হইয়া গেল। যাহা জড় তাহাই শক্তিসমাবেশ মাত্র। ইহার ফরমুলা আইনস্টাইনের ভাষায় $E=mc^2$। তাহা হইলে চেতন অচেতন সকল বস্তুর মধ্যে এক মহাশক্তির খেলা ইহা স্থির হইল। ঐ মহাশক্তি যদি চেতনাবিশিষ্ট হয় তাহা হইলে ঈশ্বর-আবিষ্কারের বাকী কি রহিল? বিশ্বের মূলে একটি চৈতন্যময় শক্তি আছে সিদ্ধান্ত হইল। চৈতন্য শক্তিই বেদান্তের ব্রহ্ম। তাহাই বিজ্ঞান জগৎ বিশ্লেষণ করিয়া ব্রহ্মতে পৌঁছিল। বিজ্ঞান নিখিল শক্তির মধ্যে একটি বিরাট সমন্বয় পাইল। উপনিষদ্ যে বলিয়াছেন জগতের

স্রষ্টা ব্রহ্ম— বিজ্ঞানও বিশ্বের বিবিধ শক্তির মধ্যে একটি সমন্বয়ে তাহাই বলিল। এই সমন্বয়ের সূত্র পূর্বে ভারতীয় তন্ত্রবিজ্ঞানও দিয়াছে। ইহাই 'তত্তু সমন্বয়াৎ' সূত্রের লক্ষ্য।

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম চারিটি সূত্র আলোচনা করা হইল। এই চতুঃসূত্র ব্যাখ্যানের মধ্য দিয়াই আচার্যপাদগণ তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদ বলা প্রায় শেষ করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্র একই কিন্তু তাহার প্রতি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক্। মুখ্য ভেদই হইল ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ এই তিনের স্বরূপ, সম্বন্ধ ও সম্পর্ক লইয়া।

দুইটি প্রধান গোষ্ঠীর কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহাদের সুস্পষ্ট পার্থক্যগুলি পাশাপাশি পুনরায় স্থাপন করিয়া সুষ্ঠুরূপে ব্যক্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

১) ব্রহ্মসূত্রের আরম্ভে প্রথম উচ্চারিত "অথ" শব্দটির তাৎপর্য আনন্তর্য— ইহার পর। কিসের পরে তাহা লইয়া মতভেদ। সন্ন্যাসীগোষ্ঠী বলেন, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শম-দমাদি সাধন ও মুমুক্ষুত্ব। এই চারিটি যোগ্যতা লাভ করিবার পর বেদান্তশাস্ত্রে প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মিবে। বৈষ্ণবগোষ্ঠী এই কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, পূর্বমীমাংসার জ্ঞান লাভ করার পরে উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তে প্রবেশ করিতে হইবে। তাঁহারা বলেন, মীমাংসা একখানি গ্রন্থ, তাহার দুইভাগ। পূর্বমীমাংসায় ১২টি অধ্যায় ও উত্তরমীমাংসায় ৪টি অধ্যায়— এই ১৬ অধ্যায়ে গ্রন্থটি পূর্ণ। পূর্বমীমাংসা বা ধর্মজিজ্ঞাসা জানিয়া তাহার নির্দেশ জীবনে প্রতিপালন করতঃ সংসারের নশ্বরত্বের জ্ঞান জন্মিবে। তৎপর উত্তর- মীমাংসা বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রবেশের অধিকার হইবে। কারণ প্রথমে কর্ম ও কর্মফলের অনিত্যতা সম্বন্ধে সজাগ না হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার জন্য লালসা জাগিবে না। সন্ন্যাসীগোষ্ঠী দুই মীমাংসার মধ্যে কোন পারস্পরিক সম্বন্ধ স্বীকার করেন না। বৈষ্ণবগোষ্ঠী এই সম্বন্ধ স্বীকার করেন।

২) সন্ন্যাসীগোষ্ঠীর বিশ্বাস, মানুষ এই জন্মে এই দেহেই জীবন্মুক্ত হইতে পারে ব্রহ্মদর্শন করিয়া। তাঁহারা মৃত্যুর পর যাবতীয় সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে উঠিয়া সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম হইয়া যান। নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলে দেখা স্বপ্নগুলি যেমন মিথ্যা বলিয়া অনুভূত হয় সেই-রূপ হয়। আগে যাহা সত্য মনে হইত তাহা তখন মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান হয়। জীবন্মুক্তের অবস্থাটি এই রূপ। বৈষ্ণবগোষ্ঠী মনে করেন, একটি

জীবন্ত মানব জীবন্মুক্ত হইতে পারে না। যতক্ষণ দেহ আছে ততক্ষণ সে কিছুতেই মুক্ত নয়। দেহত্যাগের পরেও মুক্তজীব জীবই থাকে, ব্রহ্ম হইয়া যায় না। মুক্তজীব ব্রহ্ম হয় না তবে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে। ভগবানের দাসরূপে তাঁহার সেবায় সম্পূর্ণ আত্মদান করিয়া পরমানন্দের অধিকারী হয়।

৩) মুক্তি লাভের উপায় সম্বন্ধে— সন্ন্যাসীগোষ্ঠী বলেন— উপায় হইতেছে জ্ঞান। সেই জ্ঞান জাগতিক কোন জ্ঞান বা বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞান নহে। শ্রুতিতে যে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য আছে সেই বিষয় নিখুঁত নির্দোষ স্বানুভূতি লাভই সেই জ্ঞান। তত্ত্বমসি মহাবাক্যের অর্থ— তুমিই সেই ব্রহ্মবস্তু। এই বাক্যের যথার্থ অববোধ হইলেই জীব মুক্তিলাভ করে। বেদে চারিটি মহাবাক্য আছে। এই মহাবাক্যের গভীরতম জ্ঞানই মুক্তির উপায়।

বৈষ্ণবগোষ্ঠী বলেন— জ্ঞান কখনও মুক্তিলাভের উপায় নহে। একমাত্র ভক্তিই মুক্তির উপায়। জ্ঞান সহকারী মাত্র। ভক্তের নিরন্তর ভক্তিপূর্ণ সেবায় ভগবান্ প্রীত হন। তখন তাঁহার প্রসাদে অর্থাৎ কৃপায় ভক্ত মায়াময় দুঃখের সাগর হইতে মুক্তি লাভ করে। জীব পরমেশ্বরের দাস। দাসের একমাত্র কার্য সেবা। সেবক যদি নিজেকে সেব্য প্রভু মনে করে তবে সে ক্ষমার আযোগ্য অপরাধী হয়। সে রাজদ্রোহীর প্রাপ্য শাস্তি পায়। 'তত্ত্বমসি' বাক্যের অর্থ, তুমি ও ব্রহ্ম একই— ইহা নহে। 'তত্ত্বমসির' যথার্থ অর্থ— তুমি হও ব্রহ্মের নিজ জন। তস্য ত্বম্ অসি।

৪) (ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সন্ন্যাসীগোষ্ঠী বলেন, ব্রহ্ম নির্বিশেষ, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। ব্রহ্ম যে কি বস্তু তাহা বাক্য দ্বারা বলা যায় না, মন দিয়া ভাবা যায় না। তিনি যে কি নহেন— তাহা বাক্য দ্বারা বলা যায়, মনের দ্বারাও ধারণা কিছু করা যায়। বৈষ্ণবগোষ্ঠী বলেন, ব্রহ্মসত্তা সবিশেষ। তাহাতে অশেষ কল্যাণগুণ আছে। তাঁহার অনন্ত করুণা আছে, অনন্ত ক্ষমা আছে। তাঁহার শক্তি অনন্ত, জ্ঞান অনন্ত। শ্রুতি যেখানে তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়াছেন তাহার অর্থ হিংসা, বিদ্বেষ, অসাধুতা, ক্ষুদ্রতা, নীচতা, অসম দৃষ্টি ইত্যাদি হেয় গুণ তাঁহাতে বিন্দুমাত্রও নাই।)

৫) এই প্রপঞ্চময় জগৎসম্বন্ধে সন্ন্যাসীগোষ্ঠী বিবর্তবাদী। বৈষ্ণবগোষ্ঠী পরিণামবাদী। বিবর্ত অর্থ এক বস্তুতে আর এক বস্তুর

মিথ্যা প্রতীতি ; যেমন, পথে-পড়া একটি রজ্জুকে সর্প বলিয়া দেখা। পরিণাম অর্থ প্রকৃত পরিণতিপ্রাপ্ত। যেমন দধি দুগ্ধের পরিণতি। প্রকৃত দুগ্ধই প্রকৃত পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া দধি হইয়াছে। দুগ্ধও সত্য, দধিও সত্য। বৈষ্ণবগোষ্ঠী তাই বলেন, ব্রহ্মও সত্য, জগৎও সত্য। তবে একটু তফাৎ আছে। ব্রহ্ম অপরিণামী সত্য, আর জগৎ পরিণামী সত্য। সন্ন্যাসীগোষ্ঠী বলেন, অন্ধকারে দৃষ্ট সর্পটি মিথ্যা— তাহার অধিষ্ঠান রজ্জুটি সত্য। ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা।

৬) সন্ন্যাসীগোষ্ঠী বলেন, জীব ব্রহ্মই। কোন তপস্যা করিয়া তাহাকে ব্রহ্ম হইতে হইবে না। একটি ঘটের মধ্যে যেটুকু আকাশ সেই ঘটাকাশ আর ঘটের বাহিরে যে বিরাট আকাশ তাহা মহাকাশ। ঘটাকাশ মহাকাশ হইয়া গেল। ঘটটি যেন আকাশের উপাধি। জীবের উপাধি দেহাত্মবুদ্ধি। এই বুদ্ধি উপাধিটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেই সে ব্রহ্ম। জীবের ব্রহ্মত্ব লাভের মধ্যে কোন প্রক্রিয়া বা process নাই। যখন জীবের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয় তখন সেইটি হয় তার প্রাপ্তির প্রাপ্তি।

বৈষ্ণবগোষ্ঠীর মতে, জীব ব্রহ্মের অংশ, জীব কখনও ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন নহে। জীব অণু, অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তি ; ব্রহ্ম ভূমা, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ। জীব যে অণু— বদ্ধদশাতেও অণু, মুক্তদশাতেও অণু। তাহার অণুস্বরূপ নিত্য। নিত্যকালই সে পৃথক্ রহিবে। মুক্তদশায় জীব ব্রহ্মসান্নিধ্য লাভ করিয়া নিত্যদাসরূপে সেবানন্দে লীলারসের সাগরে ভাসিবে ডুবিবে খেলিবে।

শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদী, রামানুজ আচার্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, মধ্বাচার্য দ্বৈতবাদী, নিম্বার্কাচার্য ভেদাভেদবাদী, গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী। এই বাদ কথাগুলি নির্ভর করে প্রধানতঃ জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধের ভিত্তিতে। শঙ্কর মতে জীবে ও ব্রহ্মে কোন সম্বন্ধ নাই, একেবারেই অভিন্ন। এইজন্য তিনি অদ্বৈতবাদী। রামানুজ মতে জীব ব্রহ্ম অভিন্ন নহে। জীব যেন ব্রহ্মের শরীর। জীব ব্রহ্মকে বিশিষ্ট করিয়াছে, দেহ যেমন দেহীকে বিশিষ্ট করে। এই জন্য তাঁহার মতের নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। মধ্বাচার্য মতে জীব ও ব্রহ্ম পৃথক্। তিনি দুইকেই পৃথক্ ভাবে মানেন। জীব আর ব্রহ্ম। ইহাদের স্রষ্টা-সৃষ্ট সম্বন্ধ। আর কিছু নহে। সেব্য-সেবক ভাব।

নিম্বার্কাচার্য ভেদাভেদবাদী। তিনি বলেন, জীব ব্রহ্মের অংশ, ব্রহ্ম অংশী। জীব ও ব্রহ্ম ভিন্নও অভিন্নও। "অংশাংশিভাবাজ্জীব-

পরমাত্মনোর্ভেদাভেদৌ''। নিম্বার্কাচার্য অভিন্নতা ভিন্নতা সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন— 'সমুদ্রতরঙ্গয়োরিব', 'সূর্যতৎপ্রভয়োরিব'। শঙ্করাচার্য ভেদাভেদবাদ অতি কঠোরভাবে খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন, একই বস্তু একই সঙ্গে ভেদ এবং অভেদ হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ।

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের অনুবর্তী গৌড়ীয় আচার্যগণ ভেদাভেদবাদী। শ্রীজীব গোস্বামী ভেদাভেদবাদ স্থাপন করিয়া তাহার পূর্বে একটি 'অচিন্ত্য' শব্দ যোগ করিয়াছেন। তাৎপর্য এই যে, ভেদাভেদ যুক্তিবিরুদ্ধ— কিন্তু যুক্তির ঊর্ধ্বে আর একটি রাজ্য আছে তাহা রসের রাজ্য। রসের অনুভূতিতে ভেদাভেদ বিরোধী নহে। শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায় তিনটি প্রস্থান ছিল। মহাপ্রভু রসপ্রস্থান নামক আর একটি প্রস্থান প্রপঞ্চিত করেন। রসপ্রস্থানের আলোকেই গৌড়ীয় আচার্যদের অচিন্ত্যভেদাভেদ অনুভব করিতে হইবে।

বেদান্তের মতবাদ সমূহের মূলভিত্তি জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ লইয়া। সম্বন্ধের তিনটি প্রকাশ— অভেদবাদ, ভেদবাদ ও মধ্যবর্তী সমন্বয়ী ভেদাভেদবাদ। অভেদবাদী বলেন, জীব ও ব্রহ্ম সর্বতোভাবেই অভিন্ন। 'জীব ব্রহ্মৈব'। ভেদ আছে বলে যে মনে হয় তাহা অবিদ্যাহেতু।

ভেদবাদী বলেন, স্রষ্টা ব্রহ্ম, সৃষ্ট জীব। স্রষ্টা ও সৃষ্টি নিশ্চয়ই পৃথক্। সুতরাং ভেদবিশিষ্ট কদাপি অভিন্ন হইতে পারে না। ঈশ্বর ও জীবকে অভিন্ন মনে করা হবে গুরুতর অপরাধ। প্রজার সকল অপরাধ রাজা ক্ষমা করিতে পারেন। কিন্তু কোনও প্রজা যদি 'আমিই রাজা' বলিয়া ঘোষণা করে তাহা হইলে তার শিরশ্ছেদ করা ছাড়া রাজার আর উপায় থাকে না। 'ঘাতয়ন্তি হি রাজানঃ, রাজাহম্ ইতি বাদিনম্।' ইহা দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্যের উক্তি। ভেদবাদীর মতে জীব ও ব্রহ্ম চিরদিনই ভেদবিশিষ্ট। জীব বদ্ধ অবস্থায়ও ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, মুক্ত অবস্থায়ও ঈশ্বর হইতে ভিন্ন।

সমন্বয়বাদী বলেন, জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ ভেদও অভেদও। শ্রুতিতে ব্রহ্ম ও জীবের ভেদবাচক বাক্যও আছে অভেদ বাচক বাক্যও আছে। সুতরাং শ্রুতিবাক্যকে মর্যাদা দিতে হইলে ভেদাভেদবাদ ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

আচার্য শঙ্কর ভেদাভেদবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান যুক্তি একটিই। দুইটি বস্তুর সম্বন্ধে ভেদ ও অভেদ দুইই হওয়া কোন প্রকারেই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না।

যাঁহারা ভেদাভেদবাদী তাঁহারা বলেন, শ্রুতির বিচারে যুক্তিটি খুব বড় কথা নহে। শ্রুতির বাক্যই সত্য, তাহা আমাদের মত মানুষের বিচার-সহ না হইলেও। যাহা যুক্তিবিচার দ্বারা জানা যায় না তাহার জন্যই তো শ্রুতি। শ্রুতিবাক্য কোন যুক্তিতর্কের অধীন নহে। যুক্তি মানিতে হইবে কিন্তু শ্রুতির আগে নহে, শ্রুতির সঙ্গেও নহে—— শ্রুতির পশ্চাতে আসিবে যুক্তি। যুক্তি সর্বদাই রহিবে শ্রুতির অনুকূলে। যেহেতু অভেদবোধক ও ভেদবোধক উভয় প্রকার শ্রুতি দৃষ্ট হয়, সেই হেতু ভেদাভেদবাদই প্রকৃত শ্রৌত-সিদ্ধান্ত।

আচার্য শঙ্কর ভেদাভেদবাদী কোন্ আচার্যকে খণ্ডন করিয়াছেন তাহা ঠিক বুঝা যায় না। প্রাচীন কালে ঔড়ুলোমী ছিলেন ভেদাভেদবাদী। তাঁহার নাম বেদান্তসূত্রে উল্লেখ আছে। পরবর্তী কালে ভাস্করাচার্য, নিম্বার্কাচার্য, শ্রীনিবাসাচার্য, শ্রীজীব গোস্বামী, বলদেব বিদ্যাভূষণ ইঁহারা ভেদাভেদবাদী।

নিম্বার্কাচার্য শঙ্করের পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী নির্ণয় করা কঠিন। তাঁহার ভাষ্যে কোনও শঙ্কর-মতের খণ্ডন দেখা যায় না। শঙ্করের পরবর্তী হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার খণ্ডন থাকিত। কোন বৈষ্ণবাচার্যই শঙ্করের মত সমালোচনায় নীরব থাকিতে পারেন না। ইহা হইতে বুঝা যায়, নিম্বার্ক শঙ্করের পরবর্তী নহেন। পক্ষান্তরে শঙ্কর বহু মতের খণ্ডন করিয়াছেন, নিম্বার্কাচার্য সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। ইহাতে মনে হয় নিম্বার্কাচার্য শঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী।

নিম্বার্কাচার্য তাঁহার 'বেদান্ত-পারিজাতসৌরভ' ভাষ্যে নিজেকে বৈদিকাচার্য সনকাদি (সনক, সনাতন, সনন্দ ও সনৎকুমার) দ্বারা অনুগৃহীত একথা বলিয়াছেন। নিজেকে নারদের শিষ্য বলিয়াও পরিচয় দিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে সনৎকুমার ও নারদের কাহিনী আছে। তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নারদ সনৎকুমারের শিষ্য। ইহাতে মনে হয় নারদ সনৎকুমার ইঁহারাও ভেদাভেদবাদী ছিলেন। ঔড়ুলোমী, সনৎকুমার, নারদ ইঁহাদের কোন গ্রন্থ নাই। সুতরাং কাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া শঙ্কর ভেদাভেদবাদ খণ্ডন করিয়াছেন তাহা ঠিক করা যায় না।

ভেদাভেদবাদ তিন প্রকার দৃষ্ট হয়। ভাস্করাচার্য ঔপাধিক-ভেদাভেদবাদী, নিম্বার্কাচার্য স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদী ও শ্রীজীব গোস্বামী অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী।

ঔপাধিক-ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্য বলেন, জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ

যে ভেদাভেদ তাহা ঔপাধিক। অর্থাৎ জীব যতক্ষণ না মুক্তি লাভ করে ততক্ষণ সে ব্রহ্মের সঙ্গে কোন অংশে ভেদ যুক্ত কোন অংশে অভেদ থাকে। কিন্তু মুক্তির পর জীব ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নই হইয়া যায়। তখন আর ভেদ থাকে না।

স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদী নিম্বার্কাচার্য বলেন, জীব ও ব্রহ্মের যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ তাহা স্বাভাবিক। স্বভাব অপরিবর্তনীয়। মুক্তির পরেও ঐ সম্বন্ধ থাকে। কোন প্রকার পরিবর্তন হয় না।

জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে একথা যেমন 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যে বলিয়াছেন; জীব ব্রহ্মের অংশ একথাও শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছেন। ব্রহ্ম ভূমা, জীব অণু। ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, জীব অল্পজ্ঞ। গীতায় শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন।

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" (গীতা, ১৫/৭)

জীব ব্রহ্মের অতি সূক্ষ্ম অংশ ও প্রতি দেহে ভিন্ন বলিয়া অনন্ত—

"বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ য বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে।।"

ব্রহ্মসূত্রে (২/৩/৪২) স্পষ্ট আছে "অংশো নানাব্যপদেশাৎ"— মুক্তাবস্থাতেও জীবের ব্রহ্মের মত সর্বজ্ঞতা বা সর্বশক্তিমত্তা লাভ হয় না। মুক্ত জীবও জীবই। কোন কারণেই জীবত্বের ঐকান্তিক নাশ হইতে পারে না। জীব তত্ত্বতঃ নিত্য, সুতরাং তাহার অংশত্ব চির অপরিবর্তনীয়।

নিম্বার্কাচার্য জীবের স্বরূপ নির্ণয়ে বলিয়াছেন—

"জ্ঞানস্বরূপং চ হরেরধীনম্
শবীরসংযোগবিয়োগযোগ্যম্।
অণুঃ হি জীবং প্রতিদেহভিন্নম্
জ্ঞাতৃত্ববন্তং যদনন্তমাহুঃ ।।"

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ আচার্য শ্রীজীব গোস্বামী। তিনি বেদান্ত-সূত্রের কোন ভাষ্য লিখেন নাই। শ্রীরূপ সনাতন প্রমুখ কেহই লিখেন নাই। তাঁহাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থই বেদান্ত-সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। এই জন্যই তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতেরই টীকা ভাষ্য করিয়াছেন। 'ষট্সন্দর্ভ' নামে শ্রীজীব ছয়খানি প্রকরণ গ্রন্থ লিখিয়াছেন দার্শনিক আলোচনাপূর্বক। তাঁহার শেষগ্রন্থ 'সর্বসংবাদিনী' গ্রন্থে তিনি অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীজীবের দৃষ্টি শ্রীমদ্ভাগবতের দিকে ও শ্রীমন্ মহাপ্রভু

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দিকে। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমুখে সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন—

"জীবের স্বরূপ হয়— কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি— ভেদাভেদ প্রকাশ।।"

ভেদাভেদ প্রকাশ কথাটি শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ। শ্রীনিম্বার্কাচার্যের ভেদাভেদবাদ ও শ্রীজীবের ভেদাভেদবাদ প্রায় একই কথা।

নিম্বার্কাচার্য বলিয়াছেন, জীব ব্রহ্মের চিদংশ। শ্রীজীব বলিয়াছেন, জীব ব্রহ্মের তটস্থশক্তি। অনুবন্ধ চতুষ্টয় আলোচনায় শ্রীনিম্বার্ক বলিয়াছেন, মোক্ষই প্রয়োজন। বলদেব বলিয়াছেন, পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎকার প্রয়োজন। শ্রীজীব শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমুখোক্ত বাণী অবলম্বনে বলিয়াছেন, "প্রেম প্রয়োজন"।

শ্রীনিম্বার্কাচার্যের ভেদাভেদবাদের নাম স্বাভাবিক-ভেদাভেদ আর শ্রীজীব গোস্বামীর দেওয়া নাম অচিন্ত্য-ভেদাভেদ। অচিন্ত্য বলিবার কারণ বলিতেছি।

ভেদাভেদবাদে যাঁহারা দোষ ধরিয়াছেন তাঁহারা কেহই ওই মতকে শ্রুতিবিরুদ্ধ বলেন নাই, বলিয়াছেন যুক্তিবিরুদ্ধ। ভেদ ও অভেদ দুইটি বিরোধী কথা। তাহাদের একত্রাবস্থান যুক্তিতে টিকে না। কিন্তু ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তিবলে বিরোধিতার সমন্বয় সম্ভব। ব্রহ্মের শক্তি যে অচিন্ত্য তাহা শ্রুতি বলিয়াছেন। সুতরাং সকল আচার্যপাদগণই মানিয়াছেন। অচিন্ত্য শব্দের তাৎপর্য চিন্তার অতীত। যুক্তিবুদ্ধির ঊর্ধ্বে। শ্রীজীব গোস্বামী শুধু এই অর্থেই অচিন্ত্য শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। ভেদাভেদসম্বন্ধ যুক্তির রাজ্যে স্থাপনীয় নহে, কিন্তু যুক্তির অতীত আর একটি রাজ্য আছে। তাহার নাম রসের রাজ্য, শুদ্ধ প্রীতিরসের রাজ্য। সেই রাজ্যে ভেদ ও অভেদের সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব। বিচাররাজ্যে ব্রহ্ম এক— একমেব। রসের রাজ্যে ব্রহ্ম দুই। রসের বিষয় ও আশ্রয় দুই না হইলে রস নিষ্পন্ন হয় না। শ্রুতিই ব্রহ্মকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়াছেন।

মধুর রসের সমৃদ্ধিমান সম্ভোগে আশ্রয়-বিষয় যখন গভীর মিলনে গাঢ় আলিঙ্গনে "সম্পরিষ্বক্ত" তখন তাহাদের সম্বন্ধ একই সময়ে ভেদ ও অভেদ। রসশাস্ত্রের গভীর তাৎপর্যময় আস্বাদন করিয়াছেন শ্রীরূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে। শ্রীজীব গোস্বামী করিয়াছেন

'প্রীতি-সন্দর্ভে'। ব্রহ্মতত্ত্বকে শুদ্ধ-পরতত্ত্ব ভাবনা করিলে ভেদাভেদের সমাধান মিলে না। তাঁহাকে "শৃঙ্গার রসরাজ মূর্তিধর" ধ্যান করিলে, রামানন্দ রায়ের "ন সো রমণ ন হাম রমণী" এই নিবিড় রসাত্মক বাক্য হৃদ্‌গত হইলে ভেদ ও অভেদের চরম পরম সমাধান দৃষ্টিগোচর হয়।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পার্ষদেরা শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের ব্যক্ত স্বরূপের মধ্যে ভেদাভেদের সমাধানটি প্রকট দর্শন করেন। শ্রীরাধা রসের আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণ রসের বিষয়। শ্রীগৌররূপে একত্বপ্রাপ্ত। একত্ব হইয়াও দ্বিত্ব প্রকাশমান। অভিন্ন হইয়াও ভেদ ভূমিতে শ্রীরাধা ভাবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ক্রন্দনরত। আবার শ্রীকৃষ্ণ ভাবে রাধা রাধা বলিয়া ব্যাকুলভাবে রোদনপরায়ণ। ভেদে অভেদ। অভেদে ভেদ। ইহাই ভেদাভেদ। তাহাদের মিলনের রহস্য প্রেমের গাঢ়তমতা। সুতরাং ভেদাভেদ তত্ত্ব অনুভববেদ্য হইতে পারে শুদ্ধ প্রীতিরসের ভূমিকায়। বিচার-বুদ্ধির প্রচেষ্টায় নহে। এইজন্যই "অচিন্ত্য" বলিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদীরা বলেন— ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ। সগুণ তাঁহার মধ্যে ব্যবহারিক সত্য, নির্গুণ ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য। নিম্বার্কবাদী বলেন— সগুণ, নির্গুণ দুইই পারমার্থিক সত্য। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ। ব্রহ্মের শক্তি স্বাভাবিক। ইহা ঔপচারিক নহে। আচার্য নিম্বার্কের মতবাদ শ্রীনিবাস তাঁহার 'বেদান্তসৌরভ' ব্যাখ্যায় প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। আর পুরুষোত্তমাচার্য 'বেদান্ত-মঞ্জুষা' গ্রন্থে বিস্তার করিয়াছেন অতি নিপুণভাবে। ভেদাভেদবাদ অবলম্বনে পণ্ডিত দেবাচার্যের বিশদ বৃত্তি আছে 'সিদ্ধান্ত-রত্ন-জাহ্নবী' গ্রন্থে। জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে নিম্বার্কাচার্যের একটি বিখ্যাত শ্লোকের ব্যাখ্যা দেবাচার্য করিয়াছেন সিদ্ধান্তপূর্ণ আলোচনায়। শ্লোকটি এই—

"জ্ঞানস্বরূপং চ হরেরধীনম্ শরীর-সংযোগ-বিয়োগযোগ্যম্।
অণুং হি জীবং প্রতিদেহভিন্নং জ্ঞাতৃত্ববন্তং যদনন্তমাহুঃ ॥"

ভেদাভেদবাদীরা অনেক বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, রামানুজাচার্যও ভেদাভেদবাদী। এমন কি শংকরাচার্যের মতেও ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদাভেদ সম্পর্ক স্বীকৃত। তাঁহার নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া ভেদাভেদবাদীরা দেখাইয়াছেন, শঙ্করও মূলতঃ ভেদাভেদবাদী। 'অংশো নানা ব্যপদেশাৎ' ইত্যাদি (২ অঃ ৩ পাদ ৪৩ সূত্র)। শঙ্কর নিজেও লিখিয়াছেন, "ভেদাভেদাবস্যা-

মাভ্যামংশত্বাবগমঃ”।

“তত্ত্বমসি” বাক্যে ভিন্ন এবং অভিন্ন বুঝা যায়। আবার “ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসিতব্যম্”। এই বাক্যে ভেদ সুস্পষ্ট। শঙ্কর শ্রুতির তাৎপর্য খুব ভালভাবে জানিয়া শুনিয়া কেমন করিয়া নির্বিশেষ অভেদবাদী হইলেন তাহা বুঝা যায় না। ভেদাভেদবাদীরা শঙ্করের অদ্বৈতবাদ খুব নিপুণভাবে খণ্ডন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, শঙ্করও কার্যতঃ ভেদাভেদবাদী। এই সমালোচনা ঠিক হইলে ভেদাভেদবাদই সূত্রের হার্দ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

রসপ্রস্থানকে ভিন্নপ্রস্থানরূপে গ্রহণ করিলে ভেদাভেদবাদের রহস্য কিছু উদ্ঘাটন করা যায়।

প্রাচীনেরা তিনটি প্রস্থান স্বীকার করিয়াছেন: (১) শ্রুতিপ্রস্থান, (২) স্মৃতিপ্রস্থান ও (৩) ন্যায়প্রস্থান।

মহাপ্রভু আগমনের পর ‘রসপ্রস্থান’ নামে আর একটি চতুর্থ প্রস্থান প্রকট হইয়াছে। রূপ, সনাতন ও শ্রীজীবের গ্রন্থসমূহে তাহা ব্যক্ত হয়। রসপ্রস্থানগুলি হইতে চতুঃসূত্রের আলোচনা আমরা ক্রমশঃ করিব।

বৈদিক যুগ হইতে দার্শনিকগণের সত্য নির্ধারণে তিনটি পথ। এই পথগুলিকে বলা হয় প্রস্থান। শ্রুতিপ্রস্থান, স্মৃতিপ্রস্থান ও ন্যায়প্রস্থান। এই তিনটি প্রস্থান। ব্রহ্মতত্ত্বের চরম সংবাদ দিয়াছেন উপনিষদ্— এই উপনিষদ্ শ্রুতিপ্রস্থান। মহাভারত ও তদন্তর্গত ভগবদ্গীতা স্মৃতিপ্রস্থান। ব্রহ্মসূত্র ন্যায়প্রস্থান। প্রথমটি অপরোক্ষ অনুভূতিলব্ধ, দ্বিতীয়টি বাস্তব জীবনধারার মধ্যে ব্যক্ত ঐতিহাসিক সত্য, তৃতীয়টি যুক্তিবিচারে সিদ্ধ। অনুভূতি, জীবনস্মৃতি ও যুক্তি এই তিনটি তত্ত্বজ্ঞান লাভের তিনটি প্রস্থান বা পথ।

ইহা ছাড়া আরেকটি প্রস্থান আছে। তাহার রূপদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণ। তাঁহার পার্ষদগণ তাঁহার আগমনের দুইশত বৎসর পূর্ব হইতে চারিশত বৎসর পর পর্যন্ত আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের আস্বাদিত ও অনুস্যূত ‘রসপ্রস্থান’। রসপ্রস্থানের মূলসূত্র বেদ-শাস্ত্রেই নিহিত আছে। উহা ধীরে ধীরে কালক্রমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মূলভূমি বেদ-ই।

বেদ পরমতত্ত্বের স্বরূপ সম্পর্কে বলিয়াছেন, তিনি অস্তি, ভাতি ও প্রিয়ম্। অস্তি— তিনি আছেন। সর্বদাই আছেন —বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড

ভরিয়া সর্বত্র সর্বভূতে চিরবিরাজমান আছেন। ইহাতে বুঝা যায় তিনি সৎস্বরূপ।

ভাতি— তিনি শুধু আছেন নহে, প্রকাশমান হইয়া আছেন। যাহা কিছু আছে জানিতেছেন— জানিয়া চৈতন্যরূপে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। অস্তি বা সত্তার প্রকাশ চৈতন্যভূমিতে। তিনি শুধু সৎ নহেন, চিৎও বটে। চিৎ-এর আধারে সৎ। এই সৎ ও চিৎ-এর মূলীভূত, যাহা সৎ ও চিৎকে একীভূত করিয়াছে তাহা হইল প্রিয়ত্ব। তিনি প্রিয়, সর্বাপেক্ষা প্রিয়, প্রিয়তম। তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, পতি হইতে প্রিয়, পত্নী হইতে প্রিয়। দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি চিত্ত সকলকে ছাপাইয়া তাঁহার প্রিয়ত্ব। তাঁহার প্রিয়ত্বে বসতি। এই প্রিয়ত্বই আনন্দের আকর। তিনি পরম প্রিয় বলিয়াই আনন্দঘন।

ব্রহ্মবস্তু অস্তি-ভাতি-প্রিয়ত্ব বলিয়াই সচ্চিদানন্দ। "রস হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি"। আনন্দ আসে কোথা হইতে ? রসের আস্বাদন হইতে। তাই তো শ্রুতি তাঁহার চরম পরিচয় দিয়াছেন— সর্বশেষ সন্দেশ দিয়াছেন— "রসো বৈ সঃ"— তিনি রস— রসবৎ— রসতম। তিনি শুধু প্রজ্ঞাস্বরূপ নন— আনন্দঘন— তিনি রমণীয়— তিনি রুচির—তিনি মধুর— মধুরাতিমধুর। তাই স্মৃতির পরম সর্বশেষ পরিচয় তিনি রস। ভাগবত বলেন, তিনি শুধু রস নহেন, রসিকও বটে। রসিক রসের আস্বাদক। অনাস্বাদিত রস রস নহে। সন্দেশ মিষ্টি— রসনার সঙ্গে সংযুক্ত হইলেই মিষ্টি। তিনি নিজেই যখন রস— রসিক রূপে তিনি নিজেকেই নিজে আস্বাদন করেন। অনাদিকাল ধরিয়া এই আস্বাদন চলিতেছে। এই আস্বাদনের ফলেই সৃষ্টি। এই আস্বাদনের চরিতার্থতাতেই নিত্যলীলা।

রস হইতেই সৌন্দর্যের উপলব্ধি। সৌন্দর্য উপলব্ধির অনুভব হেতু রস। মানবের গোটা জীবনেই রসের অনুসন্ধান চলিতেছে। নিজেকে নিজে অনুসন্ধান করিয়া পান নাই— নিরবধি অনুসন্ধানই চলিতেছে। এই অনুসন্ধানের একটি মাধুর্যঘন বিকাশ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। কথাটি আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিব। রস আস্বাদন কার্যটি একাকী কখনও হয় না। শ্রুতির উক্তি 'একাকী নৈব রমতে'। সুতরাং রস আস্বাদন করিতে হইলেই দ্বৈতের প্রয়োজন। রসের আস্বাদ্যমানতা দ্বৈতভূমিতেই মূর্তিমন্ত। এই দ্বৈতের নাম রসের আশ্রয় ও রসের বিষয়। যদিচ তিনি একাকী, নৈব দ্বিতীয়ম্, সর্বপ্রকারে দ্বৈতরহিত।

তিনি যখনই রসের ভূমিকায় রসিক তখনই দ্বৈতাশ্রয় বা দ্বেধা প্রকটিত। সৎ-চিৎ স্বরূপে তিনি অদ্বিতীয় এক। রসের ভূমিকায় তিনি রাধাকৃষ্ণ দুইই। একও নিত্য— দুইও নিত্য। এক বস্তু দুই হইলেই রস দ্বিরূপতা প্রাপ্ত হয়। আনন্দের দুইটি মূর্তি হয়। একটি আশ্রয় আনন্দ আরেকটি বিষয় আনন্দ।

আশ্রয় আনন্দ বিষয়ে নাই। বিষয়ের আনন্দ আশ্রয়ে নাই। রসের আস্বাদনে উন্মত্ততা আনিতেই দ্বৈতের সৃষ্টি। কিন্তু হায়! দ্বৈতের মধ্যে নূতন অভাবের উদ্ভব। আশ্রয়ের আনন্দের অভাব বিষয়ে। রসের আশ্রয় যে শ্রীরাধা তাঁহাতে যে আনন্দের আস্বাদন তাহা বিষয়স্বরূপ রসিক শ্রীকৃষ্ণে নাই। বিষয়কে আস্বাদন করিয়া আশ্রয়ের যে আনন্দ তাহা বিষয়ের মধ্যে নাই।

একটি গোলাপফুলকে দেখিয়া গন্ধ লইয়া স্পর্শ করিয়া যে সুখ হয় তাহা গোলাপের নাই। গোলাপ তাহা জানে না। তাই গোলাপের মধ্যে যে আনন্দের অভাব তাহাকে পূর্ণ করিতে গোলাপের লালসা। গোলাপের অন্তরের সাধ চক্ষু হইয়া নিজরূপ দেখিব। নাসিকা হইয়া নিজ গন্ধ লইব। স্পর্শ-ইন্দ্রিয় হইয়া নিজ কোমলতা স্পর্শসুখ উপভোগ করিব। বিষয় যদি আশ্রয় হইয়া যাইতে পারে তবেই সে সাধ পূর্ণ হয়। কোনও দিন কোনকালে বিষয়ের এই বাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। কোনও রসগোল্লাই জিহ্বা হইয়া জানিতে পারে নাই রসের কি আস্বাদন। নিখিল রসের একমাত্র বিষয় চিদ্‌ঘন ব্রহ্মবস্তু বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের এই সাধ পূর্ণ হইয়াছে। তিনি রসিকশেখর বলিয়াই রসরাজ্যের নিবিড়তম বাঞ্ছা তাহাতে পূর্ণতমতা প্রাপ্ত হইয়া অখণ্ডতা সার্থক হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গূঢ় বাঞ্ছা, শ্রীরাধা আমার বাঁশী শুনিয়া কি সুখ পায়— আমার রূপ দেখিয়া কিরূপ আনন্দ লাভ করে— আমাকে স্পর্শ করিয়া, অঙ্গ গন্ধ লইয়া কি সুখ সাগরে ভাসে— তাহা আমি জানিয়া ভোগ করিব। আশ্রয়জাতীয় এই আনন্দ-আস্বাদনের তীব্র লোভে দুই নিবিড়ভাবে একাঙ্গতা প্রাপ্ত হইয়াছে। রসবস্তুর অখণ্ডতা মিলিততনু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরে পূর্ণতমতা লাভ করিয়াছে।

একত্ব না হইলে অখণ্ডতা থাকে না। দ্বিত্ব না হইলে রস আস্বাদ্যমান হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরে একত্ব ও দ্বৈতের অভূতপূর্ব সমন্বয়। তিনি এক হইয়াও দুই। দুই হইয়াও এক। অচিন্ত্যভেদাভেদ দর্শনের সিদ্ধান্ত,

শ্রীগৌরহরির জীবনে মূর্তিমন্ত। একটি দার্শনিক সিদ্ধান্ত ইতিহাসে জীবন্ত। রসদর্শনের শেষ সিদ্ধান্ত শ্রীগৌরসুন্দরে প্রাণবন্ত।

এই রসসিদ্ধান্তটি শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীর অন্তরের অন্তঃস্থলে দীপ্যমান আছে বলিয়াই তিনি তাঁহার ভেদাভেদবাদকে 'অচিন্ত্য' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। 'অচিন্ত্য' অর্থ শুধু চিন্তার অতীত নহে; রসের সাম্রাজ্যে রসলীলা-ধ্যানপরায়ণ সাধকের ব্রজরসভাবিতচিত্তে সতত অনুভূত। অচিন্ত্য শব্দটি আপাততঃ অভাববাচী, কিন্তু মূলতঃ ইহা একটি মহাভাব- তত্ত্বের সন্ধান।

রসপ্রস্থানের দৃষ্টিকোণ হইতে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা একটু অন্যরূপ হইবে। আমরা "জন্মাদ্যস্য" সূত্র (১/১/২) ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছি। ইহার জন্মাদ্যস্য অর্থে বলা হইয়াছে, জন্ম-স্থিতি-লয় যাহা হইতে। কিন্তু রসপ্রস্থানের দৃষ্টিকোণ হইতে ইহার ব্যাখ্যা অন্য প্রকার। জন্মাদি অস্য এইরূপ সন্ধিবিচ্ছেদ না করিয়া জন্ম+আদ্যস্য এরূপ সন্ধিবিচ্ছেদ করিতে হইবে। সূত্রের অর্থ হইবে— আদ্যস্য আদিরসস্য, জন্ম প্রকাশঃ যতঃ যস্মাৎ। "রসো বৈ সঃ", "রসানাং স রসতমঃ" ইতি শ্রুতিঃ। "আদ্য এব পরো রসঃ" ইতি বিদগ্ধোক্তিঃ। আদি রসঃ এব রসতমঃ। আদিরসস্যাস্য যো মূর্তিঃ সঃ এব ব্রহ্ম। মূর্তিরিতি পদেনাত্র আশ্রয় উৎসভূমির্বা বোধ্যতে।

বঙ্গানুবাদ—জন্ম আদ্যস্য যতঃ। আদ্যস্য আদিরসস্য জন্ম প্রকাশ যতঃ—যাহা হইতে। আদিরসের প্রকাশ যাহা হইতে।

শ্রুতি বলিয়াছেন, তিনি রসস্বরূপ। রসসমূহের মধ্যে তিনি রসতম। "আদ্যো এব পরো রসঃ"— আদিরসই রসতম। এই আদিরসের যিনি মূর্তি— শ্রীচরিতামৃতে "শৃঙ্গার-রসরাজময় মূর্তিধর" এই রসের প্রকাশ বা প্রকটনও তাহা হইতে।

ভগবদ্গীতার ১৫/৪ শ্লোকে—

"ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গত্বা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥"

পুরাণী-প্রবৃত্তি আদ্যরস যাহা হইতে প্রসৃত হইয়াছে। আদ্যরসের অপ্রাকৃত ভোগময় মূর্তিই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। তথা বৃহদারণ্যক শ্রুতি— "স বৈ নৈব রেমে। তস্মাৎ একাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।

স হৈতাবান্ আস যথা স্ত্রী-পুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ।"

তিনি রমণপরায়ণ ছিলেন না কারণ, একাকী রমণ হয় না। তিনি দ্বিতীয় কাহাকেও ইচ্ছা করিলেন পাইবার জন্য। তাহা হইল। তাহার সঙ্গে রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রগাঢ় মিলনময় সম্ভোগের মূর্তি হইলেন তিনি। শ্রুতির এই বাক্যের সঙ্গে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে স্বরূপ দামোদরপাদের উক্তি তুলনীয়—

"একাত্মনাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তম্,
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।।"

সেই স্বয়ং ভগবান্ একাকী রমণ করিতে না পারিয়া দুই হইলেন।

"একাত্মনাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।"

সেই দুই শ্রুত্যুক্ত স্ত্রী-পুরুষ সম্পরিষ্বক্তের মত এক হইলেন। এই একের মধ্যে আদ্যরসের ক্রীড়া-বিহার সতত প্রবহমান। এই রসবিলাসময় লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই পরব্রহ্মের পূর্ণতম স্বরূপে প্রকটিত। সুতরাং 'জন্মাদ্যস্য' সূত্রের লক্ষ্যীভূত বস্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শৃঙ্গার রসবিলাসের দ্বিবিধ প্রকাশ: এক, অন্তরঙ্গা হ্লাদিনী শক্তির সহিত। এই রমণের ফল নিত্য লীলাবিলাস। আর দুই, বহিরঙ্গা শক্তির মূর্তি ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সহিত। এই বহিরঙ্গা প্রকৃতির সহিত পর-ব্রহ্মের বিহার হয় শুধু মাত্র ঈক্ষণ দ্বারা। এই ঈক্ষণেব কথাই ছান্দোগ্য শ্রুতিতে (৬/২)—

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।"
"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়।"

৫. ঈক্ষত্যধিকরণ —

সূত্র— ঈক্ষতের্নাশব্দম্।। ১/১/৫

চতুঃসূত্রী আলোচিত হইয়াছে। "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" এইটি পঞ্চম সূত্র। সূত্রটির অর্থ শঙ্কর ও রামানুজ একপ্রকার করিয়াছেন। মধ্বাচার্য-বলদেব অন্যপ্রকার অর্থ করিয়াছেন। শঙ্কর-রামানুজের ব্যাখ্যা— ব্রহ্ম অশব্দ নহেন কারণ, 'ঈক্ষতেঃ ন অশব্দম্' অর্থ— শব্দ বা বেদ যাহার কথা বলেন নাই তিনি হইতেছেন প্রকৃতি বা প্রধান; সৃষ্টির কারণ নহে। যুক্তি এই যে, আদিতে ব্রহ্ম ঈক্ষণ করিয়াছিলেন একথা শ্রুতিতে আছে— "সদেব সোম্যেদমগ্র

আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" (ছান্দোগ্য, ৬/২/১,৩)। চৈতন্যময় ছাড়া কাহারও ঈক্ষণকর্তৃত্ব হইতে পারে না। সুতরাং সৎস্বরূপ ব্রহ্মই জগৎকারণ, প্রধান বা প্রকৃতি নহেন।

"ন সাংখ্যপরিকল্পিতমচেতনং প্রধানং জগতঃ কারণং শক্যং বেদান্তেষু আশ্রয়িতুম্। অশব্দং হি তৎ। কথমশব্দম্? ঈক্ষতেঃ। ঈক্ষিতৃত্ব শ্রবণাৎ কারণস্য। এবং হি শ্রুয়তে তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।" (শাঙ্করভাষ্যম্)

মধ্বাচার্য ও তদনুগামী বলদেবসম্মত অর্থ— "নাস্তি শব্দ বাচকো যস্মিন্ তদশব্দম্। ঈদৃশং ব্রহ্ম ন ভবতি। কিন্তু শব্দ বাচ্যমেব তৎ। কুতঃ ঈক্ষতেঃ তত্ত্ব ঔপনিষদপুরুষং পৃচ্ছামীতি প্রষ্টব্যস্য পুরুষস্য ঔপনিষদসমাখ্যা দর্শনাদিত্যর্থঃ। সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি ইত্যাদি বাক্যেভ্যশ্চ। তস্মাৎ শব্দবাচ্যং ব্রহ্ম।" (গোবিন্দভাষ্যম্)

মধ্ব ও বলদেব শঙ্করের অশব্দের অর্থ যে প্রধান ইহা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। কোন প্রসঙ্গ বা ভূমিকা না করিয়া হঠাৎ সাংখ্য-মত খণ্ডনের কোন উপযোগিতা তাঁহারা দেখিতে পান নাই। তাঁহারা (মধ্ব বলদেব) বলেন, সূত্রস্থ 'অশব্দ' শব্দের অর্থ— সহজ শব্দের অবাচ্য এইমাত্র। ব্রহ্ম শব্দের অবাচ্য ইহা নহে কারণ ঈক্ষতেঃ। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (৩/৯/২৬) মন্ত্রে ব্রহ্মকে ঔপনিষদ-পুরুষ বলিয়াছেন। গীতায় 'বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ' (১৫/৫) উক্ত আছে। ব্রহ্ম, শব্দের অবাচ্য এইরূপ সংশয় জাগিবার কারণ, কঠশ্রুতি তাঁহাকে 'অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্' বলিয়াছেন। কঠ শ্রুতির 'অশব্দং' পদে অপ্রাকৃত শব্দ বুঝিতে হইবে। অপ্রাকৃত শব্দ— বেদমন্ত্র, প্রণব, শ্রীকৃষ্ণবাচক নামাক্ষর তাঁহার কথা ব্যক্ত করিতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, ব্রহ্মবস্তু কিভাবে জানা যায়— "গুর্বর্কলব্ধোপনিষৎসুচক্ষুষা"। অর্থাৎ গুরুরূপ সূর্যদ্বারা লব্ধ উপনিষদ্‌রূপ সুচক্ষুদ্বারা তাঁহাকে জানা যায়।

"অক্ষরো ব্রহ্ম উচ্যতে"। সব অক্ষর সব শব্দই ব্রহ্মকে বুঝায়। তন্মধ্যে একটিই শব্দ যে ব্রহ্মবাচী তাহা সর্ব শাস্ত্র সর্ব শ্রুতিসম্মত। ঋষি পতঞ্জলি সেই শব্দটির পরিচয় সুস্পষ্ট ভাবেই দিয়াছেন যোগসূত্রে—

"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"

গীতা বলিয়াছেন, "প্রণবঃ সর্ববেদেষু"।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন— প্রণবই বেদের মহাবাক্য। ভাগবত বলিয়াছেন—

"দ্বে ব্রহ্মণি বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ তৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্ম অভিধীয়তে॥"

দুটি ব্রহ্ম— একটি শব্দব্রহ্ম অপরটি পরব্রহ্ম। যে শব্দব্রহ্মকে ভালভাবে জানে সে-ই পরব্রহ্মকে জানে।

পরব্রহ্মের হৃদাকাশে প্রথমে নাদ উৎপন্ন হয়। সেই নাদ হইতে ত্রিমাত্রাত্মক ওঙ্কার উৎপন্ন হইল। যাহা ভগবানের বোধের দ্বারস্বরূপ—এ কথা ভাগবত বলিয়াছেন—

"সমাহিতাত্মনো ব্রহ্মণ্ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
হৃদ্যাকাশাদভুন্নাদো বৃত্তিরোধাদ্বিভাব্যতে॥
ততোঽভূৎ ত্রিবৃদোঙ্কারো যোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্।
যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ॥"

(ভা. ১২/৬/৩৭, ৩৯)

তাঁহার হৃদাকাশে যে নাদ তাহা শব্দস্তরে অবতরণ করিল ওঙ্কার-রূপে।

সকল শব্দই বাগ্‌যন্ত্রে উচ্চারিত হয়। এই জিহ্বার প্রথম স্থান কণ্ঠ, মধ্যস্থান মূর্দ্ধা, তৃতীয় বা শেষস্থান ওষ্ঠ। ওঙ্কারের মধ্যে তিনটি অক্ষর অ-উ-ম্। অ-এর উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ, ম্-এর উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ। অ আদিতে, উ মধ্যস্থলে, ম্ শেষে। তিনটি অক্ষর আমাদের জিহ্বার আদি, মধ্যে ও অন্তে বিদ্যমান। সুতরাং ওঙ্কারের উচ্চারণ সমগ্র বাগ্‌যন্ত্র ব্যাপিয়া। এই হল স্থূল দেহের কথা।

প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময়-রূপ যে সূক্ষ্মদেহ তাহাতেও ওঙ্কার বিদ্যমান। মাণ্ডূক্য শ্রুতি এই সংবাদ দিয়াছেন অতি সুন্দরভাবে। অ-কার জাগরিত স্থান, তাহার পরিচালক ব্রহ্মা, উ-কার স্বপ্নস্থান, তাহার নিয়ন্তা বিষ্ণু, ম্-কার সুষুপ্তিস্থান, তাহার নিয়ন্তা রুদ্র। সুতরাং অ-উ-ম্ সমবায়ে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ভূমির প্রকাশক।

সুতরাং ওঙ্কার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার যুগপৎ উপলব্ধি হয়। এই জন্য ওঙ্কার ব্রহ্মবাচক। ব্রহ্ম শব্দ-বাচ্য ইহা দ্বারা জানা গেল ব্রহ্ম ওঙ্কার-বাচ্য। ইহাই শেষকথা নহে।

ওঙ্কারে ব্রহ্মের তিন পাদ ব্যক্ত। আর এক পাদের নাম তুরীয়

বা চতুর্থ। গোপালতাপনী শ্রুতি চতুর্ব্যূহের সংবাদ দিয়াছেন। বলিয়াছেন, অকারাত্মক সংকর্ষণ, উকারাত্মক প্রদ্যুম্ন ও ম্‌কারাত্মক অনিরুদ্ধ। আর বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ অর্ধমাত্রাত্মক তুরীয়। তাঁহাতেই অপর তিন প্রতিষ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ শব্দ ব্রহ্মবাচক। কৃষ্ণের যত নাম সবই ব্রহ্মবাচক।

এই সিদ্ধান্ত হইতেই বৈষ্ণবাচার্যদের নাম মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণ নাম ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন। নামেতে ও নামীতে সমান শক্তি। মহাপ্রভু বলিয়াছেন শিক্ষাষ্টকে—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি স্তত্রার্পিতা।"

বহু নাম প্রকট করিয়াছেন ও সকল নামে তাঁহার সকল শক্তি অর্পণ করিয়াছেন। জল এই শব্দটির মধ্যে জলের শক্তি নাই। পিপাসা নিবারণী শক্তি জলে আছে, 'জল' এই শব্দে নাই। কিন্তু 'হরি' এই পরমতম বস্তুর যে পাপহরণ করিবার শক্তি তাহা 'হরি' এই শব্দটিতেও বিদ্যমান। যে শব্দই পরম তত্ত্বের বিজ্ঞাপক তাহাতেই সেই তত্ত্ববস্তুর সর্বশক্তি নিহিত আছে। শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধু বলিয়াছেন, "হরি শব্দ উচ্চারণ হরিপুরুষ উদয়"। হরি শব্দটি উচ্চারণ মাত্রই হরিশব্দ বাচ্য যে পুরুষবর তিনি সমুদিত হইবেন অর্থাৎ প্রকটীভূত হইবেন। হরি, রাম, কৃষ্ণ এই সকল শব্দই ওইরূপ ব্রহ্মবাচক ও ব্রহ্মের শক্তিসমন্বিত। এই জন্যই—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"

এই মহানামকে তারকব্রহ্ম নাম বলে। নামী যেমন জীবন-ভবসাগর হইতে তারণ বা উদ্ধার করিয়া থাকেন, এই নাম তদ্রূপ সমশক্তিসম্পন্ন। উচ্চারণকারীকে ভবসাগর পার করিতে সমর্থ। এই সিদ্ধান্তের উপরই জপের ভিত্তি। "জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধিঃ ন সংশয়।" নাম জপ হইতে সিদ্ধি হয় ইহাতে কোন সংশয় নাই। (শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি"।

যজ্ঞের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ। সংখ্যা রাখিয়া নামাক্ষর পুনঃপুনঃ উচ্চারণই জপ। এই জপ দ্বারা সিদ্ধি লাভের কারণ হইতেছে এই যে, নাম ও নামী অভিন্ন। ব্রহ্মবাচক যে বাক্য, তাহাতে সেই শক্তি নিহিত, যে শক্তি স্বয়ং ব্রহ্মতে চিরবিরাজিত—)

"বাচি বস্তুন্যপি সমানরসস্থিতিঃ।"

পরব্রহ্মবাচক শব্দেতে ও পরব্রহ্মরূপ পরমবস্তুতে সমান রসের স্থিতি আছে। ব্রহ্মও রসস্বরূপ, ব্রহ্মবাচক শব্দও রসস্বরূপ। এই জন্যই গোস্বামী তুলসীদাস বলিয়াছেন—

"রামনাম-মণিদীপ ধরু জীহ দেহরীদ্বার।
তুলসী ভীতর-বাহ রহুঁ জৌ চাহসি উঁজি আর।।"

(রামনামের মণিদীপ জিহ্বার অগ্রে ধরিয়া রাখ। তোমার অন্তর-বাহির দুই দিক্‌ই আলোকিত হইবে। দুয়ারের চৌকাঠের উপর প্রদীপ রাখিলে যেমন ঘরের ভিতর-বাহির আলোকিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ মুখরূপ দুয়ারের উপর জিহ্বা-চৌকাঠ। তাহাতে সতত নামজপ করিলে অন্তর্বহিঃ সমুদ্ভাসিত হয়। 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' সূত্র জানাইল ব্রহ্ম প্রণব ও কৃষ্ণ রাম প্রভৃতি শব্দ বাচ্য ও বাচকে সমান সামর্থ্য প্রতিষ্ঠিত আছে।)

পূর্বসূত্র (ঈক্ষতের্নাশব্দম্)-এ বলা হইল যে, অচেতন প্রকৃতি বা প্রধান জগতের কারণ নহে। হেতু বলা হইল যে, জগতের কারণ যিনি তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন। জড়বস্তুর ঈক্ষণকর্তৃত্ব থাকিতে পারে না। এ বিষয়ে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, ঈক্ষণ শব্দ গৌণার্থে প্রয়োগ হইয়াছে। তাহার উত্তর বলিতেছেন—

সূত্র— **গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ।। ১/১/৬**

চেৎ—যদি বলেন, ঈক্ষণ মুখ্যার্থে নহে গৌণার্থে। তাহার উত্তরে বলিতেছি, না, গৌণার্থে হইতে পারে না। যেহেতু আত্মশব্দের প্রয়োগ আছে। আত্মা যে পরম চৈতন্যময় শাস্ত্রেও উক্ত আছে। সর্বজনগোচরীভূতও আছে।

গৌণার্থে ক্রিয়ার প্রয়োগ হয় তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে যথা, শ্রুতিতেই আছে, জল ঈক্ষণ করিলেন, তেজঃ ঈক্ষণ করিলেন। লৌকিক প্রয়োগেও দৃষ্ট হয়, রৌদ্রে দগ্ধপ্রায় ধান্য বৃষ্টির অপেক্ষা করিতেছে। বারিবর্ষণে বৃক্ষলতাসকল হর্ষলাভ করিল। এইসব স্থলে যেমন অচেতনে উপচারিক চেতনাবোধক শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ঈক্ষণেরও গৌণার্থে প্রয়োগ হইতে পারে। তাহা হইলে অচেতন প্রকৃতি জগৎকারণ হইতে পারে।

এই কথার উত্তর দিতেছেন— না, তাহা সম্ভব নহে। ঈক্ষণ শব্দের গৌণার্থে প্রয়োগ সম্ভব নহে কারণ, আত্ম শব্দের প্রয়োগ আছে।

যে ছান্দোগ্য শ্রুতিতে (৬/২/৩) মন্ত্রে ঈক্ষণ শব্দের উল্লেখ

আছে—"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি," সেই শ্রুতির এই প্রকরণেই বলা হইয়াছে—

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা।" (৬/৮/৭)

এই সকলই আত্মময়, সৎ পদার্থই সত্য, তাহাই আত্মা। এইরূপে দুইবার আত্মা শব্দের প্রয়োগে দৃঢ়ভাবেই বুঝা গেল যে, ঈক্ষণ শব্দ মুখ্যার্থেই আম্নাত হইয়াছে, গৌণার্থে নহে। অতএব স্থির সিদ্ধান্ত হইল— সৃষ্টিকর্তা পরব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা। জড়া প্রকৃতি নহে। বর্তমান বিজ্ঞান জড়প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলে। এই সূত্রের দ্বারা প্রকৃতি বা Nature হইতে জগতের উদ্ভব তাহাও খণ্ডিত হইল। বিশ্বের মূলে এক পরমচৈতন্যময় সত্তা নিশ্চয়ই রহিয়াছেন, ইহাই স্থাপিত হইল।

জগৎকারণ যে ব্রহ্ম, তিনি যে জড় নহেন, চৈতন্যস্বরূপ, সে বিষয়ে আরো একটি যুক্তি উপস্থাপিত করিতেছেন পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— **তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ॥ ১/১/৭**

তৎ—সৎ শব্দবাচ্য যে জগৎকারণ বস্তু তাঁহাতে, নিষ্ঠস্য—যাহার নিষ্ঠা অর্থাৎ তৎপরতা আছে, মোক্ষোপদেশাৎ— মোক্ষ লাভ হইল এই মত উপদেশ আছে।

"তস্য তাবদেব চিরং, যাবন্ন বিমোক্ষেঽথ সম্পৎস্যে।" (ছান্দোগ্য, ৬/১৪/২)

সৎ শব্দবাচ্য জগৎকারণ ব্রহ্মবস্তুতে যাহার নিষ্ঠা আছে তাহার ততক্ষণই বিলম্ব যতক্ষণ দেহত্যাগ না হয়। দেহত্যাগের পরে সে সৎস্বরূপ হয় অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে নামের মহামহিমার কথা—

"সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥" (৬/২/১৪)

নাম উচ্চারণ করিলেই, তাহা সঙ্কেত রূপে হউক, পরিহাসরূপে হউক, গীতালাপপূরণার্থ হউক, অবজ্ঞাক্রমে হউক— বৈকুণ্ঠনাথের নাম যে কোন প্রকারে গ্রহণ করিলেই অশেষ পাপ বিনষ্ট হয়।

বীর্যবান্ ঔষধের দৃষ্টান্ত দিয়া ভাগবত ঘোষণা করিয়াছেন—

"যথাগদং বীর্যতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া।
অজানতোঽপ্যাত্মগুণং কুর্যান্মন্ত্রোঽপ্যুদাহৃতঃ॥"
(ভাগবত, ৬/২/১৯)

কোন ব্যক্তি না জানিয়াও যদি কোন শক্তিশালী ঔষধ সেবন করে সেই ঔষধ নিশ্চয়ই বস্তুশক্তি দ্বারা তাহার গুণ দর্শাইয়া থাকে। সেইরূপ হরিনাম আপনার কার্য অবশ্যই করে।

ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তি কেবল মোক্ষলাভ করে না— স্বয়ং ভগবান্‌কেই লাভ করিয়া থাকে। প্রকৃতি বা প্রধানে নিষ্ঠব্যক্তির পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে মুক্তিলাভ করিতে হইলে প্রকৃতির প্রভাব হইতে অব্যাহতি পাইতে হয়। সুতরাং প্রকৃতি জগৎকারণ নহে। চৈতন্যময় করুণাময় ব্রহ্মই জগৎকারণ।

পরব্রহ্ম শব্দবাচ্য— এই সূত্র অবলম্বনে শব্দতত্ত্ব কিছু বলা হইয়াছে, আরও একটু বিশদ করা প্রয়োজন। শব্দব্রহ্ম-পরব্রহ্মের কথা আমাদের শাস্ত্রে নানাভাবে কথিত হইয়াছে কিন্তু আশ্চর্য-সংবাদ এই যে, বাইবেলের New Testament-এর সেন্ট জন লিখিত ৪র্থ Gospel-এ একই তত্ত্বকথা সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে— "In the beginning there was word, and the word was with God and the word was God"। এই Word-ই আমাদের শাস্ত্রের শব্দব্রহ্ম। খ্রীষ্টানদের গ্রন্থে এইকথা থাকার কথা নহে কারণ, খ্রীষ্টানরা নামতত্ত্বের কথা তেমন ভাবে আর কোথায় আলোচনা করেন নাই। ঐ কথা গ্রীকজাতির সম্পদ্। গ্রীকদর্শনে প্লেটো প্রমুখ মনীষীদের চিন্তায় ঐ তত্ত্ব ছিল। খুব সম্ভব সেন্ট জন গ্রীক হইয়াই জন্মিয়াছিলেন এবং পরে খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়াছিলেন। তিনি শব্দব্রহ্ম তত্ত্ব গ্রীকদর্শন হইতে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে প্রবেশ করাইয়াছেন। যাহাই হউক নিউ টেস্টামেন্টের সেন্ট জনের কথা আমাদের শব্দব্রহ্মের দ্রষ্টা ঋষিদের বাক্যের সহিত হুবহু মিলিয়া যায় ইহা বিস্ময়কর!

সৃষ্টির পূর্বে নিত্য সত্যরূপে শব্দই বিদ্যমান ছিল। এই শব্দই প্রজ্ঞা। শ্রুতি প্রজ্ঞাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'। বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহাই নাম 'প্রজ্ঞাপারমিতা'। অর্থাৎ চরমপ্রজ্ঞা বা পূর্ণপ্রজ্ঞা। বস্তুত ইহা পরব্রহ্মের অহংস্বরূপতা বা অহন্তা। পরব্রহ্মের অহন্তাই প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞা ও ব্রহ্ম অভিন্ন। বৌদ্ধ মতে প্রজ্ঞাপারমিতাই সৃষ্টির উৎস। ইহা বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, সিদ্ধবর্গ এমনকি ঈশ্বরভাবেরও ইহা মূল বা জননী।

তন্ত্রশাস্ত্র মতে শব্দের চারিটি ভূমি। শব্দের পরিভাষা 'বাক্'। ইহার চারিটি স্তর ও ভূমি : পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী।

পরা বাক্ প্রথমে পশ্যন্তী ভূমিতে অবতরণ করেন, তারপর পশ্যন্তী

হইতে মধ্যমায়, মধ্যমা হইতে বৈখরী বাক্-এ। আমরা সর্বদা যে শব্দ উচ্চারণ করি উহা শব্দের বৈখরী রূপ। শব্দের মধ্যে দুই বস্তুর অনুভূতি বাচ্য ও বাচক। লেখনী দ্বারা কাগজের উপর যে জল শব্দটি লিখিলাম এই জল বাচক। নদীর মধ্যে প্রবাহিত যে জল উহা বাচ্য।

বৈখরী ভূমিতে বাচ্য-বাচক সম্পূর্ণ পৃথক্। পরা ভূমিতে বাচ্য-বাচক সর্বোতোভাবে একত্বাপন্ন। সেখানে 'বাচ্য-বাচকয়োঃ সমান রসস্থিতিঃ' ; পশ্যন্তী ভূমিতে বাচ্য-বাচকের ভেদের কিঞ্চিৎ উপলব্ধি। সেখানে বাচকের উচ্চারণেই বাচ্যের উপস্থিতি। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর লিখিয়াছেন, "হরি শব্দ উচ্চারণে হরিপুরুষ উদয়" অর্থাৎ হরি শব্দটি উচ্চারণমাত্রই হরি-শব্দবাচ্য যে পুরুষ তাঁহার উদয় হইবে।

'পরা' অবস্থায় বাচ্য-বাচকের ভাব থাকে না। 'পশ্যন্তী' অবস্থায় বাচ্য-বাচক দুটি ভাব থাকে। কিন্তু উভয়ের অভেদ সম্বন্ধেও থাকে। এই জন্য বাচকের উচ্চারণে বাচ্যের উদয় সম্ভব। ভর্তৃহরি পরাভূমির শব্দকে "অনাদি-নিধনং" বলিয়াছেন। কালিদাস পশ্যন্তী ভূমির বাক্‌কে "বাগর্থাবিব সংপৃক্তৌ" বলিয়াছেন। মধ্যমা ভূমিতে বাচ্য-বাচকের অভেদত্ব থাকিলেও একটি ভেদের আভাস প্রকট হয়। ইহা এক প্রকার ভেদাভেদ অবস্থা। বৈখরী ভূমিতে শব্দ হইতে অর্থের পৃথক্‌করণ সুসম্পন্ন হয়। জগতের অধিকাংশ লোক সাধারণতঃ এই বৈখরী ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত।

পতঞ্জলি বলিয়াছেন—- "তস্য বাচক প্রণবঃ।" প্রণব ব্রহ্মের বাচক। শুধু বাচক নহে বাচ্যও। উচ্চারণ পরাবাক্ ভূমিকায় হইলে প্রণব-উচ্চারণে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইবে।

প্রসঙ্গতঃ একটি কাহিনী—- প্রভুজগদ্বন্ধু ছিলেন ঢাকায় রামধন শাহ মহাশয়ের বাগান বাড়ীতে। একটা ব্যাধির ছলনা করিয়া তিনি ডাক্তার উষারঞ্জন মজুমদারকে ডাকিয়া পাঠান। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখেন, প্রভুর দেহে কোন মানুষের লক্ষণ নাই। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন নাই। কিন্তু বেশ কথা বলিতেছেন।

প্রভু বলিলেন, ডাক্তার বাবু, আপনি নিত্য প্রণব জপ করেন। তাঁর জপ্য মন্ত্র বলিয়া দেওয়ায় তিনি একটু চমৎকৃত হন। প্রভু বলিলেন, আপনার উচ্চারণ ঠিক হয় না।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, কৃপা করিয়া একটিবার উচ্চারণ করিয়া শিখাইয়া দেন।

প্রভু এক মিনিট নীরব থাকিয়া প্রণব উচ্চারণ করিলেন। কি যে মধুর নাদ উত্থিত হইল! সঙ্গে সঙ্গে গৃহ উজ্জ্বল হইল। সকলের মনে হইল ব্রহ্মজ্যোতিঃ ব্যক্ত হইল। প্রভুর উচ্চারণের পরও প্রায় আধ মিনিট ধ্বনিটি গৃহময় অনুরণিত হইতেছিল। এই পরাভূমির উচ্চারণে বাচ্য-বাচক অভিন্ন। প্রণব একটি জ্যোতিঃ, একটি শব্দ একটি চিন্ময় বস্তু। ইহা উপলব্ধির বিষয়।

এই বাচ্য-বাচকই পরিভাষায় নামী ও নাম। নাম ও নামী যে অভিন্ন তাহা শাস্ত্র বহু প্রকারে ব্যক্ত করিয়াছেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন, বহু নাম প্রকাশিত আছে তাহাতে সর্বশক্তি অর্পিত হইয়াছে। এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়াই বৈষ্ণবীয় নাম-সংকীর্তন ও নামজপ ভজন প্রচারিত। যজ্ঞের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ একথা শ্রীমুখে গীতায় বলিয়াছেন। 'জপাৎ সিদ্ধিঃ' এইকথা প্রাচীন আচার্যদের উক্তি।

ঋগ্বেদ-সংহিতার মন্ত্র প্রত্যেকটি শব্দই পরাবাক্। প্রত্যেকটি মন্ত্রই শব্দব্রহ্ম। এই জন্যই তপস্যা ছাড়া মন্ত্রের অর্থবোধ হয় না। আচার্য সায়ণ যে সংহিতার মন্ত্রের ভাষ্য করিয়াছেন তাহাতে মন্ত্রার্থ ব্যক্ত করেন নাই। কোন্ মন্ত্র কোন্ যজ্ঞে কিভাবে উচ্চারণ করিয়া বিনিয়োগ করিতে হইবে তাহাই তাঁহার প্রধান বক্তব্য মনে হয়। মন্ত্রগুলিকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য যজ্ঞাদির সঙ্গে তাহার যোগসাধন। অতগুলি মন্ত্র অক্ষুন্ন আছে এতকাল যজ্ঞাদির উপযোগিতায়। মূলমন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য আমরা আজ পর্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই।

"অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্।।" (ঋ. ১/১/১)

ঋগ্বেদ-সংহিতার এই প্রথম মন্ত্র। সায়ণাচার্য মন্ত্রের প্রয়োগ ও ছন্দ লইয়া অনেক কথা বলিয়াছেন। তারপর যাস্কের নিরুক্ত অবলম্বনে অগ্নি প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের অর্থনির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু মূল বেদেই যে অগ্নি শব্দের তাৎপর্য বলা আছে, সেই দিকে লক্ষ্য করেন নাই। ঋগ্বেদ ১৬৪ সূক্ত, ৪৬ মন্ত্রে—

"একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।"

ইনি এক সৎবস্তু হইলেও বিপ্রগণ ইহাকে অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা ইত্যাদি বহুপ্রকারে বর্ণনা করেন।

সুতরাং সেই একটি পরম সদ্‌বস্তুর আর একটি পৃথক্ অভিধা হইল অগ্নি। সেই অগ্নিকে পরমসদ্‌বস্তুকে স্তুতি করিতেছি। স্তুতি করার

কারণরূপে সেই বস্তুর কতিপয় বিশেষণ দিয়াছেন। প্রথম বিশেষণ 'পুরোহিতম্'— পুর বলিতে দুইটি পুর। একটি আমার ব্যষ্টি দেহপুর আর একটি সমষ্টি বিশ্বপুর। উভয় পুরীর মধ্যেই তিনি শয়ন করিয়া ভোগ করিয়া ইহার সর্বপ্রকার হিত বা কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। পুরীরূপ শয্যায় শয়ন করেন বলিয়া বেদে তাঁহার অপর নাম পুরুষ।

একখানি শয্যা, পালঙ্ক, তোশক, চাদর, লেপ, বালিশযুক্ত সাজানো গৃহ দেখিলে সহজেই বুঝা যায় যে, বস্তুগুলি স্বয়ং সম্পূর্ণ নহে— কেহ ইহার মধ্যে শয়নকারী ভোক্তা আছেন। সেইরূপ এই দেহের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার শ্বাসযন্ত্র পাকযন্ত্র চিন্তার কেন্দ্র স্নায়ু- পরিপাটি দেখিলে বুঝা যায় নিশ্চয় ইহার কেহ আস্বাদক ভোক্তা আছেন। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পুর, ইহাতে লক্ষ প্রকার দ্রব্যসম্ভার সাজানো আছে। আকাশ-বাতাস ফুল-ফল বৃক্ষ-লতা চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-তারকা এমন সুকৌশলে সুবিন্যস্ত যে, দেখিয়া একটু অনুধাবন করিলেই বোধগম্য হয় একজন পুরুষ আছেন যাঁহার ভোগের জন্য আস্বাদনের জন্যও অনুশীলনের জন্য এটি সাজানো আছে। তিনি শুধু ভোক্তা নহেন, সর্বপ্রকারে এই অনিত্য বস্তুসমূহের শৃঙ্খলা বিধানপূর্বক হিতসাধন করিয়া থাকেন। তাই তিনি পুরোহিত।

এই বিশ্বসংসার একটি মহাযজ্ঞ। তিনিই এই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা দেবতা, হোতা এবং ঋত্বিক্। এই যজ্ঞে তিনি আপনাকে আপনি আহুতি দিতেছেন সর্বদা সর্বতোভাবে। গীতা এই সন্ধান দিয়াছেন।

> "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
> ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম্ ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।।"

তিনি শুধু সদ্‌বস্তু নহেন, সংকল্পপূর্বক হবি অর্পণকারীও। সুতরাং চৈতন্যময় বস্তু। কেবল তাহাও নহে, তিনি শ্রেষ্ঠ রত্নের দাতা। যজ্ঞ হইতেই রত্ন উত্থিত হয়। রত্ন শব্দের অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু। সেই সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু তিনি যজ্ঞের ফলস্বরূপ লাভ করিয়া আমাদিগকে অর্পণ করেন। সেই সর্বোৎকৃষ্ট হইল আনন্দ। যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পরম আদরণীয় অনুসন্ধেয় আর কোন বস্তু নাই। তাই শ্রুতির বাক্য 'আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ'। সুতরাং অগ্নি পদে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম। তাঁহাকেই আমরা সমবেতভাবে স্তব করি। সর্বদা যাহা কিছু করি বা ভাবি— সবই এক কাজ— তাঁহার স্তব। বিশ্বজীব সেই বিশ্বের পুরুষকে নিয়ত নিরত আছে তাঁহার স্তবকীর্তনে।

ঋষি শ্রীঅরবিন্দ এই মন্ত্রের নিম্নলিখিত রূপ অনুবাদ করিয়াছেন—
"I adore the Flame, the vicar, the divine Ritwik of the Sacrifice, the summoner who most founds the ecstasy."

Vicar অর্থ প্রতিনিধি। Flame অর্থ যদি ধরি ব্রহ্মের জ্যোতিঃ তাহা হইলে শ্রীঅরবিন্দের মতে অর্থ হইবে ব্রহ্মজ্যোতিঃ আর ব্রহ্ম অভিন্ন। found অর্থ স্থাপন করা। তাহা হইলে শ্রীঅরবিন্দের মত অগ্নি শব্দে ব্রহ্মজ্যোতিঃ।

ম্যাক্‌ডোনেল প্রমুখ ইউরোপীয়দের অর্থ— I praise Agni the household priest the divine ministrant of the sacrifice hotṛ and the best bestower of wealth, তিনি গৃহপুরোহিত, যজ্ঞের সহায়তাকারী। রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত ঋগ্বেদের অনুবাদে "অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান। অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্ এবং প্রভূত রত্নধারী। আমি অগ্নির স্তুতি করি।"

এই সকল অর্থ বৈখরী ভূমির। শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যান পশ্যন্তী ভূমিকার। বেদকে পরাভূমি হইতে ঠিক হৃদয়ঙ্গম হইবে। পশ্যন্তী ও মধ্যমা ভূমি হইতেও কথঞ্চিৎ জানা যাইবে। বৈখরী ভূমি হইতে বেদের তাৎপর্য কিছুই অনুধাবন সম্ভব হইবে না।

আলোচ্য বিষয় ছিল ব্রহ্মবস্তু শব্দবাচ্য কিনা। প্রমাণ করা হইয়াছে— ব্রহ্মবস্তু প্রাকৃত শব্দের বাচ্য নহেন। অপ্রাকৃত শব্দ দ্বারা কথঞ্চিৎ প্রকাশযোগ্য। অলৌকিক নাম ও নামী অভিন্ন। নামীর অনেক শক্তি নামেতে নিহিত আছে।

আর একটি বিবেচনীয় বিষয় হইতেছে— জগতের মূল কারণ জড়া অচেতনা প্রকৃতি, না চৈতন্যময় ব্রহ্ম। বর্তমান বিজ্ঞান (Science) বহুদিন যাবৎ বলিয়া আসিতেছে, জড়া প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্টি। কয়েক বৎসর যাবৎ বৈজ্ঞানিকদের গবেষণাতেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, জড়া প্রকৃতি মূলতঃ শক্তির সমষ্টি। Matter আর Energy বস্তুতঃ একই বস্তু। তথাপি সেই শক্তি যে চৈতন্যময়ী ঠিক এই কথা বিজ্ঞান বলিতে পারিতেছে না। বলি-বলি করিতেছে। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ ইলেকট্রনেও একটু চেতনা আছে এইরূপ তাহাদের মনে উঁকিঝুঁকি দিতেছে। সুতরাং বিশ্বের মূল কারণ কি কোন অচৈতন্য বস্তু না চৈতন্যময় বস্তু— তাহা এখন পর্যন্ত নির্ধারিত হয় নাই। অতএব আলোচনার বিষয়টি কেবল অতীত যুগের নহে, আজিকার দিনেরও।

বেদান্তসূত্রকার বিশ্বাস করেন যে, এই নিখিল বিশ্বের মূলীভূত যে কারণ— যাহা সর্বকারণের কারণ— তাহা শুধু তলস্থ (underlying reality) নহে, সর্বতঃ অনুস্যূত সত্তা (all pervading)।

কতিপয় সূত্র দ্বারা বেদান্ত তাঁহার সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন। ১/১/৫ সূত্র হইতে ১/১/১১ সূত্র পর্যন্ত একটি অধিকরণ ভরিয়া ঐ কথাই গবেষণা করিয়াছেন। প্রথম বলিয়াছেন— শ্রুতি বলিয়াছেন যে, সেই মূল সদ্বস্তু ঈক্ষণকর্তা। তিনি বহু হইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। এই কর্তৃত্ব জড়া প্রকৃতির নাই। দ্বিতীয় কথা বলিয়াছেন যে, ঐ ঈক্ষণ গৌণার্থে নহে কারণ, আত্মা শব্দের প্রয়োগ আছে। দ্বিতীয় উত্তর দিয়াছেন যে, এই জগতের জীব দুঃখী। বদ্ধ বলিয়াই তার দুঃখ। দুঃখ দূর করিয়া মুক্ত হইবার প্রচেষ্টা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সকলের মধ্যেই আছে। শ্রুতি এই মুক্তি বা মোক্ষলাভের একটি প্রধান উপায় বলিয়াছেন এই যে, যিনি ঐ সদ্বস্তু-নিষ্ঠ তাহারই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। বদ্ধজীব ও মুক্তজীব উভয়েই সদ্বস্তু অর্থাৎ তাহাদের সত্তা আছে ; তাহা হইলে বদ্ধব্যক্তি বদ্ধ কেন ? কারণ, তাহার আনন্দাংশ আবৃত। মুক্ত জীব মুক্ত কেন ? কারণ, তাহাতে আনন্দাংশ প্রকাশমান। যাহাতে নিষ্ঠাবান্ হইলে বদ্ধজীবেরও আনন্দাংশ সুব্যক্ত হইয়া পড়ে সেই মূলীভূত পরম সদ্বস্তু নিশ্চয়ই আনন্দময়। জড়বস্তুর আনন্দময়তা হইতে পারে না। ইহা হইতে বুঝা গেল যে, পরম সদ্বস্তু আনন্দময়। সুতরাং পরম চৈতন্যময়। অতএব উহা জড়প্রকৃতি নহে। তৃতীয় উত্তর দিয়াছেন পরবর্তী সূত্রে —

সূত্র— **হেয়ত্বাবচনাচ্চ** ॥ ১/১/৮

শ্রুতি বলিয়াছেন, যদি অমৃতত্ব লাভ করিতে চাও তদ্ভিন্ন অন্য কথা ত্যাগ কর। (অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্য এষ সেতুঃ) অমৃতত্ব লাভের জন্য সকল হেয়-বস্তুকে পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন কিন্তু সেই পরম সদ্বস্তু ব্রহ্ম সম্বন্ধে হেয়ত্বজ্ঞাপক কোন কথা কোথাও নাই। যাবতীয় জড়বস্তুর সম্বন্ধীয় যাবতীয় কথাই নশ্বর পরিবর্তনশীল। তাই সকল নশ্বর প্রাকৃত কথা ত্যাগ করিতেই শ্রুতির নির্দেশ। একমাত্র ব্রহ্মবিষয়ক কথাই জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছেন। (তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব) সেই পরমবস্তু যদি জড়দ্রব্য হইত তাহা হইলে তাহার কথাও হেয় হইত, এত উপাদেয় হইত না। হেয়তাজ্ঞাপক কোন প্রকার বাক্য না থাকার জন্য বুঝিতে হইবে ব্রহ্মবস্তু আনন্দময় সুতরাং চৈতন্যময়। (পরবর্তী

অধিকরণে তিনি যে আনন্দময় তাহা স্থাপন করিবেন।)

চতুর্থ উত্তর দিয়াছেন পরবর্তী ১/১/৯ সূত্রে—

সূত্র— **প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ ॥ ১/১/৯**

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে পিতা উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুর নিকট প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিয়াছেন—

"সদেব সোম্য! ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

"একমেবাদ্বিতীয়ম্" সেই সদ্বস্তু। তাঁহার স্বরূপের কথা বলিয়াছেন—

"যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতং অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং" ইত্যাদি।

"যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্।" (৬/১/৩-৪)

যদি জড়বস্তু বিশ্বের কারণ হয় তাহা হইলে শ্রুতির এই প্রতিজ্ঞাবাক্য অসত্য হইয়া যায়। জড়বস্তুকে জানিলে অজ্ঞাত বস্তু (যেমন চৈতন্যময় বস্তু) জানা যায় না। আনন্দময় বস্তুকে জানিলে সদ্বস্তু, চিদ্বস্তু, আনন্দময় বস্তু সবই জানা হয়।

পঞ্চম উত্তর দিয়াছেন পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— **স্বাপ্যয়াৎ ॥ ১/১/১০**

ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার উপায় হইতেছে অপরোক্ষানুভূতি। ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা জানি তাহা পরোক্ষ কারণ, মধ্যে ইন্দ্রিয়ের ব্যবধান আছে। মনের দ্বারা চিন্তা-ভাবনা যুক্তি-তর্ক দ্বারা যাহা জানি তাহাও পরোক্ষ কারণ, মধ্যে মন রহিয়াছে। বস্তুর সঙ্গে এক হইয়া যে জানা তাহা অপরোক্ষ। সেই জানা শুধু সুষুপ্তিতে হয় কারণ, তখন দেহ ও মন কোন কাজ করে না। যখন স্বপ্ন দেখি তখনও মন কাজ করে। যখন সুষুপ্তি অর্থাৎ Dreamless sleep হয় তখন আত্মা নিজেতে থাকে। তখন পরমাত্মার সহিত কিঞ্চিৎ স্পর্শ হয়। তৎপরবর্তী অবস্থা চতুর্থ বা তুরীয়। তখন পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মা একীভূত হয়। উহা সমাধিতে হয়। এখানে সমাধির বিষয় আলোচনীয় নয়— শুধু সুষুপ্তির কথা।

'স্বাপ্যয়াৎ' সূত্র জানাইতেছে যে, সুষুপ্তিতে স্বাপ্যয় হয়। স্বাপ্যয় অর্থ স্বস্মিন্ লয়। আত্মাতে আত্মা থাকে। আত্মা তখন পরমাত্মাতে লীন থাকে। আত্মা চেতনবস্তু, পরমাত্মা বা পরব্রহ্মও নিশ্চয় চেতনবস্তু। কারণ, কোন জড়বস্তুতে আত্মা বা চৈতন্য লীন হইতে পারে না।

যে যাহাতে লীন হইবে সে তজ্জাতীয় বস্তু হইতে হইবে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরমাত্মা বা পরম সদ্বস্তু নিশ্চয়ই চৈতন্যময়। উহা কখনও জড়বস্তু নহে কারণ, পরমবস্তু জড় হইলে চৈতন্যময় আত্মা তাহাতে লীন হইতে পারিত না।

ইহা দ্বারা পরম সদ্বস্তুর চৈতন্যময়ত্ব স্থাপিত হইল। এই সুষুপ্তির প্রসঙ্গ বেদান্তে বিশেষতঃ অদ্বৈত-বেদান্তে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬/৮/১) স্পষ্ট ভাবেই আছে—

"যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে স্বং হ্যপীতো ভবতি।।"

ছান্দোগ্যের এই মন্ত্রে আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মতত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। সুষুপ্তির বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন মাণ্ডূক্যোপনিষদ্— তাহার গভীর গবেষণা করিয়াছেন শঙ্কর মাণ্ডূক্য-কারিকার ভাষ্যে। সুষুপ্তি অবস্থায় একটা সুখের অনুভূতি হয় উহা ব্রহ্মসান্নিধ্যবশতঃই। মানুষ বলে— 'সুখম্ অহম্ অস্বাপ্সম্ ন কিঞ্চিদবেদিষম্'। পরম সুখে পরম আনন্দে ছিলাম— সুষুপ্তি কালে কিছুই জানিতে পারি নাই। ঐ সময় জ্ঞাতা জ্ঞেয় এক হইয়া যায়। অব্যবহিত বা অপরোক্ষ অনুভূতি হয়। সেই সময়ের পরম সুখাবস্থা অনুভূতির ফল, অনুমিতি নহে। অনুমিতি বা Syllogism হইলে একটা Middle Term লাগে, একটা ব্যাপ্তিযুক্ত সদ্ধেতু লাগে। এখানে কোন Middle Term পাওয়া যায় না। ইহা বৈদান্তিকেরা বিশেষভাবে গবেষণা করিয়াই দেখিয়াছেন।

সাধারণতঃ উত্তম স্বাস্থ্যবান্ পুরুষ ছাড়া সুষুপ্তি হয় না। জাগ্রত হইবার পর সুষুপ্তির অনুভব অস্পষ্টই থাকে। আমাদের সুষুপ্তি আসে দেহের ক্লান্তিবশতঃ। ঐ অবস্থায় যোগীরা পৌঁছেন প্রচেষ্টা দ্বারা। ঐ সমাধি সময়ের অবস্থা বলিব।

নিবিড় আলোচনা অদ্বৈতবাদীরা বিশেষভাবে করিয়াছেন। সমাধিতে ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় ইহা সকল সন্ন্যাসী বৈদান্তিকদের বিশ্বাস। বৈষ্ণব-বেদান্ত ইহা স্বীকার করে না। তাঁহারা বলেন, অন্তর্নিহিত সুগুপ্ত স্বরূপ কিছুতেই সমাধি দ্বারা লাভ হয় না। সমাধিতে কেবল আত্মা থাকে— থাকুক কিন্তু একাকীত্বে (বা কৈবল্যে) স্বরূপের অনুভূতি হইতে পারে না। একটি নারীর মধ্যে পত্নীত্ব গুপ্ত (potential) আছে। সে একাকী লক্ষ চেষ্টা দ্বারাও তাহার অনুভূতি লাভ করিতে পারিবে না। পতির সঙ্গে পরমপ্রীতিতে একতাপন্ন হইলেই পত্নীত্বের অনুভূতি

হইতে পারে, অন্য কোন উপায় নাই।

এই পরম প্রীতিতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একত্বানুভূতি হয় বৈষ্ণব সাধকের পরম প্রেমময় ভূমিতে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিবিড় প্রেমানুভূতি ছাড়া আত্মোপলব্ধি সম্ভব নহে। তথাপি সুষুপ্তির প্রসঙ্গ পাইয়া বলা হইল। এই 'স্বাপ্যয়াৎ' সূত্রের তাৎপর্য এই যে, সৃষ্টির মূল কারণ জড়-প্রধান নহে, চৈতন্যময় পরমাত্মা পরব্রহ্ম। ইহা সুষুপ্তির অনুভবেও বুঝা গেল।

পরবর্তী দুইটি সূত্রে—

সূত্র— **গতিসামান্যাৎ** ।। ১/১/১১

সূত্র— **শ্রুতত্বাচ্চ** ।। ১/১/১২

স্পষ্ট উত্তর দিয়াছেন বেদশাস্ত্রের প্রামাণ্য আরোপ করিয়া। কঠোপনিষদে (১/২/১৫) স্পষ্টই আছে—

"সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যঞ্চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি-ওমিত্যেতৎ ।।"

সমস্ত বেদশাস্ত্র যাহা নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করেন, যাবতীয় জপ-তপ ভজন-সাধন উপাসনা যে বস্তুর অনুসন্ধান করে, যাঁহাকে পাইবার জন্য সুকঠোর ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করা হয়, সেই বস্তুর স্বরূপ অতি সংক্ষেপে বলি— তাহা "ওঁ" এই মাত্র। আর শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (১/৩) মন্ত্রে কহিয়াছেন যে—

"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।"

ধ্যানযোগে ঋষিগণ ইহাই দর্শন করিয়াছেন যে, প্রকৃতি যে কর্মপরায়ণা তাহার কারণ হইতেছে ব্রহ্মের নিত্যশক্তি তাহাতে গূঢ়ভাবে নিবিষ্ট আছে। বস্তুতঃ প্রকৃতি কোন কার্য করে না। সে যাহা করে বলিয়া মনে হয় তাহা তাহাতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত ব্রহ্মেরই শক্তিতে। সুতরাং সৃষ্টির মূল কারণ চৈতন্যময় ব্রহ্ম শক্তি

একখণ্ড লৌহদণ্ডে হস্তস্পর্শ করিলে যদি হস্ত দগ্ধ হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ লৌহখণ্ড কিছু সময় অগ্নির মধ্যে ছিল এবং অগ্নি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দহন কার্য করিয়াছে ; নতুবা লৌহখণ্ড কদাপি দগ্ধ করিতে পারে না। এই কথাটি মহাপ্রভু বলিয়াছেন

"অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয় জারণ।"

যদি কখনও মনে হয় প্রকৃতিই জগৎস্রষ্টা, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে প্রকৃতির মধ্যে পরম চৈতন্যশক্তি প্রবিষ্ট হইয়া সৃষ্টি করাইয়াছে।

৬। আনন্দময়াধিকরণ —

ঈক্ষত্যধিকরণে (৫-১২) সূত্র স্থাপন করা হইয়াছে যে জগৎকারণ ব্রহ্মবস্তু জড় নহে। তিনি চৈতন্যময় চিৎস্বরূপ। তিনি যে 'সৎ'স্বরূপ তাহা শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন— "সদেব সোম্য! ইদমগ্র আসীৎ" এই মন্ত্রে ঈক্ষত্যধিকরণে স্থাপিত হইল তিনি চিৎস্বরূপ, এখন তিনি যে আনন্দস্বরূপ তাহা স্থাপনীয় ১/১/১৩ সূত্রে তাহা বলিতেছেন—
সূত্র— আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ।। ১/১/১৩

ব্রহ্ম আনন্দময়। তিনি যে আনন্দময় তাহা আপনি জানিলেন কিরূপে? উত্তর দিয়াছেন— 'অভ্যাসাৎ'। অভ্যাস শব্দের অর্থ একই কথার পুনঃপুনঃ উল্লেখ। কোন কথা পুনঃপুনঃ কহিলে পুনরাবৃত্তি দোষ হয়। কিন্তু দোষ হইবে না— যদি বারংবার একটি কথা বলা হয় তবে সেই অভ্যাস দ্বারা বুঝিতে হইবে উহা বক্তার হার্দ। হার্দ অর্থ হৃদয়ের কথা। অন্তরের অনুভবের কথা। তৈত্তিরীয়-শ্রুতিতে ব্রহ্মবল্লীতে বলিযাছেন, "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন।" (২/৪) একই শ্রুতি ভৃগুবল্লীতে (৩/৬) উক্তি করিযাছেন—

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।"

শ্রীমদ্ভাগবত (৭/৬/২৩) বলিয়াছেন— "কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ।" এই শ্রীগ্রন্থ ২/১/৩৯ শ্লোকে বলিয়াছেন, "তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত।" ১১/৯/১৮ শ্লোকে বলিয়াছেন, "কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ"। বেদান্তের ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রুতিমন্ত্র দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, বহুবার তিনি যে আনন্দস্বরূপ তাহা বলা হইয়াছে। এই হইল অভ্যাস। 'আনন্দময়' শব্দের ময়ট্ প্রত্যয় লইয়া প্রশ্ন হইতে পারে। মৃন্ময় অর্থ মাটির বিকার। স্বর্ণময় অর্থ সোনার বিকার। সেইরূপ আনন্দময়ও কি আনন্দেব বিকার? তাহা হইলে ব্রহ্ম বিকারী হন। ইহার উত্তর পরবর্তী সূত্রে দিয়াছেন।
সূত্র— বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্যাৎ।। ১/১/১৪

সূত্রে ময়ট প্রত্যয় কেবল বিকারার্থেই হয় না, প্রাচুর্যার্থেও হয়।

আনন্দ অর্থ আনন্দপ্রচুর। অফুরন্ত অনন্ত আনন্দঘনস্বরূপ তিনি। তিনি কেবল আনন্দস্বরূপ নহেন— তিনি আনন্দের হেতু বা উৎস (Source)। পরবর্তী সূত্রে তাহাই বলিয়াছেন।

সূত্র— তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ॥ ১/১/১৫

তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিয়াছেন, 'এষ হ্যেবানন্দয়াতি' (২/৭/১) তিনি অপরকে আনন্দপূর্ণ করেন। তিনি যে অনন্ত আনন্দস্বরূপ তাহা শ্রুতিমন্ত্র সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন। সেই মর্মে সূত্র—

সূত্র— মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে॥ ১/১/১৬

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলিয়াছেন— 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।' এইভাবে সূত্রকার অন্বয়মুখে আনন্দস্বরূপতা স্থাপন করিয়া ব্যতিরেকমুখে বলিতেছেন পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— নেতরোঽনুপপত্তেঃ॥ ১/১/১৭

ব্রহ্মবস্তু ভিন্ন আর কেহই আনন্দময় বা আনন্দদাতা হইতে পারেন না। কারণ বলিয়াছেন— অনুপপত্তেঃ, অসংগতির কারণে, Because of absurdity অথবা unreasonableness। প্রকৃতি আনন্দময় হইতে পারে না কারণ, প্রকৃতি অচেতনা। যাহার চেতনাই নাই সে আনন্দময় হইবে কিরূপে? তবে জীবাত্মা কি হইতে পারে আনন্দময়? পারে না কারণ, শ্রুতি বলিয়াছে, "আনন্দাদ্ধ্যেব ভূতানি জায়ন্তে", আনন্দ হইতেই জগতের সৃষ্টি— কিভাবে সৃষ্টি করিলেন তাহাও বলিয়াছেন— "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়"। তারপর সৃষ্ট করিয়া সৃষ্টি জগতের মধ্যে প্রবেশ করিলেন— "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" (তৈত্তিরীয় ২/৬/২) এই সৃষ্ট জগতের মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করা— ইহা সম্ভব নহে জীবাত্মার পক্ষে। সুতরাং আনন্দময় বলিতে প্রকৃতি বা জীব কোনটিই যুক্তিযুক্ত নহে।

জীব যে আনন্দস্বরূপ হইতে পারে না সে সম্বন্ধে আর একটি যুক্তি দিয়াছেন পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— ভেদব্যপদেশাচ্চ॥ ১/১/১৮

দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন বেদশাস্ত্র। "রসো বৈ সঃ। রস হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" (তৈত্তিরীয়, ২/৭/২) ব্রহ্ম রসস্বরূপ। তিনি দাতা। জীব রসহীন, আনন্দহীন। জীব আনন্দময় রসস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দী হইয়া থাকে। আনন্দ শব্দের উত্তর যে 'চ্চি' প্রত্যয়— তাহা অভূততদ্ভাবে। জীব আনন্দশূন্য, ব্রহ্মকে

লাভ করিয়া আনন্দী হয়। জীবে আনন্দ ছিল না, ব্রহ্ম-সংস্পর্শে আনন্দী হইল।

সুতরাং ব্রহ্মই আনন্দদাতা আর সকলেই গ্রহীতা। এই দাতা-গ্রহীতার ভেদ শ্রুতি সুন্দরভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম ছাড়া আর কেহ আনন্দস্বরূপ হইতে পারে না। পরবর্তী সূত্রে আনন্দময় যে ব্রহ্মবস্তুই, অন্য কেহ জড়া প্রকৃতি বা জীব আনন্দময় নহে। সেই পক্ষে আর একটি যুক্তি দিতেছেন পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— **কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা**॥ ১/১/১৯

ব্রহ্ম এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন তাঁহার কামনা দ্বারা, "সোঽকাময়ত বহু স্যাম্" (তৈত্তিরীয়, ২/৬)। তিনি কামনা করিলেন, তখনই সৃষ্টি হইল। জীব যদি কোন কামনা করে তখনই কার্য হয় না। কুম্ভকার ঘট করিতে কামনা করিলেই ঘট হয় না। উপাদান মৃত্তিকা জোগাড় করিয়া চক্র-দণ্ডাদির কতকগুলি কার্য করিতে হয় তবে ঘট সম্পন্ন হয়। কিন্তু ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন তখনই সৃষ্টি হইল। তিনি ঈশানশীল পুরুষ, ইচ্ছামাত্রেই ঈপ্সিত সিদ্ধি হয়। তাই তিনি ঈশ্বর। অতএব ব্রহ্মই আনন্দময়, জীব বা প্রকৃতি নহে। আনন্দময় ব্রহ্মই জগৎস্রষ্টা, আর কোন আনুসঙ্গিক বস্তুর অপেক্ষা নাই।

পরবর্তী সূত্রে বলিয়াছেন— শ্রুতি উপদেশ দিয়াছেন যে, আনন্দময় ব্রহ্মের সহিত জীবের যোগ হইলেই জীব আনন্দময় হয়।

সূত্র— **অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি**॥ ১/১/২০

বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন— "এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।" (৪/৩/৩২) অর্থাৎ সেই আনন্দস্বরূপের আনন্দের এক কণা পাইয়া অন্য সকলে আনন্দ লাভ করে।

ব্রহ্মবস্তু যে 'সৎ' তাহা শ্রুতির স্পষ্টোক্তি— "সদেব সোম ইদমগ্র আসীৎ"। ব্রহ্মবস্তু যে 'চিৎ' তাহা 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' অধিকরণে সম্যগ্‌ভাবে স্থাপিত হইয়াছে। এখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁহার আনন্দস্বরূপতা স্থাপন প্রয়োজন। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মন্ত্র—

"অগ্নিঃ পূর্বেভির্ঋষিভিরিড্যো নূতনৈরুত।
স দেবাঁ এহ বক্ষতি॥" ১/১/২

অগ্নি পদে ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে পূর্বের ঋষিরা স্তুতি করিয়াছেন, আমরা যাঁহারা নূতন তাঁহারাও স্তব করি। পূর্ববর্তীরা তাঁহাকে সদ্‌রূপে স্তব করিয়াছেন, আমরা চিদ্‌রূপে করিয়াছি। পুরের যিনি হিতকারী তিনি চিৎস্বরূপ।

তিনি দেবান্ দেবগণকে এই এইস্থানে লইয়া আসেন।

শ্রীঅরবিন্দ দেবান্ শব্দের অর্থ করিয়াছেন, Those who play in Light। ক্রিয়া আর ক্রীড়া দুইটিই কাজ, তথাপি প্রভেদ আছে। work and play। ক্রিয়া work, আর ক্রীড়া play, ক্রিয়া প্রয়োজনের কাজ, ক্রীড়া আনন্দের অভিব্যক্তি। শ্রীকৃষ্ণের লীলাকে ভাগবতশাস্ত্র ক্রীড়া বলিয়াছেন। "ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।" শ্রীঅরবিন্দের play in Light অর্থ যাঁহারা আনন্দে ক্রীড়া করেন। তাঁহারা দেবতা। সেই দেবতাগণকে ব্রহ্ম বর্তমানের মধ্যে 'বক্ষতি'— লইয়া আসেন। লইয়া আসা ক্রীড়াটিকে শ্রীঅরবিন্দ তিন প্রকারে ব্যাখ্যান করিয়াছেন, who habitually bears. Who entirely bears or who wills or intends to bear। অর্থাৎ লীলাময় ব্রহ্ম তাঁহার আনন্দের সঙ্গী, লীলাপরায়ণ সঙ্গীগণকে আমাদের মধ্যে লইয়া আসেন আনন্দের খেলা খেলিতে। বেদান্তসূত্র বলিয়াছেন, "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"। মানুষের মধ্যে আসিয়া মানুষের মত লীলাখেলা করেন। এই লীলাকারী আনন্দময়। তিনি সৎ ও চিৎ— পূর্ববর্তিগণ ও আমরা নূতনেরা এই কথা বলিয়াছি। এই দুইটি কথা হইতেই জানা গেল তিনি আনন্দ। কারণ, সৎ ও চিৎ-এর মিলনভূমিই আনন্দ।

কথাটিকে প্রথমে লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে হইবে। একখানি থালাতে একটি রসগোল্লা আছে। আমার চক্ষের সম্মুখে আছে। ঐ রসগোল্লাটি আমার মনের মধ্যেও আছে। থালায় আছে সৎ-রূপে, আমার মনে আছে চিৎ-রূপে। চিৎ-রূপে যে আছে তাহা আমার রসনা সাক্ষ্য দিতেছে। এক বন্ধু আসিয়া রসগোল্লাটি থালা হইতে তুলিয়া আমার মুখে পুরিয়া দিল। মনঃপ্রাণ তখন আনন্দে ভরিয়া গেল। সৎ ও চিৎ মিলনই আনন্দ।

আমরা যে সাধারণ মানুষ আমাদেরও আনন্দ হয় তখনই যখন আমি আমাকে অর্থাৎ নিজেকে জানি। একটা গান শুনিয়া একটি চিত্র দেখিয়া আমরা যখন আনন্দ পাই তখন কি হয়— ঐ গান বা চিত্রের কোন ভাব বা তথ্য বা তত্ত্ব আমার ভিতরের কোন আবৃত অংশ ব্যক্ত করিয়া দেয়। কোন ভাব আমার গুপ্তভাবে ছিল— ঐ সঙ্গীত বা চিত্র কোন অভিনব কৌশলে চিত্তের গোপনীয় সব আবরণ সরাইয়া দিল— আমি আমাকেই খানিকটা দেখিলাম তাই আনন্দ পাইলাম। আমরা ইংরাজীতে বলি I enjoyed myself—আমি আমাকেই আস্বাদন করি। আমার নিজ সত্তার কিয়দংশ দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করি।

যখন আমি আমার সত্তাকে পরিপূর্ণ রূপে জানি তখন আনন্দে ভরপুর হইয়া যাই। গ্রীক দার্শনিকেরা বলিতেন— 'Know thyself,' ঋষিরা বলেন 'আত্মানং বিদ্ধি'। আমি যখন জানি আমি ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের অংশ বা কৃষ্ণদাস— যখন পূর্ণভাবে জানি, সুগভীরভাবে জানি আর সৎ সত্তার সঙ্গে চিৎ সত্তা একাকার হইয়া যায়— তখন আমি পূর্ণ আনন্দস্বরূপে বিরাজমান থাকি। সুতরাং সৎ ও চিৎ-এর মিলনভূমিই আনন্দ।

ব্রহ্ম আনন্দঘন কেন ? কারণ তিনি আপনার সমগ্র অনন্ত সত্তাকে পূর্ণভাবে জানেন। ভাগবত বলিয়াছেন, তিনি 'অর্থেষু অভিজ্ঞঃ' অর্থাৎ যাবতীয় বস্তু জাতি তত্ত্বসমূহ— 'অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্', যাহা কিছু সৎরূপে তাহাতে বিরাজিত তাহার সমগ্রভাবের অভিজ্ঞতা তাঁহার আছে। তিনি আপনাকে আপনি পূর্ণভাবে জানেন বলিয়াই তিনি আনন্দঘন। এই আনন্দঘনতা তাঁহার গভীরতম ভাবে আস্বাদিত হয় যখন তিনি লীলার সঙ্গিগণকে লইয়া এই মর্ত্যে অবতরণ করেন। এই পরমতত্ত্ব বেদমন্ত্র বলিয়াছেন। বেদান্ত-সূত্রও বলিয়াছেন।

৭। অন্তরাধিকরণ —

সূত্র— অন্তস্তদ্ধর্মোপদেশাৎ॥ ১/১/২১

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম জগতের কারণ ইহা স্থাপিত হইয়াছে। তিনি সৃষ্টি করেন, সৃষ্টির পালন করেন, পরিচালনা করেন। কোথায় অবস্থান করিয়া এইসব কার্য করেন ? উত্তরে বলিতেছেন— অন্তঃ, অন্তরাত্মারূপে গভীর ভাবে অন্তরে বিরাজমান রহিয়া। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম অন্তরের পরমবস্তু Indwelling Spirit।

এই কথাটি শ্রুতির দৃষ্টি দ্বারা আর একটু বিশদ করা যাইতেছে। তুমি একটি ফুল দেখিতেছ ইহার মধ্যে তিনটি সামগ্রীর প্রয়োজন হইতেছে। সূর্যের আলো, তোমার চক্ষু ও ফুলের রূপ। আলোর উৎস সূর্য— তিনি অধিদেবতা, তোমার চক্ষু আছে তোমার চৈতন্যময় সত্তাযুক্ত দেহেতে, ইহা অধ্যাত্ম। আর ফুলের রূপটির মূল পঞ্চভূত—ইহা পারিভাষিক নাম অধিভূত। অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিভূত এই তিনের মিলন না হইলে তোমার ফুল দর্শন ক্রিয়াই নিষ্পন্ন হয় না। সূর্যমণ্ডলের মধ্যে যিনি, তোমার চক্ষুর মধ্যেও তিনি পঞ্চভূতের মধ্যেও তিনি। এই তিনস্থানেই তিনি আছেন অন্তরতমরূপে। রূপ

সম্বন্ধে যাহা বলা হইল স্পর্শ শব্দ রস গন্ধ— প্রত্যেকের সম্বন্ধেই এক কথা ? ত্বক্, শ্রোত্র, জিহ্বা, নাসিকা ইহারা অধ্যাত্ম। স্পর্শ-শব্দাদি অধিভূত; বায়ু আকাশ প্রচেতা অশ্বিনীকুমার হইতেছেন অধিদেব। অন্তরতম রূপে থাকিয়া এই তিন দিক্ হইতে পরমাত্মা নিজেকে নিজে উপভোগ করিতেছেন। শ্রুতি এইরূপেই উপদেশ করিয়াছেন—উপদেশাৎ। যদি প্রশ্ন করেন, আমার চেতনা, ফুলের রূপ ও সূর্যের আলো— তিন থাকিলেই দর্শন-কার্য নির্বাহ হইতে পারে। এই তিনের মূলে আর এক পরমাত্মা স্বীকারের প্রয়োজন কি ? উত্তর দিতেছেন পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥ ১/১/২২

শ্রুতিতে ভেদের উল্লেখ হেতু। শ্রুতি জানাইয়াছেন, পরমাত্মা সূর্যে অবস্থিত থাকিয়াও সূর্য হইতে পৃথক্। তাঁহাকে সূর্য জানে না। সূর্য তাঁহার শরীর। তিনি অন্তরে থাকিয়া সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি চক্ষুতে অবস্থিত থাকিয়াও চক্ষু হইতে পৃথক্। চক্ষু তাঁহাকে চিনে না। চক্ষু তাঁহার শরীর। তিনি চক্ষুর অন্তরে থাকিয়া চক্ষুকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা। মনে অবস্থিত থাকিয়াও মন হইতে পৃথক্। মন তাঁহাকে জানে না। মন তাঁহার শরীর। তিনি অন্তরে থাকিয়া মনকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি অন্তরে থাকেন, অন্তর্যামী। তিনি অমৃত: 'আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ' (বৃহদারণ্যক, ৩/৭/১০)।

সূর্যে আছে আলো, বস্তুতে আছে রূপ, চক্ষুতে আছে মণি (retina)। এই তিনের মিলন কিভাবে হয়, কিভাবে তাহা মন-বুদ্ধির গোচর হয়, কিভাবে দর্শন ব্যাপারটি নিষ্পন্ন হয়, এই রহস্যের বিশ্লেষণ করিতে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান তিন শতাব্দী হয়রান হইয়াছে কিন্তু একটিও তৃপ্তিজনক সমাধান মিলে নাই। বেদান্তের চিরপুরাতন চিরন্তন যে সমাধান তাহা বলা হইল। ঋষিকবির গানেও ব্যক্ত হইয়াছে—

"হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান ?
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান ॥"

পরবর্তী ৮ ও ৯ দুইটি অধিকরণে—

৮। আকাশাধিকরণ —

সূত্র— আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ১/১/২৩

৯। প্রাণাধিকরণ —

সূত্র— অতএব প্রাণঃ ॥ ১/১/২৪

দুইটি সূত্রে বলা হইয়াছে শ্রুতি যেখানেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ-রূপে আকাশ ও প্রাণ শক্তির উল্লেখ করিয়াছে তাহা পরব্রহ্মকেই বুঝাইয়াছে। শ্রুতি-মতে আকাশ (ইথার), প্রাণ (elan vital) জড় সবই জড়বস্তু। উহাদের পরিচালনার জন্য অন্তরে অন্তর্যামী সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম। শ্রীমদ্ভাগবত বেশ একটু রসাল করিয়া বলিয়াছেন—

"ওজঃসহোবলযুতং মুখ্যতত্ত্বং গদাং দধৎ।" (ভা. ১২/১১/১৪) ইন্দ্রিয়শক্তি, মনের শক্তি, মুখ্য প্রাণ ইহারা তত্ত্বরূপে 'গদা'। গদা ধরিয়া পরমাত্মা কার্য করেন। ভগবানের রূপ ও আয়ু তাঁহার সহিত অভিন্ন বলিয়া মুখ্যপ্রাণ গদারূপে ব্রহ্মের স্বরূপাত্মক।

১০. জ্যোতিরধিকরণ —

সূত্র— জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥ ১/১/২৫

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ৩/১৩/৭ মন্ত্রে আম্নাত হইয়াছে যে, পুরুষের অন্তরে যে জ্যোতিঃ সেই জ্যোতিঃ-ই বিশ্বের উপর, দ্যুলোকের উপর উত্তম অধম সমুদয় লোকের উপর প্রকাশ পাইতেছে। এই জ্যোতিঃ কি আদিত্যের না উহা স্বরূপতঃ পরমাত্মাই এইরূপ সংশয়ে, সূত্রে উত্তর দিতেছেন, "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ" জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ পরব্রহ্মই কারণ, 'চরণাভিধানাৎ'। ছান্দোগ্যে উক্ত আছে—"পাদোঽস্য সর্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" একপাদে সমুদয় সৃষ্টি আর তিনপাদ অমৃতলোকে। একপাদ Immanent, আর তিন পাদ Transcendent, বিশ্বগ আর বিশ্বাতীগ।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মস্তুতিতে (১০/১৪/২৩) মন্ত্র বলিতেছেন—

"একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।" সন্দেহ জাগিতে পারে, গায়ত্রী একটি ছন্দের নাম, একটি মন্ত্রের নাম (ঐ ছন্দে লিখিত)। 'চরণাভিধানাৎ' যে বলা হইল ইহা কি ছন্দের পাদ না কি পরম ব্রহ্মের ? পরবর্তী সূত্রে উত্তর দিয়াছেন—

সূত্র— ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন, তথা চেতোঽর্পণনিগদাৎ, তথাহি

দর্শনম্। ১/১/২৬

গায়ত্রীমন্ত্রের লক্ষ্য ব্রহ্মবস্তু। এখানে ছন্দ বলিতে গায়ত্রী ছন্দ নহে, যেহেতু আত্মসমর্পণের কথা আছে। ছন্দকে কেহ আত্মসমর্পণ করে না। ছন্দের প্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করা যায়। গায়ত্রী মন্ত্রের যে অর্থ তাহা ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

গায়ত্রীর ধ্যেয় ভর্গঃ। ভর্গঃ পদে পরব্রহ্মই লক্ষ্য। গায়ত্রী পরব্রহ্মের ছন্দোময় রূপ। গায়ত্রীকে বেদমাতা বলা হয়। বেদ হইল ব্রহ্মের শব্দস্তরে অভিব্যক্তি। ভাগবত বলিয়াছেন, 'গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মবিদ্যা রূপঃ'। গায়ত্রী ছন্দ মাত্র নহে। উহা ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। গায়ত্রী মন্ত্রটি এইরূপ—

"তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।।"

মন্ত্রটি তিন বেদেই বিদ্যমান। ঋগ্বেদে ৩/৬২/১০, যজুর্বেদের ৩/৩৫, সামবেদের উত্তরার্চিকের ষষ্ঠ প্রপাঠকের দশম মন্ত্র। প্রসঙ্গতঃ সংক্ষেপে অর্থালোচনা করিতেছি।

প্রথমে তৎ শব্দ। গীতা তৎশব্দকে ব্রহ্মবাচক বলিয়াছেন। "ওঁ তৎ সৎ ইতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।" (১৭/২০) তৎ শব্দটিকে ভর্গঃ পদের বিশেষণ ধরা যায়।

আবার 'তস্য সবিতুঃ ভর্গঃ' এই রূপেও ভর্গকে চিন্তা করা যায়।

ভর্গঃ পদে জ্যোতিঃ বুঝায়।

ভৃজ্ ধাতু হইতে ভর্গঃ। ভৃজ্ ধাতুর অর্থ পাক করা, চলতি বাংলায় ভাজা শব্দটি ভৃজ্ ধাতু হইতে। ভর্গঃ অর্থ জ্যোতিঃ। এই জ্যোতিঃ ব্রহ্মজ্যোতিঃ। এই জ্যোতিঃর কথাই মুণ্ডক শ্রুতি বলিয়াছেন ২/২/১০ মন্ত্রে—

"তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।।"

চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র অগ্নি বিদ্যুৎ—যত জ্যোতিঃ আছে ভর্গঃ সকল জ্যোতিঃর উৎস। এই জ্যোতিঃর কণামাত্র দৃষ্ট হইলে—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।।"

হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হয়, সকল সংশয় ছেদ হয়, সমুদয় কর্ম ক্ষয় হয়—এই ভেদ ছেদ ক্ষয় কার্যকে পাক কার্য ধরা যায়। তাই পাকার্থক ভৃজ্ ধাতু হইতে ভর্গঃ। অবিদ্যাদোষ হরণ এই ভর্গের বিশেষ কার্য।

ভর্জন ও হরণ একার্থক ধরিলে এই ভর্গঃই হরি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

"ভৃজি পাকে ভবেদ্ধাতুর্যস্মাৎ পাচয়তি হ্যসৌ
ভ্রাজতে দীপ্যতে যস্মাৎ জগৎ চান্তে হরত্যপি।
কালাগ্নিরূপমাস্থায় সপ্তার্চিঃ সপ্তরশ্মিভিঃ
ভ্রাজতে তৎ স্বরূপেণ তস্মাৎ ভর্গঃ স উচ্যতে।।"

ভৃজ্ ধাতুর পাকার্থ আলোচনা করিয়াছি। আর এক অর্থ—ভ্রাজতে দীপ্যতে—দীপ্তিমান থাকে। এই বিশ্ব স্থিতিকালে সর্বদা ভ্রাজমান বা দীপ্তিমান। প্রলয়কালে বিশ্বপ্রপঞ্চকে এই ভর্গঃই কালাগ্নিরূপে সপ্তরশ্মি বিস্তার করিয়া বিনাশ করেন। এই সপ্তরশ্মির কথা মুণ্ডক-শ্রুতি বলিয়াছেন। কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা ইত্যাদি নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভর্গেরই ক্ষীণপ্রকাশে আমরা প্রতিদিন সবিতৃমণ্ডল হইতে আলোকরশ্মি পাইয়া থাকি। এই আলোক জড়বস্তু নহে, বিশ্বের প্রাণপ্রবাহ এই আলোর সহিত ওতপ্রোত ভাবে একাত্ম হইয়া জড়িত হইয়া আসে। বিশ্বকে প্রাণবন্ত রাখে। এই জন্য মন্ত্রে সবিতুর্দেবস্য ভর্গঃ বলিয়াছেন।

সবিতুঃ। সূ ধাতু হইতে তৃচ্ প্রত্যয় করিয়া সবিতৃ শব্দ। সূ ধাতুর অর্থ 'প্রসব করা'। সবিতা জগৎ প্রসবিতা। দৃশ্যমান সূর্যমণ্ডলই সবিতা শব্দের মুখ্য বাচ্য নহে, সূর্যমণ্ডল যাঁহার বিভূতির কণামাত্র তিনিই মন্ত্রে সবিতুঃ পদের লক্ষ্য। তৎ সবিতুঃ সমাস বদ্ধ ধরিলে সেই সবিতা—যাঁহার এক কণা বিভূতি এই দৃশ্যমান সূর্যমণ্ডল।

বরেণ্যম্। বরেণ্য পদের অর্থ আচার্য শঙ্কর বলেন, নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ। সকলেই আনন্দবস্তুকে আদর করে, সেইজন্য আনন্দই বরেণ্য। সায়ণ বলেন, বরেণ্য অর্থ উপাসনীয়। মহীধর বলেন, প্রার্থনীয়। সবই প্রায় একার্থক।

দেবস্য। নিরুক্তকার যাস্কের সঙ্কেতে—দেব পদে যিনি দ্যোতমান, যিনি ক্রীড়াপরায়ণ। শঙ্কর বলেন, দেব শব্দের অর্থ সর্ব দ্যোতনাত্মক অখণ্ড চিদেক রস।

ধীমহি। ধীমহি অর্থ ধ্যান করি, উপাসনা করি। যে ভর্গঃ আমাদিগকে প্রচোদিত করেন তাঁহার উপাসনা করি।

নঃ। আমাদিগকে। গুরু শিষ্যগণ সকলে এই অর্থে বহুবচন ধরা যায়। অথবা সমগ্র জীবজগৎকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে বলা যায়।

প্রচোদয়াৎ। চুদ্ ধাতুর অর্থ প্রেরণ করা। যিনি প্রেরণ করেন।

ধী পদে মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার এই সমগ্র অন্তরাত্মাকে ধরিলে—যিনি অন্তরতম প্রদেশে থাকিয়া সব কিছু পরিচালনা করেন। আবার জীবকে কর্মে প্রণোদিত করেন, কখনও ধর্ম অর্থ মোক্ষের দিকে—যাহার যেইটি প্রিয় সেই পুরুষার্থের দিকে। অর্জুন যখন বিষাদগ্রস্ত তখন উপদেশ দিয়া তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন ক্ষত্রিয়োচিত কর্তব্যযুদ্ধের দিকে।

আবার কখনও প্রণোদিত করেন নিজাভিমুখে। যেমন বাঁশী বাজাইয়া কৃষ্ণসঙ্গে মিলনে ব্যাকুলচিত্ত ব্রজ-গোপিকাগণকে আপনার অভিমুখে টানিয়া আনিয়া তাঁহাদের অন্তরের নিগূঢ় বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। আকর্ষণ করেন বলিয়া পরব্রহ্মের কৃষ্ণ নাম সার্থক। এই আকর্ষণ করিয়া আপনার করিয়া কার্যে প্রচোদনে উক্ত পদের পরিপূর্ণ সার্থকতা।

'প্রচোদয়াৎ' পদটি বিধিলিঙ্। বিধিলিঙ্ দ্বারা বিধান দেওয়া হয়। বেদ গায়ত্রীমন্ত্র দ্বারা যেন বিধান দিতেছেন, হে জীব, হে সাধক, যে যে অবস্থায় আছ, ভর্গের উপাসনা কর। ভর্গঃরূপ ভগবান্ হরির কৃপা লাভ করিবেই। গায়ত্রী মন্ত্রে শুধু ব্রাহ্মণেরই অধিকার একথা বেদে কোথাও নাই। এই মন্ত্র পাইয়া অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হয়। সকলেই অব্রাহ্মণ হইয়া জন্মায়। গায়ত্রী পাইয়াই ব্রাহ্মণত্বে স্থিত হয়। সুতরাং গায়ত্রীতে অব্রাহ্মণেরই অধিকার এই কথাই প্রতিপন্ন হয়। ঔষধ রোগীর জন্যই। বোগী ঔষধ সেবন করিয়া স্বাস্থ্যবান হয়। অনেক রসায়ন বা টনিক আছে যাহা খাইয়া স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিও আরও বলিষ্ঠ হয়। সুতরাং গায়ত্রী সেবন করিয়া ব্রাহ্মণ ব্রহ্মত্ব লাভ করে করুক। কিন্তু অব্রাহ্মণের অধিকার তো সে কাড়িয়া লইতে পারে না। বেদ জীব-জগতেব সকলকে বলিয়াছেন—এই গায়ত্রী মন্ত্রের উপাসনা করিয়া 'অনিত্যমসুখং' লোকে জন্মিয়া নিত্য সুখের আস্বাদন লাভ কর।

সূত্র— ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবম্॥ ১/১/২৭

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ৩/১২/১ মন্ত্রে গায়ত্রীকেই সকল ভূত, শরীর, পৃথিবী, ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ইহাতে সহজেই বুঝা যায়, গায়ত্রী ছন্দের কথা বলা হয় নাই। ব্রহ্মার্থক গায়ত্রীর কথাই বলা হইয়াছে।

সূত্র— উপদেশভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ॥ ১/১/২৮

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ৩/১২/৬ মন্ত্রে বলা হইয়াছে 'পাদোঽস্য সর্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ইতি'— আবার ৩/১৩/৭ মন্ত্রে বলা হইয়াছে 'অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে'। এক স্থানে দিবি সপ্তমী বিভক্তি আর এক স্থানে পঞ্চমী বিভক্তি (দিবঃ)। ইহাতে শ্রুতির

প্রমাণতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। সূত্রের শেষার্ধে উত্তর দিয়াছেন 'উভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ'। উভয় পক্ষেই সপ্তমী বা পঞ্চমী কোন বিরোধ নাই। বৃক্ষের অগ্রভাগে পক্ষী (বৃক্ষাগ্রে খগঃ) আর বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে ওপরে পক্ষী (বৃক্ষাগ্রাৎ উপরি খগঃ) দুইটি এক কথাই বুঝায়।

সুতরাং আলোচ্য জ্যোতিঃ ব্রহ্মই।

১১। ইন্দ্রপ্রাণাধিকরণ —

সূত্র—প্রাণস্তথাঽনুগমাৎ।। ১/১/২৯

কৌষীতকি উপনিষদে প্রতর্দন ইন্দ্রকে তুষ্ট করিলে ইন্দ্র বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। প্রতর্দন বর প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন, মানবজীবনে যাহা হিতকর এমন একটি বর দিন। উত্তরে ইন্দ্র বলিলেন, আমাকে উপাসনা কর, আমি প্রজ্ঞাত্মা, প্রাণ ও অমৃত।

"স হোবাচ, প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাসস্ব।।"
(কৌষীতকি, ৩/২)

ইন্দ্রের এই উক্তিতে সংশয় জাগে। এইরূপ কথা বলিলেন কেন? ইন্দ্র যদি প্রাণ হন, তাহা হইলে তিনি জীব হন। জীব তো উপাস্য নহে। উত্তরে বলিতেছেন, সূত্র—"প্রাণস্তথানুগমাৎ", প্রাণকে প্রজ্ঞাত্মা ও অমৃত বলা হইয়াছে। সুতরাং প্রাণ পদে ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৮/১৬/৩৩) আছে 'নমো হিরণ্যগর্ভায় প্রাণায় জগদাত্মনে।' ইহাতে বুঝা যায় প্রাণ বায়ুরূপী মাত্র নহে। উহা ব্রহ্মই। যদি আপত্তি করা যায়—ইন্দ্র একজন জীব, শক্তিশালী জীব। তিনি নিজেকে উপাসনা করিবার উপদেশ দিলেন কেন?

এই কথার উত্তর দিতেছেন পরবর্তী সূত্রসমূহে—

সূত্র— ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেৎ, অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্।। ১/১/৩০

সূত্র— শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ।। ১/১/৩১

সূত্র— জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্ন উপাসনাত্রৈবিধ্যাৎ আশ্রিতত্বা দিহ তদ্‌যোগাৎ।। ১/১/৩২

উপরোক্ত সূত্রত্রয়ের সারমর্ম এই যে, ইন্দ্রের ঐ উক্তিটি আছে কৌষীতকি উপনিষদের ৩/৯ অধ্যায়ে। যে প্রকরণে ঐ কথা আছে সেই প্রকরণে বহুবার আত্মা সম্বন্ধীয় বাক্যের উল্লেখ আছে। প্রকরণ

হইতে শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে। ইন্দ্র নিজেকে পূজা করিতে বলেন নাই, পরমাত্মাকেই উপাসনা করিতে বলিয়াছেন।

এই উত্তর যদি মনের মত না হয়, আর একটি উত্তর দিতেছি। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে ১/৪/১০ মন্ত্রে আছে বামদেব ঋষি বলিয়াছিলেন, আমি মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য হইয়াছিলাম। এই সব কথা বলিয়াছেন ব্রহ্মতত্ত্ব সর্বতোভাবে অনুভব করিয়া। ব্রহ্মময় হইয়া গেলে ওইরূপ বলা যায় শাস্ত্রদৃষ্ট্যা—Because of Divine Insight as attested by শাস্ত্র। সেইরূপ ইন্দ্র যদি ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া তন্ময়তা লাভ করিয়া নিজেকে উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন তাহাতে কোন দোষ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে দেখা যায় শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে ভাগবত শুনাইয়া শেষে ভগবদ্ভাবে তন্ময়তা লাভ করার কথা বলিয়াছেন—

"অহং ব্রহ্মা পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্।
এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে।।" ১২/৫/১১

সুতরাং ইন্দ্রের নিজেকে উপাসনার কথাটা বস্তুতঃ ভগবান্‌কে উপাসনার উপদেশই হইয়াছে।

ইহার পর আর একটি শেষ উত্তর দিয়াছেন যে, যে যেভাবেই উপাসনা করুক না কেন, তাহাতে এক পরব্রহ্মের উপাসনা হয়। শাস্ত্রে ত্রিবিধ উপাসনা বিধান আছে। সাধারণ নরনারী তাঁহাকে উপাসনা করে দেবতারূপে। যোগীরা করেন মুখ্যপ্রাণ তত্ত্বরূপে, জ্ঞানীরা তাঁহার উপাসনা করেন অমৃতময় পরমাত্মারূপে, উপাসনা এক জনেরই হয়। যার যেরূপ যোগ্যতা বা অধিকার মত তার উপাসনা করিবে—এ বিধান শাস্ত্রে আছে। উত্তম, মধ্যম ও অধম অধিকারীর উপাসনা ত্রিবিধ কিন্তু লক্ষ্য একজনই।

সাধারণ নরনারী তাঁহাকে দেবতা মনে করিয়া পূজা করে। শাস্ত্রে সেরূপ বিধানও আছে—

"আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ ধনমিচ্ছেৎ হুতাশনাৎ।
জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেৎ মুক্তিমিচ্ছেৎ জনার্দনাৎ।।"

রোগের আরোগ্য চাও ? সূর্যদেবতার অর্চনা কর। ধন চাও ? অগ্নি দেবতার আরাধনা কর। জ্ঞান চাও ? শিবের ভজন কর। যদি মুক্তি চাও— জনার্দনকে পূজা কর, তাঁহার ধ্যানার্চনা কর।

যাঁহারা তদপেক্ষা উচ্চস্তরের তাঁহারা প্রত্যেক দেবদেবীর প্রতিমায়

মুখ্যপ্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া এক মুখ্যপ্রাণের উপাসনা করেন।

যাঁহারা সর্বোচ, তাঁহারা সর্বময় বাসুদেবকে জানিয়া ও বিশ্বময় তাঁহার সত্তা জানিয়া সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মোপাসনা করেন।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্।।" (গীতা, ৯/২৩)

যে অন্য দেবতাকে শ্রদ্ধাপূর্বক ভজনা করে সেও আমাকেই ভজনা করে তবে অবিধিপূর্বক। আমি ও অন্য দেবতা একই এই অনুভব যার আছে তাহার পূজা হয় বিধিপূর্বক। যে অন্যকে আমা হইতে অন্য বা আলাদা একজন মনে করে তাহার পূজা হয় অবিধিপূর্বক। অবিধি পূজায় যে কি ক্ষতি-বৃদ্ধি তাহা গীতায় কিছু উল্লেখ নাই। মনে হয় এইরূপ : রেলগাড়িতে চলিতে হইলে টিকিট করিয়া চলিতে হয়, ইহা রেল কোম্পানীর বিধি। যে যথাযথ টিকিট করে সে যায় বিধিপূর্বক। যে টিকিট না করিয়া গাড়িতে উঠে সে যায় অবিধিপূর্বক। কিন্তু গন্তব্যাভিমুখে গমন উভয়েরই এক। যে বিধিপূর্বক চলিতেছে সে অতি সহজে যাইতেছে। যে অবিধিপূর্বক চলিতেছে সে হয়তো পথে অনেক গ্লানি ভোগ করিবে। টিকিটদর্শক রেলকর্মচারীর হাতে লাঞ্ছিত হইতে পারে। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছিয়া গেলে তাহাকে আর ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না। তাই বলিয়াছেন—

"তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্তি।"

তাহারাও আমাকেই ভজনা করিতেছে।

গীতা আর একস্থানে বলিয়াছেন, চারি প্রকারের লোক আমাকে ভজনা করে—আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। যে যে-উদ্দেশ্যেই ভজনা করুক—প্রত্যেকেই "সুকৃতি", কাহাকেও দুষ্কৃতি বা অন্যায়কারী বলেন নাই।

আরও উদার বাক্য গীতায় আছে—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

যে যে-ভাবে আমার অভিমুখে অগ্রসর হয় আমি সেই ভাবেই তাহার দিকে আগাইয়া আসি। এমন কি কেহ যদি আমাকে শত্রু ভাবিয়া যুদ্ধ করিতে চায়, আমি শত্রুভাবেই তাহার দিকে অগ্রসর হই। যে আমার হাতে যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করে সেও গতি লাভ করে।

শ্রীভগবানের এই গুণটিকে বলা হয় "হতারিগতিদায়কত্ব"।

তাঁহার হাতে হত যে অরি তাহারও তিনি গতিদাতা।

বেদান্ত-দর্শনে চারিটি অধ্যায়। প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটি পাদ। মোট ষোলটি পাদ, তন্মধ্যে প্রথম পাদ শেষ হইল।

প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদ সমাপ্ত।

ব্রহ্মসূত্র

প্রথম অধ্যায় : দ্বিতীয় পাদ

১। সর্বত্র প্রসিদ্ধ্যধিকরণ —

ছান্দোগ্য উপনিষদে ৩/১৪/১-২ মন্ত্র দুইটি লইয়া বিচার।

মন্ত্র দুইটি এইরূপ :

"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুং কুর্বীত।"

"মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসংকল্প আকাশাত্মা সর্বকর্মা সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ ।।"

এই মন্ত্রের সবগুলি বিশেষণই ব্রহ্মবস্তুর— তজ্জলান্, ভারূপ, সত্য- সংকল্প, সর্বকায়, সর্বগন্ধ, সর্বরস ইত্যাদি। কিন্তু দুইটি বিশেষণ ব্রহ্মবস্তুতে লাগানো যায় না, মনোময় এবং প্রাণশরীব। এই মন্ত্রে শান্তভাবে উপাসনা করিতে বলিয়াছে। এই উপাস্য কি ব্রহ্ম না জীব ?

উত্তর দিয়াছেন, সকল বিশেষণই যখন ব্রহ্মসম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ শব্দ তখন এই দুইটি বিশেষণও ব্রহ্মেরই হইবে, জীবের নহে। তাই—

সূত্র— **সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ।।** ১/২/১

সকল স্থানে প্রকৃষ্টভাবে ব্রহ্মবস্তুই উপদিষ্ট।

পরবর্তী সূত্রেও ঐ কথাই বলিয়াছেন—

সূত্র— **বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ।।** ১/২/২

বিবক্ষিত অর্থাৎ বর্ণিত সকল গুণই ব্রহ্মবস্তুপর। সুতরাং দুইটি বিশেষণেরও ব্রহ্মের সঙ্গতি করিতে হইবে।

সূত্র— **অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ** ।।১/২/৩

মন্ত্রেও বলিয়াছেন মনোময় ও প্রাণশরীর শব্দে জীব অর্থ করিলে অনুপপত্তি হয়—অযুক্তিকর কথা বলা হয়।

সূত্র— **কর্ম-কর্তৃব্যপদেশাচ্চ।।** ১/২/৪

কর্ম ও কর্তার নির্দেশ আছে অর্থাৎ ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে—উপাসনা ক্রিয়ার কর্তা জীব উপাসক ও কর্ম হইল ব্রহ্ম, উপাস্য।

"ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।"

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ যে ব্রহ্ম তাঁহাকে উপাসনা করিবে জীব। সুতরাং মন্ত্রের সব বিশেষণগুলিই উপাস্য সম্বন্ধে। মনোময় ও প্রাণ-শরীর বিশেষণদ্বয়ও উপাস্য ব্রহ্মবস্তুরই ইহা বুঝিতে হইবে।

সূত্র— শব্দবিশেষাৎ॥ ১/২/৫

সূত্র দ্বারাও বুঝাইয়াছে যে, শব্দগত বিশেষ দ্বারাও উপাস্য-উপাসক তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে (৩/১৪/৪) আছে "এষ মে আত্মান্তর্হৃদয়" অর্থাৎ মনোময় পুরুষ আমার হৃদয়মাঝে আত্মান্তর্যামী রূপে আছেন। এই মন্ত্রে এষঃ এই প্রথমান্ত শব্দ উপাস্য ও মম অন্তর্হৃদয়ে এই ষষ্ঠ্যন্ত মম শব্দে আমার অর্থাৎ উপাসকের অর্থ বুঝিতে হইবে।

সূত্র— স্মৃতেশ্চ॥ ১/২/৬

সূত্রে—স্মৃতি অর্থাৎ মহাভারতান্তর্গত উক্তিতে দেখা যায় বেদ্য-বেত্তার পার্থক্য। উপাস্য-উপাসকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে স্পষ্টোক্তি আছে।

"বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ"— বেদ্য বস্তু পরব্রহ্মই। জীব হইতে পারে না।

"অনিত্যমসুখং লোকং ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।"

এই 'মাম্' পদে উপাস্য ও পূর্ববর্তী শ্লোকগুলির অহং পদই উপাসক।

ব্রহ্ম উপাস্য, জীব উপাসক। ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীব নিয়ম্য।

সুতরাং মনোময় গুণযুক্ত বস্তু জীব নহে, পরব্রহ্মই। ছান্দোগ্যে আর একটি মন্ত্র আছে (৩/১৪/৩) তাহাতে বলা হইয়াছে, আত্মা ব্রীহি বা ধান্য অপেক্ষা ছোট, 'শ্যামাক-তণ্ডুলাদ্বা', শ্যামাক তণ্ডুল হইতেও ছোট।

এই জন্য মনে হইতে পারে—এই যে এত ক্ষুদ্র আত্মা, এই আত্মা নিশ্চয়ই জীবাত্মা। উত্তর দিতেছেন পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— অর্ভকৌকস্ত্বাৎ তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন, নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ॥ ১/২/৭

ক্ষুদ্র বলিয়া এই আত্মা জীবাত্মা—এইরূপ মনে করিও না কারণ, তিনিও ব্যোমবৎ। ক্ষুদ্র হইল ক্ষুদ্র জীবের উপাসনার জন্য। প্রভু জগদ্বন্ধু একসময় শ্রীবৃন্দাবনে কুসুম-সরোবরে থাকিতেন। সরোবরের তীরস্থ একটা গোফার মধ্যে রহিতেন। তাঁহার কোন কিছুর প্রয়োজন ছিল না। তবু শ্যামদাস নামক একজন ভজনশীল বৈষ্ণব প্রভুর দেখাশুনা

করিতেন।

একদিন প্রভু কুসুম-সরোবরের জলে স্নান করিতেছেন। শ্যামদাস তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। তিনি দেখিতেছেন একটি চার-পাঁচ বৎসরের শিশু জলে আনন্দে সাঁতার কাটিতেছে। ছোট ছোট হাত-পা বেশ সুন্দরভাবে নাড়াচাড়া করিয়া সন্তরণ খেলিতেছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে প্রভু তীরে উঠিলেন। শ্যামদাসজী দেখিলেন একজন বিরাটাকার পুরুষ। পঞ্জিকায় পড়িয়াছেন সত্যযুগে মানুষ নাকি বিশ হাত লম্বা ছিল। এ যেন সেইমত বিংশতি হস্ত পরিমিত এক বিশাল বপু। প্রভু তাড়াতাড়ি গা মুছিতে মুছিতে গোফার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরদিন শ্যামদাসজী যখন প্রভুকে স্বাভাবিক ভাবে দেখিলেন তখন বলিলেন, প্রভু, কাল আপনার স্বরূপ দর্শন করিয়াছি।

প্রভু বলিলেন, "কি স্বরূপ দেখেছ?"

শ্যামদাসজী কহিলেন, "আপনি যখন স্নান করিতেছিলেন, দেখিলাম একটি চার-পাঁচ বছরের শিশু। আবার যখন তীরে উঠিয়া অঙ্গ মার্জন করিতে করিতে গোফায় গেলেন, দেখিলাম আপনার দেহ যেন একটা শালগাছের মত দীর্ঘ।"

শ্যামদাসের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন, "ঐ কি স্বরূপ রে? ও তো একটি তুচ্ছ বিভূতি। Moonlight-এর দেহ কিনা, এটিকে ছোটও করা যায় বড়ও করা যায়।"

ইহা হইল প্রভুজগদ্বন্ধুর লীলাকাহিনীর একটি কথা। ভাগবতে শ্রীশ্যামসুন্দরের লীলাকাহিনীর একটি সুন্দর কথা আছে।

গোপাল দধির ভাণ্ড ভাঙ্গিয়াছেন। মা যশোদা ক্রুদ্ধা হইয়াছেন। পলায়নপর গোপালকে ছুটিয়া গিয়া হাত ধরিয়াছেন। তারপর বাঁধিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। রজ্জু দিয়া গোপালের কটিদেশ বন্ধন করিয়া একটি উদূখলের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে মা যশোদা মনে মনে ঠিক করিয়াছেন। গৃহ হইতে রজ্জু আনাইয়া বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। গোপাল বারংবার বলিতে লাগিলেন, "মা, আমায় বেঁধো না।" মা গোপালের কথা না শুনিয়া বাঁধিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার রজ্জুটা কটিবেষ্টন করিতে দুই আঙুল ছোট হইল। মা ঐ রজ্জুর সঙ্গে আর একটা রজ্জু বাঁধিলেন। সেটাও দুই আঙুল ছোট হইল। ঘরে যত বন্ধনযোগ্য দড়ি ছিল—একটার পর আর একটা একত্র বন্ধন করিয়াও গোপালের কটিদেশ বেষ্টন করিতে সমর্থ হইলেন না।

প্রত্যেকবারই কম পড়িতে লাগিল। প্রত্যেকবারই দুই আঙুল কম। মায়ের জেদ চাপিয়া গেল। পাশের বাড়ীর গোপীদের ঘরে যত দড়ি ছিল চাহিয়া আনাইয়া যোগ করিতে লাগিলেন কিন্তু কি আশ্চর্য! প্রত্যেকবারই একই অবস্থা। মা কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না।

এখানে দুইটি বিষয় চিন্তনীয়। কোলের শিশু গোপালকে মা বাঁধিতে পারিতেছেন না কেন ? আর একটি বিষয় প্রত্যেকবার দুই আঙুল পরিমাণ ছোট কেন ?

প্রথমটির উত্তর শুকদেব বলিয়াছেন—

"ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরম্।
পূর্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ।।"

(ভাগবত, ১০/৯/১৩)

যাহার অন্তর বাহির নাই, অগ্রপশ্চাৎ নাই, যিনি জগন্ময়—মা তাঁহাকে কোলের শিশু মনে করিয়া বাঁধিতে প্রয়াস পাইতেছেন। শুকদেবের কথার তাৎপর্য এই, যখন গোপাল মায়ের কোলে শিশুটি ঠিক তখনই তিনি বিশ্বব্যাপী ভূমা। তিনি যখন ছোট তখনই বড়।

বেদান্ত-সূত্র বলিতেছেন, তিনি কখনও ছোট কখনও বড় ; কখনও 'অণোরণীয়ান্' কখনও 'মহতোমহীয়ান্'।

প্রভুজগদ্বন্ধু লীলার যে কাহিনীটি তাহাতেও দেখা গেল কখনও ছোট কখনও বড়। ভাগবতের দামবন্ধনের কাহিনীতে দেখা গেল তিনি যখনই ছোট তখনই বড়। একইকালে ক্ষুদ্রত্ব বৃহত্ত্ব। ইহা পরব্রহ্ম সম্বন্ধে ভাগবতের অশ্রুতপূর্ব সংবাদ।

প্রত্যেকবারই মায়ের বন্ধনে দুই আঙুল ছোট কেন দড়িটা ? তাহার উত্তর দিতেছি, প্রসঙ্গত।

ভগবান্ আনন্দঘন। বিশ্বের সকলেই আনন্দ-বস্তুকে আপনার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে চায়। আনন্দকে কেহই ছাড়িয়া দিতে চাহে না। মা যশোদার যে বন্ধনের চেষ্টা তাহা বিশ্বের সকল মানুষেরই চেষ্টা। এই চেষ্টার নাম সাধনা। সাধনা দ্বারাই তাঁহাকে পাইতে হইবে। কিন্তু কত সাধক জগতে আছেন তাঁহাকে পান না তো।

তাঁহাকে পাইতে দুই আঙুল ব্যবধান। এক আঙুল আমার সাধনের পূর্ণতা—অপর আঙুল তাঁহার কৃপা। সাধনা ও কৃপা। সাধনা করিয়া জীব তাঁহাকে কখনও পাইবে না। আবার তিনি কৃপা করিয়া আসিয়া সাধন-ভজনহীনকেও ধরা দিবেন না। সাধন অন্তে কৃপা আসিবে।

কিন্তু সাধনের শেষ কোথায় ? কোন্ বিন্দুতে পৌঁছাইলে সাধনভূমিতে করুণা আসিবে ? ভাগবতে শ্রীশুকদেবের ভাষায় বলিতেছি—

"স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে।।"
ভাগবত ১০/৯/১৮)

মায়ের জেদ চাপিয়াছিল বাঁধিবেনই। মনে করিতেছিলেন, 'পেটের ছেলেকে পেটে বাঁধিয়াছে দশমাস, তাকে দড়ি দিয়া বাঁধিতে পারিব না কেন ? নিশ্চয়ই পারিব।' তাই জেদের সহিত বারংবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু শেষটায় মা শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। কবরীর মালা খসিয়া গেল, বেশভূষা অবিন্যস্ত হইল, দেহ ঘর্মাক্ত হইল। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া নিজেই বন্ধন গ্রহণ করিলেন। মা বাঁধিয়া ফেলিলেন।

তাৎপর্যটি এই যে, সাধকের প্রথম মনে হইবে সাধন করিলেই তাঁহাকে পাইব। দীর্ঘকাল একান্তভাবে সাধন-ভজন করিতে করিতে যখন পাওয়া যায় না—তখন একটা ভজনোত্থ-ক্লান্তি আসে। মনে হয়, না, পাওয়া যাইবে না। তিনি সাধনের অতীত ধন, তাঁহাকে সাধনে পাইব না। এই বিন্দুতে পৌঁছাইলে সাধন শেষ, তখন কৃপা আসিবে। তিনি যে সাধনের অতীত এই কথাটি গ্রন্থপাঠ করিয়া মানিলে হইবে না— সাধু-গুরুমুখে শুনিলে হইবে না। সাধন করিয়া জানিতে হইবে। সাধন নিজের ব্যর্থতা জানাইয়া দিবে তখন সাধনের কার্য শেষ। তখন হইবে কৃপার উদয়। কৃপা আসিলে—কৃপাই তাঁহাকে পাওয়াইয়া দিবে। এই ভজনোত্থ-ক্লান্তি এক আঙুল ও তাঁহার করুণা অপর আঙুল। সাধক ও ভগবানের মধ্যে এই দুই আঙুল ব্যবধান। এই ব্যবধান আমারও, আপনারও, মা যশোদারও।

আলোচ্য সূত্রে (১/২/৭) সূত্রকার জানাইতেছেন যে অসীমের এই ক্ষুদ্রত্ব "নিচায্যত্বাৎ" এই পদের অর্থ বলিয়াছেন গোবিন্দভাষ্যকার 'হৃদ্যুপাস্যত্বাৎ'—হৃদয়ের উপাস্যত্ব হেতু। তিনি বড় হইয়াও ছোট হন উপাস্য বলিয়া। উপাস্য পদটি উপাসক সাপেক্ষ। তিনি উপাসকের প্রয়োজনমত অভিলাষমত কার্য করেন। গীতার অনুরূপবাক্য—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।।"

যে যেভাবে শরণাগত হয় সেই সেই ভাবেই তাহাকে ভজনা (অনুগ্রহ) করি। এই কথাটিকে ভাগবত একটু অন্যরূপ করিয়া

বলিয়াছেন। যশোদা জননীর নিকট শ্রীকৃষ্ণ ছুটিয়া আসিতেছেন কেন তার কারণ বলিতেছেন—"স্তন্যকামঃ"। শ্রীকৃষ্ণে মাতৃস্তন্য-পানের কামনা আছে। যাঁহার নাম স্মরণে জীবের কামনা দূর হয়—জীব কামনার অতীত হয়—তাঁহার অন্তরে কামনা! কথাটি বিস্ময়কর। ভাগবত কিন্তু এই কথাই বলেন। বাৎসল্যরসের ঘনীভূত মূর্তি জননী যশোদার হৃদয়ের বাৎসল্যই তাঁহার স্তনদুগ্ধরূপে ক্ষরিত হয়। গোপালের কথা মনে ভাবনা করিতেই মায়ের ঐ স্তন্যক্ষরণ হয়। সেই স্তন্য আস্বাদনের কামনা—সর্ব-কামনাতীত গোবিন্দের অন্তরে আছে। প্রয়োজনটি গোবিন্দেরই। এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম হইলেই আমাদের ভাগবতরস বোধগম্য হইতে পারে, নতুবা নহে।

আর একটি শাস্ত্র বাক্য 'আছে।

"সাধনাকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"।

কথাটির আপাত অর্থ এইরূপ হয় যে, উপাসকের হিতের জন্য, তাহার সাধনার সৌকর্যের জন্য, উপাসনার আনন্দ উপভোগের সুযোগের জন্য ব্রহ্মবস্তুর রূপকল্পনা। ব্রহ্মবস্তু রূপাতীত—তাঁহার রূপের কল্পনা উপাসকের জন্য। এই কথা সত্য হইলে ভক্তের কল্পিত রূপের অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ হয়। মনে করুন—ভীষ্মের মৃত্যুসময় চতুর্ভুজমূর্তি দর্শনের ইচ্ছা হইল—শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ মূর্তিতেই তাঁহার নয়নের গোচর হইলেন। যখন ভক্ত থাকে না বা ভক্তের ইচ্ছাও থাকে না তখন ঐ মূর্তিও না থাকিবার কথা। তাহা হইলে ঐ মূর্তির অনিত্যত্ব হয়।

কথাটি আরও একটু তলাইয়া ভাবিলে প্রশ্ন জাগে, রূপকল্পনা কথাটির কল্পনার কর্তা কে? কল্পনার কর্তা যদি ভক্ত হয় তাহা হইল রূপের অনিত্যত্বের আশঙ্কা। কল্পনা যদি ব্রহ্মের হয়—তাহা হইলে নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। ব্যাকরণশাস্ত্রে কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তির বিধান আছে। "ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা" এই কল্পনার কর্তা যদি ষষ্ঠ্যন্ত ব্রহ্ম হয়—তাহা হইলে সর্ব-রূপই নিত্য হয়। অপ্রাকৃত শাশ্বত-বস্তুর কল্পনাও অপ্রাকৃত ও শাশ্বত।

সূত্রটির শেষে আর একটি পদ আছে—

'ব্যোমবৎ'—আকাশের ন্যায়। কোন অর্থে আকাশের ন্যায় তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। নিম্বার্কাচার্য 'ব্যোমবৎ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন "বৃহতোঽল্পত্ব-গবাক্ষব্যোমবৎ সংগচ্ছত" আকাশ অনন্ত কিন্তু গবাক্ষ

পথে যেটুকু দেখা যায় তাহা অল্প। তাৎপর্য হয়, এইরূপ যে ব্রহ্ম তাহা বস্তুত ভূমা— ভক্তের দর্শনের ভূমিকা বা দৃষ্টিকোণবশত ক্ষুদ্রত্ব দৃষ্ট হয়। এইরূপ ব্যাখ্যা সিদ্ধান্ত হইলে অল্পত্বের অনিত্যত্ব বিচার্য হইয়া পড়ে।

মূল শ্রুতিতাৎপর্য এইরূপ মনে হয় যে, ব্রহ্মবস্তুর ক্ষুদ্রত্ব ও বৃহত্ত্ব—দুইই সমান সত্য দুইই সমান নিত্য। যখনই ক্ষুদ্র তখনই মহান্। যখন মাতৃকোলে বালগোপাল তখনই কোন প্রকার দীর্ঘ রজ্জু দ্বারা তিনি বন্ধনের অযোগ্য, বন্ধনের অতীত।

সূত্র— **সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ, ন, বৈশেষ্যাৎ॥ ১/২/৮**

পরমাত্মার সুখ-দুঃখ ভোগের সম্ভাবনা নাই। কারণ জীবাত্মা হইতে পরমাত্মার বৈশিষ্ট্য আছে। পরমাত্মা সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশক্তিমান্। জীবের এই সব গুণ নাই।

২। অত্ত্রাধিকরণ—

সূত্র— **অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ॥ ১/২/৯**

কঠোপনিষদে ১/২/২৫ মন্ত্রে আছে "যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ" ইত্যাদি। মন্ত্রানুসারে ব্রহ্মই জগতের ভোক্তা ইহাতে সংশয় নাই।

পরবর্তী তিনটি সূত্র—

সূত্র— **প্রকরণাচ্চ॥ ১/২/১০**

সূত্র— **গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ॥ ১/২/১১**

সূত্র— **বিশেষণাচ্চ॥ ১/২/১২**

এই সূত্রত্রয়ে তিনটি কারণ দেখাইয়াছেন। কিসের কারণ ? 'অত্তা' যে পরব্রহ্মই, জীব নহে— ইহার কারণ।

'প্রকরণাৎ' অর্থ পরব্রহ্মের প্রকরণেই উক্ত হইয়াছে। 'গুহাং প্রবিষ্টৌ' সূত্রের তাৎপর্য এই যে, জীবাত্মা-পরমাত্মায় অনেক সাদৃশ্য আছে। যথা, (১) উভয়ই হৃদয় গুহাতে প্রবিষ্ট (২) উভয়ই একটি বৃক্ষে অবস্থিত দুইটি পাখীর মত। আবার তাহাদের মধ্যে পার্থক্যও ছায়া ও রৌদ্রের মত। জীবাত্মা-পাখী কর্মফলভোক্তা। পরমাত্মা-পাখী ভোগ করে না। ভাগবত বলিয়াছেন, 'নিরন্নোঽপি ভূয়ান্'। নিরন্ন হইয়াও অধিক বলশালী। ইহা দ্বারা সিদ্ধান্ত এই যে, চরাচরের অত্তা পরব্রহ্মই।

'বিশেষণাৎ চ' সূত্রের লক্ষ্য কঠশ্রুতির মন্ত্র (১/২/১২)—

"তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্টং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥"

এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মা দুর্দর্শ, গূঢ়, গুহাপ্রবিষ্ট, নিত্য দ্যোতনশীল। এই বিশেষণগুলি কখনও জীবাত্মার হইতে পারে না। পরমাত্মা উপাস্য, জীব উপাসক। পার্থক্য বিস্তর। ধীর ব্যক্তি ইহা জানিয়া হর্ষ-শোক অতিক্রম করেন।

৩। অন্তরাধিকরণ—

সূত্র— অন্তর উপপত্তেঃ॥ ১/২/১৩

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উপকোসল-বিদ্যা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, "যে এষোঽক্ষিণি পুরুষা দৃশ্যতে এয আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতমভয়ম্ এতৎ ব্রহ্ম।" (ছন্দোগ্য ৪/১৫/১)

চক্ষু মধ্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হয় তিনি কি প্রতিবিম্ব না চক্ষুর অধিষ্ঠাতা কোন দেবতা, নাকি জীবাত্মা, না পরমাত্মা। এই সংশয়ের উত্তর এই সূত্রে— অন্তর উপপত্তেঃ।

তিনি পরব্রহ্মই। কারণ, বিশেষণগুলি পরব্রহ্মেই উপপন্ন হয়। অমৃত ও অভয় এই বিশেষণ পরমাত্মারই।

চক্ষুর মধ্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হয় এই কথাটির অর্থ কি তাহা কেনোপনিষদে সুব্যক্ত। কেন শ্রুতির ১/৭ মন্ত্র—

"যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংসি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম তং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

যাঁহাকে চক্ষু দেখিতে পায় না, যাঁহার শক্তিতে চক্ষুর দর্শন ক্রিয়া সম্ভব হয় তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। সুতরাং চক্ষুর মধ্যে দৃষ্ট পুরুষ কথাটির অর্থ হইল এই যে, যে-শক্তি চক্ষুর দর্শন-শক্তির পরিচালক।

এই সূত্রে চক্ষু শব্দ দ্বারা শুধু চক্ষু বুঝাইবে না— উপলক্ষণে সকল ইন্দ্রিয়ই বুঝাইবে। অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও মন-বুদ্ধি-চিত্ত অহংকার সকলের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে পরমাত্মাই।

ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা পুরুষ যে পরমাত্মাই, এই সিদ্ধান্ত স্থাপনের পক্ষে অপর একটি যুক্তি পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ॥ ১/২/১৪

পরমাত্মা কোথায় অবস্থিত তাহাও বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন— "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" ইত্যাদি মন্ত্রে। সুতরাং চক্ষুর অন্তরে বিদ্যমান

পুরুষ পরমাত্মাই। ঐ মন্ত্রে তাঁহার স্থানের কথা বলিয়াছেন 'উৎ' সর্বোচ্চ ও রূপের কথা বলিয়াছেন 'হিরণ্যশ্মশ্রুঃ'। ইহাতে বুঝা যায় অক্ষিপুরুষ পরব্রহ্মই।

পরবর্তী সূত্রেও এই একই প্রসঙ্গ চলিতেছে—

সূত্র— সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ॥ ১/২/১৫

ছান্দোগ্যশ্রুতিতে (৪/১০/৫) বলা হইয়াছে, পরব্রহ্ম সুখস্বরূপ ও আকাশস্বরূপ। মন্ত্রটি এই— "প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম।" ক শব্দের অর্থ সুখ। খ শব্দের অর্থ আকাশ। পরব্রহ্ম সুখস্বরূপ এবং আকাশস্বরূপ। এই মন্ত্রটি আছে অক্ষিপুরুষ প্রকরণের পূর্বেই। ইহা হইতে বুঝা যায়— অক্ষিপুরুষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা পুরুষ সুখস্বরূপ আকাশ পরব্রহ্মই। অন্য কেহ নহে। ব্রহ্ম অনন্ত অসীম তথাপি উপাসকের হৃদয়ে সীমাবদ্ধ রূপে প্রকাশিত হন।

সূত্র— অতএব চ স ব্রহ্ম॥ ১/২/১৬

এই হেতু অর্থাৎ তিনি সুখস্বরূপ বলিয়া তিনিই পরব্রহ্ম। এই সূত্রে নূতন কোন কথা নাই। সূত্রকার হয়তো পূর্বোক্ত কথাকে দৃঢ় করার জন্য আবার বলিয়াছেন। এই সূত্রকে অনেক ভাষ্যকার সূত্ররূপে গ্রহণ করেন নাই। গোবিন্দভাষ্যেও নাই।

পরবর্তী সূত্রে আবার একটি কারণ উপন্যাস কারিতেছেন, অক্ষিপুরুষ যে পরব্রহ্মই ইহা স্থাপনের জন্য।

সূত্র— শ্রুতোপনিষৎক-গত্যভিধানাচ্চ॥ ১/২/১৭

যাঁহারা শ্রুতির তত্ত্ব জ্ঞাত আছেন তাঁহাদের যে গতি হয়, যিনি অক্ষিপুরুষের তত্ত্ব-জ্ঞাতা তাঁহারও সেই একই গতি। এইরূপ উক্তি থাকায় অক্ষিপুরুষ পরব্রহ্মই। জীবনের শেষ-গতি যাঁহাদের একই তাঁহাদের উপাস্য-বস্তু নিশ্চয়ই এক।

পরবর্তী সূত্রে আরও দুটির কারণের উপন্যাস করিয়াছেন।

সূত্র— অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ॥ ১/২/১৮

পরব্রহ্ম ছাড়া অক্ষিপুরুষ আর কে হইতে পারেন? ছায়া বা জীব বা সূর্য— এই তিনের একজনের সম্ভাবনা আছে। এই সূত্রে তিনকেই নিরস্ত করিয়াছেন।

বিম্ব না থাকিলে প্রতিবিম্ব হয় না। অক্ষিপুরুষ কাহার প্রতিবিম্ব হইবে? জীব সকল ইন্দ্রিয়েই আছে তিনি একটি ইন্দ্রিয় চক্ষুতেই থাকিবেন কেন? এই দুইটি কথা বলিয়াছেন 'অনবস্থিতেঃ' এই অংশ

দ্বারা আর 'অসন্তবাৎ' বলিয়াছেন এই বক্ষ্যমান দৃষ্টিতে সূর্য নিজ রশ্মি দ্বারাই চক্ষুর পরিচালনা করিতেছেন। তিনি নিজে কেন ওখানে অবস্থান করিবেন ? এই কথাটি বলিয়াছেন 'অসন্তবাৎ' এই অংশ দ্বারা। অক্ষি পুরুষ যে পরব্রহ্মই একথা শ্রীমদ্ভাগবতে একস্থানে অতি সুন্দর-রূপে বলিয়াছেন। বিরাট্ পুরুষ প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাঁহার ঘুম ভাঙ্গাইতে অনেক চেষ্টা চলিল, কিছুতেই ভাঙ্গিল না। তারপর অগ্নি বাগিন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহার মুখে প্রবেশ করিলেন— বিরাট্ উঠিলেন না। বায়ু ঘ্রাণ দ্বারা নাসিকায়, সূর্য চক্ষু দ্বারা চক্ষুগোলকে, দিক্‌সকল শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ণে প্রবেশ করিলেন— বিরাট্ উঠিলেন না। তারপর ওষধি রোমকূপ পথে ত্বকে, জল শিশ্ন দ্বারা রেতঃতে, মৃত্যু অপানদ্বারা পায়ুতে প্রবেশ করিলেন— বিরাটের ঘুম ভাঙিল না। তারপর ব্রহ্ম বুদ্ধি দ্বারা হৃদয়ে, রুদ্র অহংকার লইয়া অন্তরে প্রবেশ করিলেন। বিরাট্ পুরুষ উঠিলেন না (নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্)। সর্বশেষে ক্ষেত্রজ্ঞ বাসুদেব চিত্ত দ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। তখনই বিরাট্ পুরুষ উত্থিত হইলেন (উদতিষ্ঠত), অর্থাৎ ক্রিয়াশীল হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ছাব্বিশ অধ্যায়ে এই রহস্য বিস্তৃত আছে।

৪। অন্তর্যাম্যধিকরণ—

বৃহদারণ্যক উপনিষদে অন্তর্যামী-ব্রাহ্মণে (৩/৭) উদ্দালক যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে প্রশ্ন করিয়াছেন, "তমন্তর্যামিণং য ইমং চ লোকং পরং চ লোকং সর্বাণি চ ভূতানি যোঽন্তরো যময়তীতি"— যিনি অন্তরে রহিয়া ইহলোক পরলোক ও সমস্ত ভূতগণকে নিয়ন্ত্রিত করেন তাঁহার বিষয় বলুন।

উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন— "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ।" এই প্রকার ৩/৭/৩ হইতে ৩/৭/২৩ মন্ত্র পর্যন্ত অন্তর্যামী বিষয় বলিয়াছেন। প্রত্যেকটি মন্ত্রের শেষে তিনি তোমার অমৃতস্বরূপ আত্মা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এখানে সংশয় জাগিতে পারে যে, অন্তর্যামী কি জীব, না পরমাত্মা ? এইরূপ সংশয়ের উত্তর দিয়াছেন সূত্র—

সূত্র— অন্তর্যাম্যধিদৈবাধিলোকাদিষু তদ্ধর্মব্যপদেশাৎ॥ ১/২/১৯

অর্থাৎ অন্তর্যামী পরমাত্মাই, জীবাত্মা নহে। কারণ

'তদ্ধর্মব্যপদেশাৎ'— অর্থাৎ পরমাত্মার ধর্মই নির্দেশ করা হইয়াছে। কোথায় করা হইয়াছে? অধিদেব ও অধিলোক প্রভৃতি স্থানে। অমৃতময়ত্ব ও সর্বনিয়ন্তৃত্ব পরমাত্মা ছাড়া আর কোথায়ও থাকিতে পারে না। এই শ্রুতির দুই রকম পাঠ আছে দুইটি শাখায়। এক শাখায় আছে যিনি আত্মায় আছেন ; অন্যত্র, আত্মা যাহাকে জানে না, আত্মা যাহার শরীর, এই পাঠ আছে। ইহাতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, অন্তর্যামী পরমাত্মাই। তিনি জীবাত্মা হইলে, জীবাত্মাও তাহাকে জানে না, এইরূপ উক্তি সঙ্গত হয় না। ভগবদ্গীতায় ৮/৩ ও ৮/৪ মন্ত্রে বলা আছে এক পরমাত্মাই অধিযজ্ঞরূপে, অধিদেবরূপে ও অধিভূতরূপে জগতের বিচিত্রতা সৃষ্টি করিতেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য উহা পর্যায়ক্রমে বলিয়াছেন। সূর্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী অধিদৈব ভর্গ ও অধিভূতাদি অভিব্যক্তি স্থূল প্রপঞ্চ জগৎ এবং অধিযজ্ঞাভিব্যক্তি প্রত্যেক ব্যষ্টি জীবাত্মা। পরমাত্মাই শরীরধারী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বহুরূপে প্রতীয়মান হয়। শ্রীমদ্ভাগবত (১/৯/৪২) বলিয়াছেন—

"তমিমমহমজং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥"

মহাত্মা ভীষ্মদেবের মৃত্যুসময়ের শেষ উক্তি।

অতএব অধিদেব ও অধিলোক সর্বত্রই অন্তর্যামী পরমাত্মাই। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল অন্তর্যামী পুরুষ পরমাত্মাই, জীবাত্মা নহেন।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে (৩/৭/২৩) আর একটি বাক্য আছে—

"অদৃষ্টো দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রোতা, অমতো মন্তা, অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা, নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা, নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা, নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতা এষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ।"

কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ নহে, কিন্তু তিনি দেখিয়া থাকেন সকলকে ; কেহ তাঁহাকে শ্রবণ করিতে পারে না, কিন্তু তিনি শুনিতে পান সকলকে, কেহ তাঁহাকে মনে ভাবনা করিতে সক্ষম নহে, কিন্তু তিনি চিন্তা করেন ভাবনা করেন সকলকে, কেহই জানে না তিনি কে বা কি বস্তু, কিন্তু তিনি জানেন সকলকেই। বিশ্বে আর কেহ দ্রষ্টা নাই তিনি ভিন্ন, আর কেহ শ্রোতা নাই তিনি ভিন্ন, আর কেহ ভাবনাকারী নাই তিনি ভিন্ন, কেহ আর নাই বিজ্ঞাতা তিনি ভিন্ন, তিনি তোমার অন্তর্যামী, অমৃতস্বরূপ তিনি।

ইনি কে? ইনি যে জীব নহেন তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। কিন্তু

তিনি প্রকৃতি হইতে পারেন কারণ, মনুর একটি উক্তি আছে প্রকৃতি সম্পর্কে— "অপ্রতর্ক্যং অবিজ্ঞেয়ং, প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ।" মনুসংহিতার এই বাক্যে মন সংশয় জানায়— ঐ অদৃষ্ট দ্রষ্টা তবে কি প্রকৃতি? সাংখ্যোক্ত বা স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতিই কি এই দ্রষ্টা? উত্তর দিয়াছেন পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— **ন চ স্মার্তমতদ্ধর্মাভিলাপাচ্ছারীরশ্চ** ॥ ১/২/২০

উত্তরে বলিতেছেন যে, এই অদৃষ্ট দ্রষ্টাপুরুষ স্মৃতিশাস্ত্রে কিংবা সাংখ্যশাস্ত্রে কথিত প্রকৃতি নহেন। কেননা, সর্বজ্ঞত্ব, অন্তর্যামিত্ব, সর্বেশ্বরত্ব এই সকল ধর্ম জড়া প্রকৃতিতে সম্ভবপর নহে। সূত্রের 'অভিলাপাৎ' শব্দের অর্থ উল্লেখ থাকা হেতু সকল ধর্ম যুক্ত প্রকৃতি নহেই, শরীরধারী জীবও নহে। পরমাত্মার ঈক্ষণেই প্রকৃতির কার্যক্ষমতা হয়। সুতরাং প্রকৃতি পরমাত্মা নহে। সকল জীবই পরমাত্মাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং এই সূত্রে পরমাত্মাই লক্ষ্য বস্তু। শ্রুতির মন্ত্রে 'তে আত্মা' 'এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ'। 'তে আত্মা'— তোমার আত্মা অর্থাৎ এই প্রশ্নকর্তা উদ্দালকের আত্মা— এইরূপ সংশয় জাগিতে পারে। উদ্দালকের আত্মা হইলে জীবাত্মা— এইরূপ সংশয় আসিতে পারে। এই সন্দেহের উত্তর এই যে, 'তে আত্মা' বলিতে যেমন তোমার আত্মা বুঝাইতে পারে, আবার তোমাকর্তৃক জিজ্ঞাসিত আত্মা— এইরূপও হইতে পারে। তুমি উদ্দালক যে আত্মার কথা জানিতে চাহিতেছ, সেই আত্মার কথা, এই বলিলাম। বস্তুতঃ মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য।

বৃহদারণ্যকের তৃতীয় অধ্যায়ে সপ্তম ব্রাহ্মণের পরে অষ্টম ব্রাহ্মণে বিদুষী গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে পর পর দুইটি প্রশ্ন করিয়াছেন। তাহার উত্তরেও বুঝা যায় যে, এই অন্তর্যামী দ্রষ্টাপুরুষ পরব্রহ্মই।

গার্গীর প্রথম প্রশ্ন— যাহা দ্যুলোকের উপরে, যাহা পৃথিবীর নীচে, যাহা দ্যৌ আর পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে, যাহা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে একই রূপ, তাহা কোন্ বস্তুতে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান?

যাজবল্ক্য উত্তর দিলেন, ওই সকল আকাশে বিদ্যমান।

গার্গী দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন, ওই আকাশ কোন্ বস্তুতে ওতপ্রোত আছে?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আকাশ যাহাতে ওতপ্রোতভাবে আছে তাঁহাকে ব্রাহ্মণগণ বলেন "অক্ষর"। শ্রীগীতাও বলিয়াছেন— "অক্ষরং ব্রহ্ম

উচ্যতে''।

সূত্র— উভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে॥ ১/২//২১

বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৩/৭/২২ মন্ত্রে "যে বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" ইত্যাদি মন্ত্রের পাঠ মাধ্যন্দিন শাখায় একটু অন্যরকম আছে— "যো আত্মনি তিষ্ঠন্" ইত্যাদি। উভয় প্রকার পাঠের তাৎপর্য একই, পরমাত্মা জীবাত্মার নিয়ন্তা। সুতরাং পরমাত্মাই অন্তর্যামী, জীব নহে।

৫। অদৃশ্যত্বাধিকরণ—

মুণ্ডক উপনিষদে ১/১/৬ মন্ত্রে বলা হইয়াছে— তিনি অদৃশ্য-অগ্রাহ্য-অগোত্র-অবর্ণ-অচক্ষু-অশ্রোত্র-অপাণি-অপাদ-নিত্য-ব্যাপক-সর্বগত-অতীব সূক্ষ্ম- অব্যয় ও ভূতগণের যোনি। যাঁহারা ধীর তাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

এই মন্ত্র পড়িয়া সংশয় জাগিতে পারে, যাঁহাকে অদৃশ্য অগ্রাহ্য বলা হইয়াছে তিনি কে? সাংখ্যের প্রকৃতিরও ঐসব গুণ থাকিতে পারে। নির্লিপ্ত পুরুষের মধ্যেও ঐ সকল গুণ পাওয়া যাইবে। তবে কি জড়া প্রকৃতি বা জীবাত্মা ঐ মন্ত্রের লক্ষ্যীভূত? এই সন্দেহের উত্তর দিয়াছেন পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ॥ ১/২/২২

খুব ভালভাবে বিচার করিয়া মন্ত্রটি আলোচনা করিলেই বোধগম্য হইবে যে, উক্ত গুণসকল একমাত্র পরমাত্মাতেই থাকা সম্ভবপর। প্রকৃতি বা পুরুষরূপী জীবাত্মায় সম্ভবপর নহে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"মায়াযবনিকাচ্ছন্নমজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়ম্।
ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা॥" ১/৮/১৮

তুমি মায়ারূপ যবনিকা দ্বারা আচ্ছন্ন আছ। জড় জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা তামাকে জানা যায় না। কোন অভিনয়ের সূত্রধর (Manager) যেরূপ অভিনয়কারী নরনারীকে বর্ণবস্ত্রাদি দ্বারা সাজায়, এমন ভাবে সাজায় যাহাতে কেহ চিনিতে পারে না। এ স্থলে প্রকৃতি বা মায়া হইতেছে যবনিকা, পুরুষদের স্থান হইতেছে অভিনয়দর্শনকারিদের মত। মুখ্য সূত্রধর হইতেছেন পরমাত্মা। সুতরাং সংশয়ের অবকাশ কোথায়?

তাছাড়া মুণ্ডক উপনিষদের প্রারম্ভে ১/১/৩ মন্ত্রে দেখা যায় শৌনকাদিরা ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— 'কোন্

বস্তুর জ্ঞান হইলে নিখিল বস্তু-জগতের জ্ঞান হইতে পারে?' এই উপক্রম দ্বারা বুঝা যায় পরব্রহ্ম বস্তুই জিজ্ঞাস্য, তাঁহার কথাই পরবর্তী মন্ত্রে বলিয়াছেন 'অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ' (মুণ্ডক, ২/১/১২) ইহা হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অদৃশ্য অগ্রাহ্য বস্তুটি ব্রহ্মই। এই কথা পরবর্তী সূত্রে আবার বলিতেছেন—

সূত্র— বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ।। ১/২/২৩

এক বিজ্ঞানে সকল বিজ্ঞান হওয়া রূপ প্রারম্ভিক বিশেষণেও ভেদ নির্দেশ থাকায়, পরমাত্মাই প্রকৃতপক্ষে পুরুষের নিয়ন্তা। সুতরাং অদৃশ্যত্বাদি গুণবিশিষ্ট পরম বস্তুটি পরমাত্মাই। আরও একটি কারণ প্রদর্শন করিতেছেন পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— রূপোপন্যাসাচ্চ।। ১/২/২৪

মুণ্ডক শ্রুতিতে ২/১/৪ মন্ত্রে পরমাত্মার একটি অভূতপূর্ব রূপের উপন্যাস করা হইয়াছে। 'অগ্নিমূর্দ্ধা' ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ এই যে, অগ্নি যাঁহার শির, চন্দ্রসূর্য দুই নয়ন, কর্ণদ্বার দিক্‌সমূহ, তাঁহার উচ্চারিত বাক্যই বেদ, তাঁহার প্রাণই বায়ু, হৃদয় বিশ্বজগৎ, চরণ পৃথিবী— এই বিরাট্‌ রূপটি যাঁহার, যিনি সর্বভূতের আত্মা (সর্বভূতান্তরাত্মা)। তিনি পরমাত্মা পরমপুরুষ।

৬। বৈশ্বানরাধিকরণ—

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে পঞ্চম প্রপাঠকে আছে— প্রাচীনশাল সত্যযজ্ঞ প্রভৃতি ছয়জন, রাজা অশ্বপতির নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন (৫/১১/৬)— 'আত্মনমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি তমেব নো ব্রূহি'— আপনি বৈশ্বানর আত্মার তত্ত্ব অবগত আছেন। আপনি আমাদিগকে ঐ তত্ত্ব বলুন। অশ্বপতি অনেক কথা বলিলেন। তাঁহার শেষ কথা এই যে, যে ব্যক্তি প্রাদেশ পরিমিত স্থানে অবস্থিত ব্যাপক বৈশ্বানর-আত্মাকে উপাসনা করেন, তিনি সমস্ত লোকে, সমস্ত ভূতে ও সমস্ত আত্মাতে অন্নভোগ করিয়া থাকেন। এই উত্তর হইতে নানা সংশয় হইতে পারে— বৈশ্বানর কি জঠরাগ্নি, মহাভূত-অগ্নি, কোন অধিষ্ঠাতা দেবতা, কিংবা পরমাত্মা? কোন্‌টি ঠিক ইহা নিরসনের জন্য পরবর্তী সূত্র—

সূত্র— বৈশ্বানরঃ সাধারণ-শব্দবিশেষাৎ।। ১/২/২৫

শ্রুতিতে বৈশ্বানর শব্দের অর্থ পরব্রহ্মই। কারণ প্রাচীনশাল প্রভৃতির

প্রশ্নেই আছে আমাদিগকে আত্মাস্বরূপ বৈশ্বানর সম্বন্ধে বলুন। শুধু বৈশ্বানর সম্বন্ধে বলুন এইরূপ প্রশ্ন করেন নাই। প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর আছে— বৈশ্বানর পরমাত্মাই।

অশ্বপতি বৈশ্বানর আত্মার স্বরূপ বলিতেছেন— বৈশ্বানর আত্মার মূর্ধা সুতেজা, চক্ষু বিশ্বরূপ, প্রাণ অন্তরাত্মা, ইহার শরীরের মধ্যভাগ বহুল। বৈশ্বানরের বস্তি রয়ি, পাদদ্বয় পৃথিবী, বক্ষঃস্থল বেদী, কুশ ইহার লোম, গার্হপত্য অগ্নি ইহার হৃদয়, দাক্ষিণাগ্নি ইহার মন, আহ্বনীয় অগ্নি ইহার মুখ।

বৈশ্বানরের পরিচয়ে শ্রুতি দুইটি নূতন শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রাদেশমাত্র ও অভিবিমান। বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী বিস্তৃত করিলে দুই অঙ্গুলির মধ্যবর্তী যে পরিমাণ-স্থান তাহাকে প্রাদেশ বলে। ভিন্ন ভিন্ন আচার্যের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। আশ্মরথ্য, বাদরি, জৈমিনি তিন ঋষির মত পরপর তিন সূত্রই বলিবেন। জাবাল শাখাধ্যায়ীরা বলেন, ভ্রূ ও নাসিকার সন্ধিস্থলে পরমাত্মার স্থান। এই স্থান মস্তক হইতে চিবুক এই প্রাদেশের মধ্যে অবস্থিত। এই জন্য পরমাত্মাকে প্রাদেশমাত্র বলা হইল।

আচার্য শঙ্কর বলেন, দ্যুলোক হইতে পৃথিবী পর্যন্ত প্রাদেশ দ্বারা তিনি পরিমিত হন পরিজ্ঞাত হন এই জন্য তিনি প্রাদেশমাত্র। পরমাত্মা বস্তুকে শুধু প্রাদেশমাত্র বলিলে ব্রহ্ম দেশাবচ্ছিন্ন হইয়া সীমাবদ্ধ হইয়া যান তাই সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতি অভিবিমান শব্দ দ্বারা তাঁহাকে অপরিমিত বলিয়া জানাইয়াছেন। অভি+বি+মা অনট্ মা ধাতু পরিমাণ করা। যাহার পরিমাপ নাই তাহা বিমান। কোন স্থানেই পরিমাপ নাই যাঁহার তিনি অভিবিমান। রামানুজ অভিবিমান শব্দকে দুই ভাগ করিয়াছেন, অভি অর্থ অভিব্যাপ্ত আর বিমান অর্থ অপরিমেয়।

অশ্বপতি বলিয়াছেন মানবাত্মাও বৈশ্বানর, মানবদেহও বৈশ্বানর। অন্নভোজন অগ্নিহোত্র-যজ্ঞ। মানুষ যখন আহার করে তখন বৈশ্বানরকেই অন্ন আহুতিরূপে অর্পণ করে।

প্রথম আহুতি 'প্রাণায় স্বাহা'। ইহাতে প্রাণ তৃপ্ত। প্রাণের তৃপ্তিতে চক্ষুর তৃপ্তি। চক্ষুর তৃপ্তিতে আদিত্যের তৃপ্তি।

দ্বিতীয়াহুতি অপানায় স্বাহা। ইহাতে অপান তৃপ্ত। অপান তৃপ্তিতে বাগিন্দ্রিয় তৃপ্ত। বাগিন্দ্রিয়ের তৃপ্তিতে অগ্নি তৃপ্ত। অগ্নির তৃপ্তিতে পৃথিবী তৃপ্ত।

তৃতীয়াহুতি সমানায় স্বাহা। ইহাতে সমান তৃপ্ত। তাহাতে মন তৃপ্ত। মনের তৃপ্তিতে পর্জন্যের তৃপ্তি।

চতুর্থাহুতি উদানায় স্বাহা। ইহাতে উদান তৃপ্ত। তাহাতে ত্বক্ তৃপ্ত। তাহাতে বসুর তৃপ্তি। বসুর তৃপ্তিতে আকাশ তৃপ্ত। আকাশ-বস্তু দ্বারা পরিচালিত যাহা কিছু সকলে তৃপ্ত। এই বৈশ্বানর-বিদ্যা না জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম যে করে তাহার ভস্মে ঘৃতাহুতি হয়। যিনি বিদ্যা জানিয়া অগ্নিহোত্র করেন তাঁহার কণ্ঠ দ্বারা সর্বভূতে, সর্বলোকে সকল আত্মায় হোম করা হয়।

পঞ্চমাহুতি ব্যানায় স্বাহা। ইহাতে ব্যান তৃপ্ত। ব্যানের তৃপ্তিতে শ্রোত্র তৃপ্ত। শ্রোত্রের তৃপ্তিতে চন্দ্রমা তৃপ্ত। চন্দ্রমার তৃপ্তিতে দিক্ সকল তৃপ্ত।

এই সকল বাক্য হইতে সিদ্ধান্ত— বৈশ্বানর পরমাত্মাই। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য পরবর্তী সূত্র—

সূত্র— স্মর্যমাণমনুমানং স্যাদিতি।। ১/২/২৬

'স্মর্যমান' অর্থ স্মৃতিতে বর্ণিত। স্মৃতি শব্দে এখানে মহাভারতান্তর্গত ভগবদ্গীতা। গীতা বলিয়াছেন— "অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।" (১৫/১৪)

'অনুমানাং' অর্থ শ্রুতিবাক্যে যে সকল চিহ্ন বা লক্ষণ আছে তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে বৈশ্বানর পরব্রহ্মই।

বৈশ্বানরাধিকরণের আরও সাতটি গৌণ সূত্র আছে—

সূত্র— শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ নেতি, চেন্ন, তথা দৃষ্টুপদেশাদসম্ভবাৎ, পুরুষমপি চৈনমধীয়তে।। ১/২/২৭

'বৈশ্বানর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত' এইরূপ উপদেশ আছে। তাহাতে বৈশ্বানর পরমাত্মা নহে এইরূপ অনুমান ঠিক হইবে না। কারণ ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ৫/১৮/২ মন্ত্রে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে বৈশ্বানরের শিরঃ দ্যুলোক, চক্ষু আদিত্য, প্রাণ বায়ু, ইত্যাদি। পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কাহাতেও ইহা সম্ভব নহে। সুতরাং বৈশ্বানর পরমাত্মাই।

সূত্র— অত্র এব ন দেবতা ভূতঞ্চ।। ১/২/২৮

এই কারণেই বৈশ্বানর কোন দেবতা নহেন, কোন ভূতও নহেন। কারণ 'মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা' ইত্যাদি পরমাত্মা ভিন্ন কোন দেবতাতে সম্ভব নহে।

সূত্র— সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ।। ১/২/২৯

জৈমিনি বলেন, ধাতু প্রত্যয়গত অর্থতেও বৈশ্বানর পদে পরমাত্মা বোঝায়। বৈশ্বানর = বিশ্ব + নর + ষ্ণ.। বিশ্বেষাং নরাণাং নেতৃত্বাৎ ব্রহ্ম।

সূত্র— **অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ** ।। ১/২/৩০

আচার্য আশ্মরথ্যও বলেন শ্রুতিতে অপরিমিত পরমাত্মাকেও প্রাদেশমাত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং বৈশ্বানর পরমাত্মাই।

সূত্র— **অনুস্মৃতের্বাদরিঃ** ।। ১/২/৩১

বাদরি বলেন যে, ধ্যানের জন্যই পরমাত্মাকে প্রাদেশপ্রমাণ বলা হইয়াছে।

সূত্র— **সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথা হি দর্শয়তি** ।। ১/২/৩২

আবার সূত্রকার বলিতেছেন— জৈমিনি মনে করেন, সম্পৎ উপাসনার জন্য পরমাত্মার অবয়ব বর্ণনা করা হইয়াছে। বস্তুর উদ্দেশ্য পরমাত্মার সঙ্গে একাত্মতার অনুভব। এই সম্পৎ-উপাসনার জন্যই অভেদ দর্শন।

সূত্র— **আমনন্তি চৈনমস্মিন্** ।। ১/২/৩৩

ছান্দোগ্য শ্রুতি ও অন্য শ্রুতিও পরমাত্মাকে উপাসকের দেহে আলোচনা করিয়াছেন। পরমাত্মা সর্বব্যাপী। যখন পরিমিত মূর্তিতে ব্যক্ত হন তখনও তিনি সর্বব্যাপী। পরমাত্মায় অচিন্ত্যশক্তিমত্তা আছে বলিয়াই সর্বপ্রকার বিরোধের সম্ভব হয়।

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়ঃ তৃতীয় পাদ

১। দ্যুভ্বাদ্যধিকরণ—

দ্যু পদে দ্যুলোক, ভূ পদে ভূলোক— দ্যুলোক ভূলোক অন্তরীক্ষ ইহাদের যিনি আয়তন অর্থাৎ আশ্রয় অবলম্বন তিনি পরব্রহ্মই। মুণ্ডক শ্রুতিতে উহা স্পষ্টভাবেই কথিত হইয়াছে। এই কথাটি জানাইবার জন্য তৃতীয় পাদের প্রথম সূত্র-

সূত্র— দ্যুভাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ।। ১/৩/১

দ্যুলোক ভূলোকের আশ্রয়স্থল পরব্রহ্মই কারণ, স্বশব্দাৎ পরব্রহ্ম-বাচক শব্দ আছে ঐ মন্ত্রে।

"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহপ্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।।"

(মুণ্ডক, ২/২/৫)

যিনি অমৃতের সেতু তিনি পরব্রহ্ম ছাড়া আর কে হইবেন? এই সূত্র তবে কেন? সংশয়ের স্থান আছে বলিয়া সূত্রের প্রয়োজন। সংশয়ের একটি কারণ শ্রুতিমন্ত্রে শুধু আত্মা শব্দ আছে। পরমাত্মা শব্দ নাই। সংশয়ের দ্বিতীয় কারণ পরবর্তী মন্ত্রে (২/২/৬) উক্ত হইয়াছে "সমস্ত নাড়ী-সকল যাহাতে সংহত আছে"। নাড়ী জীবদেহেই থাকে, পরমাত্মায থাকে না। ইহা সংশয়ের হেতু। সূত্র নিশ্চয় করিয়া জানাইল— আশ্রয়স্থল পরমাত্মাই। আছে রথচক্রের দৃষ্টান্ত, নাড়ীর দৃষ্টান্ত। স্বরূপগত কিছু নহে। দৃষ্টান্ত দুইটি এইরূপ— "অরা ইব রথনাভৌ", "সংহতা যত্র নাড্যঃ।"

সূত্র— মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাচ্চ।। ১/৩/২

এই সূত্রে বলিয়াছেন যে, মুণ্ডকের উদ্ধৃত মন্ত্রে বলা হইয়াছে অমৃতলাভের উহা একমাত্র সেতু। একং শব্দে নিশ্চিত ভাবেই বুঝা যায় যে তিনি ছাড়া আর কেহ নহেন। পরব্রহ্ম বস্তু মুক্তপুরুষদেরই একমাত্র প্রাপ্য। কারণ মুমুক্ষু-ব্যক্তিদের উহাই একমাত্র অবলম্বন। অমৃতময় পরব্রহ্ম ছাড়া অমৃতাস্বাদান আর কে করাইবে? পরবর্তী সূত্রে বলিয়াছেন আত্মা শব্দ আছে বা নাড়ী শব্দ আছে বলিয়া জীবাত্মা বা প্রকৃতি এইরূপ অনুমান ঠিক নহে। শাস্ত্রে এইস্থানে জীবাত্মা বা

প্রকৃতিবোধক কোন শব্দই নাই

সূত্র— নানুমানমতচ্ছব্দাৎ।। ১/৩/৩

সূত্রের অর্থ পরিষ্কার। অন্যকিছু অনুমান করার সুযোগ নাই। পরবর্তী তিনটি সূত্র—

সূত্র— প্রাণভৃচ্চ।। ১/৩/৪

সূত্র— ভেদব্যপদেশাচ্চ।। ১/৩/৫

সূত্র— প্রকরণাচ্চ।। ১/৩/৬

'প্রকরণাৎ' এই সূত্রে বলিয়াছেন— মুণ্ডকোপনিষদের প্রারম্ভে ঐ মন্ত্র আছে— মন্ত্রে আলোচ্য বিষয়— এক বিজ্ঞানে সকল বিজ্ঞান। যাঁহাকে জানিলে অজানা বস্তুও জানা হয়, ইহা তো পরব্রহ্মেরই কথা। সুতরাং প্রকরণই পরব্রহ্ম সম্বন্ধে। অন্য কিছু ভাবনার সম্ভাবনাই নাই।

'ভেদব্যপদেশাৎ' মন্ত্রের তাৎপর্য এই যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য বিস্তর। ভুল হইবার সম্ভাবনা কোথায় ? বলা হইয়াছে আত্মাকে জান, তিনি অমৃতের সেতু। সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন অন্য বাক্য ত্যাগ কর। অন্য কোন কথা বলিও না। কারণ অন্য বিষয়ই অনিত্যবস্তু সম্বন্ধে। একমাত্র অমৃতময় পরমাত্মাই নিত্য বস্তু। তদ্ভিন্ন যতকিছু যাহা কিছু সবই অনিত্য। পরমাত্মা ও জীবাত্মায় এই ভেদ— পরমাত্মা অমৃতময়, জীবাত্মা মৃত্যুময়। সতত পরির্তনশীল। আর, "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্" এই বাক্যে জানা যায় যে, একমাত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তিতেই অমৃতত্ব। তদিতর যাহা কিছু "অন্য" সবই বৃথা। সুতরাং সূত্রে ভেদ স্পষ্ট, অন্য বাক্য ত্যাগ কর, ইহাতে হৃদয়ঙ্গম হয়— বক্তব্য বা জ্ঞাতব্যবস্তু পরমাত্মাই। অন্য কিছু নহে। পরবর্তী সূত্রে আরও একটি পার্থক্য দেখাইতেছেন।

সূত্র— স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ।। ১/৩/৭

জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে একজন ভোগ করে, অন্য জন স্থির, ভোগ করে না। লক্ষ্য মুণ্ডকশ্রুতির ৩/১/১ মন্ত্র—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি।।"

দুইটি পাখী। তাহারা সহচর, সমান স্বভাব, উভয়ের অবস্থান এক দেহ-বৃক্ষে। একজন প্রিয় কর্মফল ভোগ করে, অপর জন ভোগ করে না, কেবল দর্শন করে।

যে কর্মফল ভোগ করে, সে জীব। যে ভোগ করে না শুধু উদাসীনের

মত, যাহার স্থিতি থাকে অপরিবর্তনীয়, সে পরমাত্মা। যিনি কর্মফল ভোগ করিয়া সুখ-দুঃখ-ভোগে পতিত, তাঁহার পক্ষে দ্যুলোক-ভূলোকের আশ্রয়স্থল হওয়া অসম্ভব। যিনি কর্মফলস্পর্শশূন্য, সদা স্বরূপে অবস্থিত, সেই পরামাত্মাই দ্যুলোক-ভূলোকের আশ্রয়স্থল হইতে পারেন।

পরবর্তী তৃতীয় অধিকরণ—

২। ভূমাধিকরণ—

ছান্দোগ্য-শ্রুতির ৭/২৩/১ মন্ত্রে ভূমাতত্ত্ব আলোচিত। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি।" যে প্রকরণে এই মন্ত্র উচ্চারিত তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

দেবর্ষি নারদ গিয়াছেন ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট। অধ্যয়ন করিবার অভিলাষ জানাইয়াছেন। সনৎকুমার জানিতে চাহিয়াছেন তিনি কতদূর কি কি অধ্যয়ন করিয়াছেন। উত্তরে নারদ বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-ইতিহাস- ভূতবিদ্যা-ক্ষত্রবিদ্যা প্রভৃতি তৎকালে প্রচলিত সমুদয় বিদ্যার নাম করিলেন। নারদ বলিলেন, এত জানিয়াও শাস্ত্রবিৎ হইয়াছি, আত্মবিৎ হই নাই। সেই জন্য আপনার সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়াছি।

সনৎকুমার বলিলেন, যাহা জানিয়াছ তাহা বিকারাত্মক নাম মাত্র। সমস্ত শাস্ত্রই নামস্বরূপ। নারদ জানিতে চাহেন, নাম হইতে শ্রেষ্ঠ কি ? সনৎকুমার বলেন, নাম হইতে বাক্ শ্রেষ্ঠ। এইরূপ প্রশ্নোত্তরে ক্রমশ বাক্ হইতে মন, মন হইতে সংকল্প, সংকল্প হইতে চিত্ত, তাহা ইহতে ধ্যান, ধ্যান হইতে বিজ্ঞান, তাহা হইতে বল, তাহা হইতে অন্ন, জল, তেজ, আকাশ, স্মরণশক্তি, আশা— ও আশা হইতে প্রাণ শ্রেষ্ঠ। এই কথা শুনিয়া নারদ ভাবিলেন, প্রাণ বা জীবই সর্বশ্রেষ্ঠ। সনৎকুমার নারদের জিজ্ঞাসা ছাড়াই বলিলেন, প্রাণ হইতে সত্য ও সুখ শ্রেষ্ঠ। এই সত্য ও সুখস্বরূপই ভূমা। এই আলোচনার ভঙ্গিতে মনে হইতে পারে, জীবাত্মাই এই ভূমা। কারণ নারদ তৎপর আর প্রশ্ন করেন নাই। সনৎকুমার হয়তো এই জীবতত্ত্বকেই বিশদ করিবার জন্য পরবর্তী কথাগুলি বলিয়াছেন। সুতরাং জীবাত্মাই ভূমা। এইরূপ সংশয় হইতে পারে যে, জীবতত্ত্বই ভূমা। তাই পরবর্তী সূত্রে সংশয় নিবারণ করিয়া বলিয়াছেন— ভূমা পরমাত্মাই। কারণ—

সূত্র— ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ।। ১/৩/৮

ভূমা পরমাত্মাই— সে বিষয় দুইটি কারণ দিয়াছেন, সম্প্রসাদাৎ ও 'অধ্যুপদেশাৎ'। ভূমাকে পাইলে জীব সম্যক্-রূপে প্রসন্নতা লাভ করে। সম্যক্ প্রসীদতি অস্মিন্— সম্প্রসাদ। যাঁহাকে পাইলে চিত্তে প্রসন্নতা সম্যগ্‌ভাবে লব্ধ হয়, তাঁহাকে পাইলে জীব সম্পূর্ণরূপে প্রশান্তাত্মা হয়। 'সম্প্রসাদাৎ' কথাটিকে শ্রুতি বুঝাইয়াছেন এইরূপে— "এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে।" ছান্দোগ্য, ৮/৩/৪।।

"অধি উপদেশাৎ" অর্থ, পরমাত্মা জীব হইতে অধিক এইরূপ উপদেশ থাকায়। জীব পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া নিজস্বরূপে স্থিত হয়। পরমাত্মা তত্ত্বতঃ জীব হইতে অনেক ঊর্ধ্বে এইরূপ উপদেশ থাকায়। অতএব ভূমা জীবাত্মা নহে, পরমাত্মাই। আরও একটি কারণ দিয়াছেন পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— ধর্মোপপত্তেশ্চ।। ১/৩/৯

সনৎকুমার-নারদ-সংবাদের প্রকরণে পরমাত্মার যত ধর্ম বা স্বরূপ তাহা সবই ভূমাতে বর্ণিত দেখা যায়। নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেই ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত? সনৎকুমার উত্তরে বলিয়াছেন, "স্বে মহিম্নি যদি বা ন মহিম্নীতি।" (ছান্দোগ্য, ৭/২৪/১)

ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত? সনৎকুমার উত্তর দিয়াছেন, নিজ মহিমায়। আবার সংশোধন করিয়া বলিতেছেন, না, কাহারও মহিমায় নহে। যিনি সর্বাশ্রয় তাঁহার কোন আশ্রয় থাকিতে পারে না। এই ভূমাই সর্বাশ্রয়, সুতরাং নিরাশ্রয়। পরমাত্মা ছাড়া এরূপ উক্তি আর কাহারও সম্বন্ধে উক্ত হইতে পারে না।

৩। অক্ষরাধিকরণ—

অক্ষর শব্দের তাৎপর্য লইয়া বিচার, অক্ষর বলিতে অ-আ-ক-খ অক্ষর বুঝায়। মুণ্ডক শ্রুতির মন্ত্রাংশ "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ"— পুরুষ অক্ষর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এইরূপ বুঝায়। গীতায় "যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহং অক্ষরাদপিচোত্তমঃ"— এই বাক্যে পুরুষোত্তম ক্ষর-অক্ষর পুরুষ উভয়ের অতীত এইরূপ বুঝায়।

এইজন্য সংশয়, অক্ষর বলিতে ঠিক কি বুঝায়— উত্তর দিতেছেন পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ।। ১/৩/১০

অক্ষর পরমাত্মাই, কারণ 'অম্বরান্ত' আকাশ পর্যন্ত সমস্ত লোকের ধারণ সামর্থ্য উহাতে আছে বলিয়া। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে প্রশ্ন হইল— দ্যুলোকের উপরে পৃথিবীর নীচে দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে এবং অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে ?

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, এইসব আকাশকে আশ্রয় করিয়া আছে।

তৎপর আবার প্রশ্ন, এই আকাশ কাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে ?

এই আকাশ আছে অক্ষরকে আশ্রয় করিয়া— এই হইল যাজ্ঞবল্ক্যের পক্ষের উত্তর।

আকাশ পর্যন্ত সব পদার্থের ধারণশক্তি আছে এই অক্ষরে। সুতরাং এই অক্ষর পরমাত্মা ছাড়া আর কে হইতে পারে ? অক্ষর কে ? অর্জুনের এই প্রশ্নে ভগবানের উত্তর— 'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্'। পরমব্রহ্মই অক্ষর। অর্জুন স্তবেও বলিয়াছেন, "তমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্"। ভাগবতেও ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিয়া বলিয়াছেন,

"নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ
পূর্ণোঽদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ।" (ভাগবত, ১০/১৪/২৩)

অতএব অক্ষর পরমাত্মাই। জীব কিংবা প্রকৃতি নহে। অক্ষর যে পরব্রহ্মই সেই উদ্দেশ্যে আর একটি সূত্রে বলিতেছেন—

সূত্র— সা চ প্রশাসনাৎ।। ১/৩/১১

সূত্র— অন্যভাব-ব্যাবৃত্তেশ্চ ।। ১/৩/১২

সা— সেই যে আকাশদি যাহা কিছু সকলের ধারক তিনি পরব্রহ্মই। কি উপায়ে বুঝিলে ? 'প্রশাসনাৎ'। বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলিয়াছেন প্রশাসনের কথা। শ্রতি-মন্ত্র এই—

"অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্তা অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সম্বৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি"। ৩/৮/৯

পরমাত্মার প্রশাসনে জগদ্ব্যাপার পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং অক্ষর পরমাত্মাই। ত্র্যক্ষরাত্মক প্রণব যে পরব্রহ্ম, অন্য কেহ নহে এই কথা স্থাপনের জন্য আর একটি অধিকরণ করিতেছেন—

৪। ঈক্ষতিকর্মাধিকরণ—

প্রশ্নোপনিষদে একটি মন্ত্র আছে (৫/৫)

"যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণ ওঁ ইত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষং

অ   ।ত স তেজসি সূর্যে সম্পন্নঃ। অর্থাৎ যিনি অ উ ম্ এই তিন মাত্রাত্মক 'ওঁ' এই অক্ষররূপে পরম পুরুষকে ধ্যান করেন, তিনি তেজোময় সূর্যভাব লাভ করেন। এই যে ধ্যানের বস্তু পরমপুরুষ, ইনি কে ? ইনি বস্তুতঃ পরমাত্মা। কিন্তু সমষ্টিজীবরূপী হিরণ্যগর্ভও হইতে পারেন— এই সংশয়াশঙ্কায় উত্তর দিয়াছেন এই সূত্র—

সূত্র— **ঈক্ষতিকর্মব্যপদেশাৎ সঃ ॥ ১/৩/১৩**

ঈক্ষতিকর্মের বিষয় উল্লেখের জন্যই ঐ পরমপুরুষ পরমাত্মা। ঈক্ষণ শব্দের অর্থ দর্শন, মন্ত্রে 'অভিধ্যায়ীত' শব্দ থাকায় এখানে ঈক্ষণ অর্থ মানসদর্শন অর্থাৎ ধ্যান। ধ্যানের বিষয় ধ্যানকারী উপাসকের প্রাপ্য হয়। এই প্রাপ্য বস্তু পরমাত্মাই। প্রশ্নোপনিষদের উক্ত মন্ত্র ঐ কথাই প্রকাশ করে। মন্ত্রের প্রতিপাদ্য ওঙ্কার আলম্বনে উপাসনায় উপাস্য ব্রহ্মই। সমষ্টিজীব হিরণ্যগর্ভ নহেন।

ওঙ্কার পরব্রহ্মেরই বাচক। ওঙ্কার সমগ্র বেদের বীজ, সমগ্র সৃষ্টির মূলবীজও ওঙ্কারে নিহিত। ওঙ্কারের ধ্যানে লভ্য বস্তুটি পরমাত্মাই, অন্য কেহ নহেন। গীতা বলিয়াছেন, "ওঁ তৎ সৎ ইতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।" গীতা আরও কয়েকস্থানে প্রণবের কথা বলিয়াছেন। 'প্রণবং সর্ববেদেষু'।

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্॥
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ওঙ্কারের কথা বলিয়াছেন—

"স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ।
সঃ সর্ব মন্ত্রোপনিষদ্বেদবীজং সনাতনম্॥"

ওঙ্কার ব্রহ্মের জ্যোতিঃ, সাক্ষাৎ বাচক, সমগ্র বৈদিক মন্ত্রের সমগ্র উপনিষদের শাশ্বত সূক্ষ্মপ্রকাশ।

এই 'ঈক্ষতিকর্ম ব্যপদেশাৎ সঃ' সূত্রের অর্থ অন্য প্রকারও হইতে পারে। ঈক্ষণ বা ধ্যান উপাসক সাধকের এই কথা বলা হইয়াছে— এই অর্থ না করিয়া এই ঈক্ষণ কর্ম পরব্রহ্মেরই এইরূপ করা যায়। পরব্রহ্মের ঈক্ষণের কথা ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলিয়াছেন "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" পরব্রহ্মের ঈক্ষণের কথা ঐতরেয়-শ্রুতি বলিয়াছেন "স ঈক্ষত লোকান্নুসৃজা", "স ইমান্ লোকান্ অসৃজত"। ব্রহ্মের এই ঈক্ষণই বিশ্ব-উৎপত্তির একমাত্র কারণ। সুতরাং ঈক্ষণকর্ম দ্বারা ঠিক ঠিক জানা গেল যে, ঈক্ষণকর্তা একাক্ষর ব্রহ্ম প্রণব পরমাত্মাই।

৫। দহরাধিকরণ—

ছান্দোগ্য-শ্রুতির অষ্টম প্রপাঠকে প্রথম খণ্ডে—

"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্নন্তরকাশস্তস্মিন্ যদন্তঃ তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।।"

এই শরীর ব্রহ্মপুর। তাহাতে ক্ষুদ্র পদ্মাকার গৃহ আছে। তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে। তাহার মধ্যে যাহা আছে তাহাকে অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাহাকে বিশেষভাবে জানিতে হইবে।

এই দহর শব্দের অর্থ লইয়া সংশয়। ইনি কি ভূতাকাশ নাকি জীব তত্ত্ব? এইরূপ সংশয় জাগিলে পরবর্তী সূত্রে উত্তর দিয়াছেন—

সূত্র— দহর উত্তরেভ্যঃ ।। ১/৩/১৪

'দহর' শব্দের অর্থ পরব্রহ্মই। কিরূপে জানিলে? উত্তরেভ্যঃ— পরপর যেসব হেতু বা বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে তাহা দ্বারা।

এই দহর সম্বন্ধে ছান্দোগ্য বলিয়াছেন—

"এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" (ছান্দোগ্য, ৮/১/৫) ইত্যাদি। যাহা জরাতুর হয় না, নষ্ট হয় না তাহাই প্রকৃত ব্রহ্মপুর। আত্মা পাপরহিত, জন্মমৃত্যুশোক তাপ ক্ষুধা তৃষ্ণারহিত সত্যকাম সত্যসংকল্প। দহরাকাশে অবস্থান যাঁহার তিনি পরমাত্মাই।

সূত্র— গতি-শব্দাভ্যাং তথাহি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ ।। ১/৩/১৫

ইহাতেও দহর যে হৃদয়স্থ ব্রহ্মপুর, দহরাকাশ যে পরমাত্মাই, তাহা প্রতিপন্ন করিতেছে।

আলোচনীয় ছান্দোগ্যের ৮/৩/২ মন্ত্র—

"তদ্ যথাঽপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেব ইমাঃ সর্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি, অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ ।।"

একটা ক্ষেত্রের তলে যদি সুবর্ণধন প্রোথিত থাকে তাহা হইলে ওই বিষয় অনভিজ্ঞলোক যদি ক্ষেত্রের উপর বিচরণ করে তাহা হইলেও সে প্রোথিত ধনরত্নের বিষয় জানিতে পারে না। এইরূপ সমুদয় জীব নিরন্তর ব্রহ্মপুরে গমনাগমন করিয়াও সত্যবস্তুর সন্ধান পায় না। কারণ, সত্যবস্তু সেখানে অসত্য দ্বারা আবৃত।

এই মন্ত্রে ব্রহ্মলোকে অহরহ গমন শ্রবণ এবং— এতৎ পদের সহিত ব্রহ্মলোক শব্দের সমানাধিকরণ রূপে ব্যবহার হওয়ায় ইহাই

বোধগম্য হইল যে, দহরাকাশ পরমাত্মাই। সুষুপ্তিকালে জীব প্রতিদিন পরব্রহ্মের সহিত একত্র হইয়াও সে যে পরব্রহ্মে মিলিত হইয়াছে তাহা জানিতে পারে না।

সূত্র— **ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ** ॥ ১/৩/১৬

'ধৃতেঃ' ধারণ জন্য— ব্রহ্মের যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করার শক্তি তার মহিমা অনুভূতি মানুষের এই দহরাকাশেই হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে দহরাকাশ ব্রহ্মবস্তুই।

ছান্দোগ্যের ৮/৪/১ মন্ত্রে শ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, আত্মা সেতু স্বরূপ। লোক সকল যাহাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া না যায় (অসং-ভেদায়) এই জন্যে তিনি বিধৃতিরূপে সকল ধরিয়া রাখিয়াছেন। এ সূত্রে 'ধৃতেশ্চ' পদে এই বিধৃতিরই কথা। ধরিয়া রাখিয়াছেন বলিয়াই বিরাট বিশ্ব ব্যষ্টি-সমষ্টি ভাবে 'অবিভক্তং বিভক্তেষু' (গীতা)। এই ধৃতির জন্য বিশ্বসংসার— Well Integrated, বিধারণ অর্থ Integration।

সূত্র— **প্রসিদ্ধেশ্চ** ॥ ১/৩/১৭

তৈত্তিরীয় শ্রুতির আনন্দবল্লীর একটি মন্ত্র প্রসিদ্ধ—

"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ॥"

আকাশ যদি আনন্দ স্বরূপ না হইত তাহা হইলে কে বা বাঁচিত, কে বা শ্বাস প্রশ্বাস লইবার চেষ্টা করিত। ইহাতে জানা গেল অন্তরাকাশ বা দহর ব্রহ্মানন্দ অর্থাৎ পরমাত্মাই। এই আকাশ কদাপি ভূতাকাশ নহে।

দহর আকাশেরই প্রসঙ্গ চলিতেছে— ছান্দোগ্যশ্রুতিতে ৮/৩/৪ মন্ত্র— "অথ স এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপ সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পিদ্যতে। এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতম-ভয়মেতদ্ ব্রহ্ম॥"

এই মন্ত্রে 'সম্প্রসাদ' শব্দটি আছে। এই শব্দটি জীব সম্বন্ধেই প্রয়োগ হয়। সম্যগ্ভাবে প্রসাদ পাইয়া প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে যে, এই যে সম্প্রসাদ জীব এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়, স্ব স্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়। ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত ও অভয়। ইহাই ব্রহ্ম।

সম্প্রসাদ শব্দটি থাকার জন্য সংশয় জাগে, তবে কি দহরাকাশে

যিনি অবস্থিত তিনি জীবতত্ত্ব ? উত্তর দিয়াছেন পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ।। ১/৩/১৮

ইতরপরামর্শ শব্দের অর্থ, 'সম্প্রসাদ' শব্দে জীবের সঙ্গে যুক্ত থাকা হেতু— যদি বল যে দহরাকাশ স্থিত জীবতত্ত্ব— তাহার উত্তর বলিতেছি যে, তাহা অসম্ভব।

দহরাকাশ প্রকরণে সম্প্রসাদ শব্দ আছে কেন তাহা বলা যাইতেছে। সম্প্রসাদ জীবাত্মা বটে কিন্তু কোন্ জীবাত্মা ? সুষুপ্ত আত্মাই সম্প্রসাদ। সম্প্রসাদ অবস্থা যিনি লাভ করেন তিনি শরীর হইতে উত্থিত হইয়া জ্যোতিস্বরূপে প্রকাশিত হন। এই জ্যোতির্ময় স্বরূপই আত্মা। আত্মা অমৃত, অভয়, আত্মা ব্রহ্ম। সুষুপ্ত অবস্থায় জীব আর জীব থাকে না, ব্রহ্মজ্যোতির সহিত একাকার হয়। তখনকার ব্রহ্মভূত অবস্থাপন্ন জীবই সম্প্রসাদ। সম্যক্ একাত্মাপন্ন। জীব তখন আর জীব নাই। সমস্ত অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া একত্বাপন্ন হইয়াছে সে তখন।

সুতরাং দহরাকাশ পরমাত্মাই, জীবাত্মা নহে।

পরবর্তী সূত্রে এই কথাকে আরও স্পষ্টতর করিতেছেন—

সূত্র— উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু।। ১/৩/১৯

ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮/৭/১ মন্ত্রের উত্তরাংশে দৃষ্ট হয় 'য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরোবিমৃত্যুর্বিশোকঃ' ইত্যাদি।

এই মন্ত্রে যে সকল গুণের কথা উক্ত হইয়াছে, সে সকল জীবের গুণ নহে। তবে সাধনা দ্বারা স্বরূপ প্রকাশিত হইলে— ওই সকল গুণ জীব প্রাপ্ত হয়। গীতা বলিয়াছেন, 'মম সাধর্ম্যমাগতাঃ'। জীব তখন জীব থাকে না, আমার স্বধর্মতা প্রাপ্ত হয়।

শ্রীহরির আরাধনায় তৎপ্রসাদে সমগ্র পরমার্থ সিদ্ধ হয়। শ্রীহরি পরম ভক্তকে নিজেকে পর্যন্ত দান করিতে পারেন।

"স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি।"

(ভাগবত, ১০/৮০/১১)

পরমাত্মার প্রাপ্তিতে জীব তখন তৎস্বরূপে তন্ময়। সম্প্রসাদ তখনকারই কথা। সুতরাং দহরাকাশ পরমাত্মাই, জীবাত্মা নহে।

সূত্র— অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ।। ১/৩/২০

এই সূত্রে বলিয়াছেন যে— জীব যে শ্রীহরিকে ভজনা করিতে করিতে তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়— পরমাত্মা সম্বন্ধীয় গুণাদি লাভ করে— এই কথাটি জানাইবার জন্য ওই ছন্দোগ্য-শ্রুতি। জীবই

দহরাকাশ ইহা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে নহে। কতখানি একাত্মতা হয় জীব ও ব্রহ্মে ইহা জানানোই শ্রুতির উদ্দেশ্যে। জীবই দহরাকাশ বা পরমাত্মা এই কথা প্রকাশের জন্য এই শ্রুতি নহে।

সূত্র— অল্পশ্রুতেরিতি চেৎ, তদুক্তম্॥ ১/৩/২১

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে "দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশ"— হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে আকাশ তাহাই দহর পদবাচ্য। প্রাদেশ প্রমাণ হৃদয়ের মধ্যে আকাশ কতটুকু? এত ক্ষুদ্র পরমাত্মা নহে, জীবাত্মা। এই কথাই সূত্রে বলিতেছেন, 'অল্পশ্রুতেঃ ইতি চেৎ'— এত অল্পত্ব কি পরমাত্মায় সম্ভব? এই কথা যদি বল, উত্তর— 'তদুক্তম্', উত্তর পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। উপাসকের সুবিধার জন্য এই উত্তর পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। তা ছাড়া ব্রহ্ম বস্তু "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।" তিনি ছোটর ছোট, বড়র বড়। যখনই বড় তখনই ছোট। ভক্তের ভাবনানুসারে ভগবান্ রূপ ধারণ করেন।

সূত্র— অনুকৃতেস্তস্য চ ॥ ১/৩/২২

ছান্দোগ্যের ৮/১২/৩ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, "এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ।"

জীব স্থূল শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ পরমাত্মাকে লাভ করে ও নিজ স্বরূপে স্থিত হয়।

তবে তো সে ব্রহ্মই হইয়া যায়, পরমাত্মা হইয়া যায় না, তাহা হয় না। তৎসাদৃশ্য লাভ করে মাত্র। তখন তিনি পরমাত্মার অনুকরণ করেন। তাহাই সূত্রে বলিতেছেন, 'অনুকৃতেস্তস্য'। অনুকারী আর অনুকার্য সর্বতোভাবে এক হইতে পারে না। অতএব দহরাকাশ পরমাত্মাই, জীবতত্ত্ব নহে। গীতাও তাহাই বলিয়াছেন—

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।" পরব্রহ্মের স্বধর্মতা প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়া যায়— একথা শ্রুতি বলেন নাই। তাহাই সূত্রে বলিতেছেন—

সূত্র— অপি চ স্মর্যতে॥ ১/৩/২৩

স্মৃতি অর্থাৎ মহাভারতান্তর্গত গীতাশাস্ত্রেও এই কথাই বলিয়াছেন। ব্রহ্মের স্বধর্মতা প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা হয় না। সুতরাং দহরাকাশ জীবতত্ত্ব নহে, পরব্রহ্মই।

৬। প্রমিতাধিকরণ—

সূত্র— শব্দাদেব প্রমিতঃ।। ১/৩/২৪

কঠ শ্রুতিতে (২/১/১২ মন্ত্র)

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈতৎ।।"

আত্মার অভ্যন্তরে আছে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ, এই কথা বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে সংশয় এই: তিনি কি জীবাত্মা, না পরমাত্মা? সংশয়ের নিরসন করিতেছেন এই সূত্রে, বলিতেছেন, 'শব্দাদেব প্রমিতঃ' অর্থাৎ শ্রুতির এই বাক্য দ্বারাই প্রমাণীভূত। কারণ ওই মন্ত্রেই বলা হইয়াছে তিনি 'ঈশানো ভূতভব্যস্য'— অতীত অনাগত যাহা সকলেরই তিনি নিয়ন্তা। তিনি শাসনকারী। এই শেষ বাক্যাংশেই জানা গেল তিনি পরমাত্মা। জীবাত্মা কখনও অতীত ভবিষ্যতের শাসনকর্তা হইতে পারেন না। শ্রীহরির শক্তি অনন্ত। তিনি অসীম হইয়াও অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ।

তিনি এতবড় হইয়াও এত ছোট হন কেন? কিরূপে? পরবর্তী সূত্রে উত্তর দিয়াছেন—

সূত্র— হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ।। ১/৩/২৫

শাস্ত্রে যত উপদেশ দেওয়া সকলই মানুষের জন্য। মানুষের হৃদয়ের পরিমাপ প্রাদেশমাত্র। তার মধ্যে যিনি বাস করেন তিনি অঙ্গুষ্ঠ মাত্র। সাধকের কল্যাণসাধনের জন্য তিনি তাঁহার হৃদ্‌পদ্মে স্থান করিয়া লয়েন। হৃদয়ের পরিমাপ অল্প ক্ষুদ্র। তাই আরাধ্যবস্তু ক্ষুদ্র হইয়া তাহার মধ্যে স্থান করিয়া লয়েন।

শ্রীহরি একই সময় ক্ষুদ্র, বৃহৎ, অণু এবং মহান্। এই প্রসঙ্গ পূর্বে একবার আলোচিত হইয়াছে। যিনি সর্বশক্তিমান্ তিনি সত্যসত্যই সব পারেন। যিনি বিশ্বরূপ তিনিই তখন পার্থসারথি— রথের ঘোড়ার লাগাম-ধরা কোচোয়ান। ইহাই তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিমত্তার পরিচয়।

মনুষ্যদের উপাসনার জন্য সকলরকম বিধিবিধান— এই কথা বলায় প্রশ্ন জাগিয়াছে, কেবল কি মানুষের ব্রহ্ম উপাসনায় অধিকার? দেবতাদিগের কি উপাসনার অধিকার নাই?

৭। দেবতাধিকরণ—

সূত্র— তদুপর্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ।। ১/৩/২৬

সূত্র— বিরোধঃ কর্মণীতি চেৎ, নানেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ।। ১/৩/২৭

সূত্র— শব্দ ইতি চেৎ, নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।। ১/৩/২৮

সূত্র— অতএব চ নিত্যত্বম্।। ১/৩/২৯

সূত্র— সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ।। ১/৩/৩০

৮। মধ্বধিকরণ—

সূত্র— মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ।। ১/৩/৩১

সূত্র— জ্যোতিষি ভাবাচ্চ।। ১/৩/৩২

সূত্র— ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি।। ১/৩/৩৩

এই আটটি সূত্রে জৈমিনি বাদরায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যেরাও আলোচনা করিযা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দেবতাগণেরও ব্রহ্মবিদ্যায অধিকার আছে। এ সম্বন্ধে ভাগবতের একটি শ্লোক আছে—

"যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ,
বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ,
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।।" ১২/১৩/১

এই শ্লোকে বলা হইয়াছে ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, মরুৎ, রুদ্র প্রভৃতি দেবতারা যাঁহার জয়কীর্তন করেন, সামবেদীরা অঙ্গ, পদ, ক্রম ও উপনিষদের সহিত বেদ দ্বারা যাঁহার স্বরূপ ধ্যান করেন, যোগিরা ধ্যানাবস্থায় তদ্গত চিত্ত হইয়া যাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন আর সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত পান না সেই দেবতাকে প্রমাণ করি।

এই বাক্যে ব্রহ্মাদি দেবগণও স্তবস্তুতি করেন। এই উক্তিতে বুঝা যায় যে, দেবতাদেরও ভগবদ্ উপাসনায় অধিকার আছে।

৯। অপশূদ্রাধিকরণ—

সূত্র— শুগস্য তদনাদরশ্রবণাৎ তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি।। ১/৩/৩৪

সূত্র— ক্ষত্রিয়াত্বাবগতেশ্চ।। ১/৩/৩৫

সূত্র— উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ।। ১/৩/৩৬

সূত্র— সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ।। ১/৩/৩৭

সূত্র— তদভাবনির্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ।। ১/৩/৩৮

সূত্র— শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ।। ১/৩/৩৯

সূত্র— স্মৃতেশ্চাস্য ॥ ১/৩/৪০

তারপর প্রশ্ন উপস্থিত হইল যে, সমাজে যাহারা জাতিতে নীচ শূদ্রাদি তাহাদের ব্রহ্মোপাসনার অধিকার আছে কি না? এই অধিকরণের নাম অপশূদ্রাধিকরণ। ১/৩/৩৪ সূত্র হইতে স্মৃতেশ্চাস্য ১/৩/৪০ সূত্র পর্যন্ত শূদ্রের অধিকার লইয়া আলোচনা হইয়াছে। সূত্রগুলির অর্থ উচ্চারণমাত্র বুঝা যায় না। ভাষ্যকারগণ যাহা বলিয়াছেন সংক্ষেপে তাহা আলোচনা করিতেছি—

আচার্য রামানুজ মতে শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই— "ন শূদ্রাধিকারঃ সম্ভবতি, কুতঃ? সামার্থ্যাভাবাৎ অসামর্থ্যং চ বেদাধ্যয়নাভাবাৎ।"

শূদ্রের উপনয়ন হয় না। উপনয়ন সংস্কার না হইলে বেদাধ্যয়নের অধিকার হয় না। বেদাধ্যয়ন না থাকিলে ব্রহ্মবিদ্যালাভ সম্ভব হয় না।"

আচার্য শঙ্করও বলিয়াছেন, শূদ্রের বেদাধিকার নাই। সুতরাং বেদপাঠপূর্বক তাহাদের জ্ঞান জন্মিতে পারে না। তবে ইতিহাস-পুরাণাদির সহায়তায় তাহাদের জ্ঞান লাভ হইতে পারে। জ্ঞান হইলেই ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারে। বিজ্ঞানভিক্ষু শঙ্কর-মতাবলম্বী হইলেও তিনি একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন, 'জ্ঞানস্যৈকান্তিকফলত্বাৎ' — অর্থাৎ জ্ঞান কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে।

স্বয়ং বেদ কি বলেন? যজুর্বেদের ২৬/২ মন্ত্রটি দেখুন—

"যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ। ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্যায় চ স্বায় চারণায় চ। প্রিয়ো দেবানাং দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ ভূয়াসময়ং। মে কামঃ সমৃদ্ধ্যতামুপমাদো নমতু॥" (শুক্ল যজুঃ, ২৬/২)

আচার্য দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁহার 'সত্যার্থ-প্রকাশ' গ্রন্থে উপরোক্ত মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ এইরূপ করিয়াছেন,—

"ভগবান্ বলিতেছেন, আমি যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও তাহাদের আপন আপন স্ত্রী, আত্মীয়, সেবকাদি এবং অনাত্মীয় শত্রু প্রভৃতি— অর্থাৎ সকল মানবকেই সমভাবে এই হিতকারিণী বেদবাণীর উপদেশ দান করিয়াছি এবং উহা দান করিয়া বিদ্বান্‌গণের প্রিয় হইয়াছি— তোমরাও সেইরূপ হও। বেদবিদ্যা আপামর সাধারণের মধ্যে প্রচাররূপ আমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক এবং বেদবেত্তা বলিয়া সর্ববিদ্যায় জ্ঞানহেতু আমি যে সুখভোগ করি তোমরাও সেইরূপ বিদ্যার লাভ

ও প্রচার দ্বারা সেই সুখ উপভোগ কর।"

এই বাক্যে বুঝা যায় যে, বেদের যুগে সকলের বেদে অধিকার ছিল। পরবর্তিকালে সমাজের অনেক লোক যখন কদাচারী হইয়া গেল তখন তাহাদিগকে শূদ্র আখ্যা দিয়া অনধিকারী করা হইয়াছে। যাহারা ব্রহ্মচর্য রক্ষায় অক্ষম তাহারা ভ্রষ্ট চরিত্র হয়, মেধাহীন হয়। বেদমন্ত্র উচ্চরণ করিবার যোগ্যতা তাহারা হারাইয়া ফেলে। স্বরগ্রাম সম্বন্ধে যাহার কোন জ্ঞান নাই, তাহার যেমন সঙ্গীতে অধিকার থাকিতে পারে না, সেইরূপ ব্রহ্মচর্য-তপস্যাহীন ব্যক্তি বেদে প্রবেশ করিতে পারে না। যাহারা বেদে প্রবেশে অযোগ্য তাহাদিগকে শূদ্র আখ্যা দিয়া—তাহাদিগকে একটি জাতিতে পরিণত করিয়া, পরে তাহাদের সন্তানদের অযোগ্য করা হইয়াছে। এইরূপ একটা কিছু ঘটিয়া থাকিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিন বর্ণেরই উপনয়ন সংস্কার হইতে পারে ও বেদে অধিকার হয়। কিন্তু স্মৃতিকারদের কঠোরতায় বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই জাতিই আছে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাহারা তথাকথিত ব্রাহ্মণ তাহারাও উপনয়নের বিধিবিধান মানে না। গায়ত্রী জপ করে না। ফলে সমগ্র বাঙালীজাতি বেদচর্চাহীন হইয়া অধঃপাতের পথে দ্রুত ছুটিয়াছে। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা এই জাতির একটি মহা অভিশাপ। এ সম্পর্কে ছান্দোগ্যশ্রুতির একটি মূল্যবান আখ্যায়িকা আলোচনা করা প্রয়োজন। ব্রহ্মজ্ঞ রৈক্কদেবের কাছে জানশ্রুতি গিয়াছিলেন ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির আশায়। সঙ্গে লইয়াছিলেন সুন্দরী কন্যা, বিস্তর সুবর্ণ ও অনেক গাভী। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তাঁহাকে দেখিয়াই কঠোর ভাবে 'শূদ্র' বলিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করেন। পরে আবার তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করেন। আগে শূদ্র বলিয়া গালি দিয়া তারপর ব্রহ্মবিদ্যা দেওয়ায় বেশ বুঝা যায় শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে।

যাঁহারা বলেন, শূদ্রের অধিকার নাই, তাঁহারা ব্যাখ্যা করেন যে, জানশ্রুতিকে শূদ্র বলিবার কারণ এই যে, শোকযুক্ত 'শুচ্' ধাতুর উত্তর 'র' প্রত্যয় করিয়া শূদ্র শব্দ নিষ্পন্ন। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হয়, যিনি শোকান্বিত, হর্ষ শোকাদি দ্বন্দ্বের যিনি অতীত নহেন, তিনিই শূদ্র। জানশ্রুতি তখন শোকার্ত ছিলেন। তাছাড়া কন্যা, স্বর্ণ, গাভী উৎকোচ (ঘুষ) দিয়া যে ব্রহ্মবিদ্যা আদায়ের চেষ্টা ইহাও একপ্রকার শূদ্রত্ব।

আমাদের বক্তব্য এই যে, 'শূদ্র' শব্দটির একটি অর্থই গ্রহণ করিতে

হইবে, সেটি হয় গুণদোষগত অথবা জন্মগত। সুবিধামত এক এক সময় এক একটা অর্থ ধরিব ইহা সমীচীন নহে। জানশ্রুতির বেলায় ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিব, আর অমুক ঘোষের বেলায় জন্মগত অর্থ ধরিব, ইহা শাস্ত্রার্থ লইয়া চতুরতা মনে হয়।

শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধুর লীলাজীবনের মধ্যে একটি কাহিনী আছে। তিনি দুইদল ভক্ত সঙ্গে করিয়া নবদ্বীপ ধামে গিয়াছিলেন। একদল কায়স্থ আর একদল বাগদী। ভক্তগণ অন্নপ্রসাদ গ্রহণে দুই পংক্তি করিয়া বসিয়াছেন। তাহার মধ্যে দিয়া একদল বাগদীভক্ত জল আনিবার জন্য হাঁটিয়া গিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ কায়স্থগণ "জাত গেল, জাত গেল" বলিয়া ক্রুদ্ধভাবে আহার পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া যান। বাগদী ভক্তেরা বিশেষভাবে ক্ষুন্ন হন।

প্রভুজগদ্বন্ধুর কাছে বিচার প্রার্থনা করা হয়। প্রভু বিচারকের আসনে বসিয়া কায়স্থগণের কর্তা গোপাল মিত্রকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের যে জাতি গেল— সেই জাতিটা কি প্রকার বস্তু ? তাহা কতদূর যাইতে পারে ? তাহাকে কি ডাকিয়া ফিরান যায় না ? ইত্যাদি।
গোপাল মিত্র কোন জবাব দিতে পারেন না।

প্রভু তখন বলেন, জাতিভেদ একটা মিথ্যা কুসংস্কার। তবে আমি একটি জাতি মানি, তার নাম মানবজাতি। মানবজাতির মধ্যে দুইভাগ— মহাজাতি আর অপজাতি। যাঁহারা হরিভক্ত তাঁহারা মহাজাতি, যারা ভজনহীন তারা অপজাতি। মহাজাতির সঙ্গ পাইলে অপজাতিরা মহাজাতি হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু অপজাতি কখনও মহাজাতির জাতি নষ্ট করিতে পারে না। তোমরা ভক্তের জাতিবুদ্ধি করিয়া মহা অপরাধ করিয়াছ। তাহাতে বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধাঠাকুরাণী ব্যথিতা। তাঁহার ব্যথা দূর করিবার জন্য আমার দুইদিন নিরম্বু উপবাস, শাস্তিবিধান। প্রভু জগদ্বন্ধু দুইদিন জলস্পর্শ না করিয়া উপবাসী রহিলেন। ভক্তগণের কান্নাকাটিতেও জল গ্রহণ করিলেন না।

ভাগবতশাস্ত্র জন্মগত জাতিভেদ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, বহুগুণশালী ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভক্তিমান চণ্ডাল গরীয়ান্।

"বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্গুণজুতাদরবিন্দনাভপদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।"

ব্রাহ্মণোচিত দ্বাদশটি গুণযুক্ত ব্যক্তি যদি কমলাক্ষ কৃষ্ণপদারবিন্দে

বিমুখ হয়, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা শূকরভোজী চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ, যদি সে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিমান হয়।

যাহা হউক এই সকল বেদ-বেদান্ত নিবন্ধের প্রাসঙ্গিক বিষয় নহে। সূত্র মধ্যে দেবতাধিকার ও শূদ্রাধিকার এই দুই প্রসঙ্গ যেন অবাঞ্ছিত প্রবেশ করিয়াছে।

আবার **প্রামিতাধিকরণ** (৬) বলিতেছেন—

সূত্র— কম্পনাৎ।। ১/৩/৪১

কঠশ্রুতিতে 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং' (২/৩/২) এই মন্ত্রের ভিত্তিতে "কম্পনাৎ" সূত্র। বিশ্বসংসার চলিতেছে তাঁহার কম্পনে। শ্রুতিমন্ত্রে আছে 'ভয়াৎ'। ভাগবতের একটি শ্লোকেও আছে 'ভয়াৎ'— কিন্তু সূত্রকার 'ভয়াৎ' না বলিয়া সূত্র করিতেছেন "কম্পনাৎ"।

ভাগবতের শ্লোকটি এই রূপ,

"মদ্ভয়াৎ বাতি বাতোঽয়ং সূর্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ।

বর্ষতীন্দ্রো দহত্যাগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ।।"(ভাগবত, ৩/২৫/৪২)

'ভয়াৎ' আর 'কম্পনাৎ' ঠিক এক কথা নয়। ভয়ে কম্পন হইতে পারে কিন্তু কম্পন শব্দের অর্থ পরিস্পন্দন। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় vibration। সমগ্র বিশ্বজগৎটি অনবরত স্পন্দিত হইতেছে, vibrate করিতেছে। রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ সর্বত্রই স্পন্দন। লাল নীল বর্ণমালা, সা-রে-গা-মা প্রভৃতি সুরঝঙ্কার, চন্দ্র সূর্যের আলো, অগ্নিকণা, সর্বত্রই স্পন্দন। চন্দ্র সূর্য গ্রহ সকলই ছুটিতেছে। অহর্নিশ স্পন্দিত হইতেছে। এই বিশ্বময় পরিস্পন্দনের হেতুটি কি ? বিচার-বুদ্ধি দ্বারা কেহই বলিতে পারে না। তিনি কৃপা করিয়া জানাইলেই তাঁহার কথা জানিতে বুঝিতে পারা যায়। কৃপাশক্তি-প্রসূত বেদান্তসূত্র জানাইতেছেন — 'কম্পনাৎ'।

অনাদি সৎস্বরূপ পরব্রহ্মের হৃদয়ে জাগ্রত হইল ইচ্ছা, আমি বহু হইব। "বহু স্যাং প্রজায়েয়"। এইটি বিশ্বের প্রথম স্পন্দন— মূলস্পন্দন। তাঁহার ইচ্ছশক্তির মধ্যেই পরিস্পন্দন নিহিত আছে। এই প্রথম স্পন্দন হইতেই তার প্রতিক্রিয়া বা প্রকাশ হইল মহাবিশ্বময় পরিস্পন্দন রূপে। এই প্রথম ইচ্ছাশক্তির প্রথম স্পন্দন হেতু নিখিল ব্রহ্মাণ্ড আজ স্পন্দিত। বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে যেখানেই যাও সর্বত্র অল্পবিস্তর স্পন্দন আছে। এই স্পন্দনের মাধ্যমে বিশ্বজগৎ স্পন্দিত। 'কম্পনাৎ' সূত্রে এই নিখিল বিশ্বজগতের মূল স্পন্দনটির কথা বলিতেছেন। এই

সূত্রের কোন পূর্বপক্ষ নাই। কোন সংশয় নিরসনের জন্য প্রয়াস নাই। অনন্ত জগৎ একটা জগৎ— এই জগৎপ্রকাশের মূলে শ্রীহরির স্পন্দনাত্মক শক্তি। ইহার আদিমূল— "আমি বহু হইব" এই কম্পন বা পরিস্পন্দন।

সূত্র— **জ্যোতির্দর্শনাৎ** ।। ১/৩/৪২

এই অঙ্গুষ্ঠ সদৃশ পুরুষ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাঁহার জ্যোতিঃতে নিখিল জগৎ উদ্ভাসিত। ভাগবত (২/৫/১১) বলিয়াছেন,

"যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহম্।"

যে জ্যোতিঃ নিজেকে প্রকাশ করে ও বিশ্বজগৎকে উদ্ভাসিত করে সে নিশ্চয়ই পরমাত্মা। সুতরাং অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ পরমাত্মাই। ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে ৮/১৪/১ মন্ত্রে— "আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম তদমৃতম্ স আত্মা।"

১০। **অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাধিকরণ**—

এই মন্ত্রে আকাশ শব্দের অর্থ কি— ভূতাকাশ না চিদাকাশ? উত্তর দিতেছেন সূত্রে—

সূত্র— **আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ** ।। ১/৩/৪৩

আকাশ শব্দের অর্থ পরমাত্মাই। আকাশ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে প্রকৃতি ও নামরূপের তিনি নির্বাহক। ইহাতে বুঝা গেল যে, তিনি প্রকৃতির উর্ধ্বে অর্থাৎ প্রকৃতির নির্বাহক এবং তিনি লৌকিক নামরূপ রহিত। সুতরাং আকাশ পরব্রহ্মই।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে প্রশ্ন উঠিয়াছে, 'কতম আত্মেতি' — আত্মা কোন্‌টি?

উত্তর দিয়াছেন — "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ।" (বৃহদারণ্যক, ৪/৩/৭) প্রাণের মধ্যে, হৃদয়ের মধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপ বিজ্ঞানময় পুরুষ তিনি আত্মা।

তারপর বলিয়াছেন, আত্মা সুষুপ্তি অবস্থায় পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া যায়। বাহির-ভিতর ভাব আর থাকে না।

এই শ্রুতিতে অদ্বৈতের কথা, জীবাত্মা পরমাত্মার ভেদশূন্যতার কথা আছে। এস্থলে সংশয় এই, যখন দুই শেষ পর্যন্ত একই— তখন আকাশরূপী নামরূপের নির্বাহক বলিলে দোষ কি?

উত্তর বলিতেছেন, দোষ আছে—

সূত্র— সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥ ১/৩/৪৪

সুষুপ্তিকালে জীবাত্মা পরমাত্মা কি একই, ভেদশূন্য? উত্তর দিতেছেন, না, ভেদশূন্য নহে। সুষুপ্তিকালে বা উৎক্রান্তিকালেও জীবাত্মা পরমাত্মা এক নহে। অতএব মুক্ত জীবও পরমাত্মা নহে।

সূত্র— পত্যাদিশব্দেভ্যশ্চ ॥ ১/৩/৪৫

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে তাঁহাকে সর্বস্যাধিপতি বলা হইয়াছে। 'সর্বস্য বশী', 'সর্বস্যেশান' বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, জীব কখনও এমনকি মুক্তাবস্থায়ও পরমাত্মা হইতে পারে না।

প্রথম অধ্যায় তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

ব্রহ্মসূত্র

প্রথম অধ্যায় : চতুর্থপাদ

১। আনুমানিকাধিকরণ—

সূত্র— আনুমনিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন শরীররূপকবিন্যস্ত-গৃহীতের্দর্শয়তি চ।। ১/৪/১

সূত্রের আলোচ্য বিষয় কঠশ্রুতির একটি মন্ত্রের একটি শব্দ। মন্ত্রটি এই—

"মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।।" (কঠ, ১/৩/১১)

এই মন্ত্র মধ্যে একটি শব্দ আছে 'অব্যক্ত'। এই শব্দটির তাৎপর্য লইয়া আলোচনা। অব্যক্ত শব্দটি সাংখ্যদর্শনের পরিভাষা। সাংখ্যের মহতত্ত্বের আর একটি অভিধা। মহৎতত্ত্বকে প্রধানও বলা হয়, অব্যক্তও বলা হয়। মহৎ হইতে অব্যক্ত বড়, অব্যক্ত হইতে পুরুষ বড়। পুরুষ হইতে আর বড় কেহ নাই। পুরুষই অন্তিম সীমা। পুরুষই চরম গতি। কঠ শ্রুতির এই মন্ত্রের এইরূপ তাৎপর্যই মনে হয় আপাতত। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে অব্যক্ত শব্দ সাংখ্যেরই প্রধান। বেদের কোন কোন শাখার মত এইরূপই। এই কথা বললে বেদান্ত উত্তর দিতেছেন, না, একথা ঠিক নহে। কারণ, 'শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতেঃ', অর্থাৎ রূপক দ্বারা বর্ণিত শরীর-বিন্যাস হেতু।

কঠশ্রুতির উপরোক্ত ১/৩/১১ মন্ত্রের পূর্বে দুইটি শ্লোকে একটি রূপক বর্ণনা আছে—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।

বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।।

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।

আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ।।" ১/৩/৩৪

আত্মা রথী, শরীর রথ, বুদ্ধি সারথি, মন লাগাম, ইন্দ্রিয়গুলি অশ্ব, শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ ইন্দ্রিয়ের বিষয়, আত্মা ইন্দ্রিয় ও মন— এই তিনি মিলিতভাবে ভোক্তা।

এই স্থলে রথরূপে বর্ণিত শরীরকেই অব্যক্ত বলা হইয়াছে। ব্যক্ত

শরীরকে অব্যক্ত কেন বলিবেন তার উত্তর দিয়াছেন পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— **সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ**।। ১/৪/২

সূক্ষ্ম শরীর অব্যক্ত। সূক্ষ শরীরই জীবাত্মার সঙ্গে অনুগমন করিয়া থাকে। রথ প্রায়োজন রথীর। সেইরূপ জীবাত্মার প্রয়োজন সূক্ষ্ম দেহের। সূক্ষ্ম শরীরই অব্যক্ত শব্দের অর্থ। সাংখ্যোক্ত প্রধান নহে। কথাটি স্পষ্ট হইল না। পরবর্তী সূত্রে স্পষ্টতর করিতেছেন—

সূত্র— **তদধীনত্বাদর্থবৎ**।। ১/৪/৩

বেদান্ত মত ও সাংখ্য মতের প্রকৃত পার্থক্য এই যে বেদান্ত মতে শরীর ও আত্মা দুই পরমাত্মার অধীন। সাংখ্য মতে পুরুষ ও প্রকৃতি দুইই স্বাধীন। কেহ কাহারও অধীন নহে। কেহ পরমাত্মারও অধীন নহে। সাংখ্যের অব্যক্ত বা প্রকৃতি জগতেব উপাদান কারণ— পরমাত্মার অধীন নয়।

বেদান্তের অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম-শরীর পরমাত্মার অধীন। সাংখ্য পরমাত্মা বস্তুকে স্বীকার করে না। সুতরাং অধীনতার কোন প্রসঙ্গই নাই। সাংখ্য দুইটি তত্ত্ব, পুরুষ আর প্রকৃতি। বেদান্তে তিনটি তত্ত্ব— ঈশ্বর, পুরুষ এবং প্রকৃতি। গীতার ভাষায় এই পুরুষ জীবশক্তি পরা প্রকৃতি। আর প্রকৃতি বা প্রধান অপরা প্রকৃতি। দুই প্রকৃতিই শ্রীকৃষ্ণের। গীতার ভাষা—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।।" (গীতা, ৭/৪-৫)

আর একটি সূত্র দ্বারা সাংখ্য ও বেদান্তের অব্যক্তের পার্থক্য দেখাইতেছেন—

সূত্র— **জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ**।। ১/৪/৪

সাংখ্য মতে, 'গুণপুরুষাণ্যতা প্রত্যয়াৎ কৈবল্যম্,— পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞান দ্বারা কৈবল্য লাভ হয়। কিন্তু বেদান্তে অব্যক্তকে জ্ঞেয় বলেন নাই। 'জ্ঞেয়ত্ব অবচনাৎ'। কঠোপনিষদে যে অব্যক্তের কথা উল্লেখ আছে তাহার জ্ঞেয়ত্ব অর্থাৎ তাহাকে জানিতে হইবে এমন কথা শ্রুতিতে কোথাও বলা হয় নাই। সুতরাং সাংখ্যের প্রধান হইতে উপনিষদের বর্ণিত অব্যক্ত পৃথক্ ইহা ঠিক জানা গেল।

সংশয় জাগিতেছে এই যে, কঠশ্রুতির (১/৩/১৫) মন্ত্রে—

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।।"

মনে হয় এই মন্ত্রে অব্যক্তেরই উপাসনা কথা বলা হইয়াছে। অশব্দ প্রভৃতি বিশেষণগুলি সবই সাংখ্যোক্ত প্রধানে পাওয়া যায়। উত্তর দিতেছেন পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— **বদতীতি চেন্ন, প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ।।** ১/৪/৫

এই কথা যদি বল উত্তরে বলিব— না, উহা অব্যক্তের বিশেষণ নহে। প্রাজ্ঞ বা পরমাত্মার বিশেষণ।

কি করিয়া জানিলে ? কারণ, প্রকরণটি পরমাত্মারই।

"বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।।"

(কঠ, ১/৩/৯)

উক্ত মন্ত্রে প্রাপ্যবস্তু যে বিষ্ণুর পরম পদ তাহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। সুতরাং প্রকরণটি ব্যপনশীল বিষ্ণু বা পরমাত্মার। অশব্দাদি বিশেষণ গুলিও পরমাত্মারই। প্রধানের নহে।

তাছাড়া শ্রুতির আসল প্রস্তাবই হইল যম-নচিকেতা সংবাদ। নচিকেতা যমরাজের নিকট তিনটি বিষয় জানিতে চাহিয়াছেন, তন্মধ্যে অব্যক্তের কোন আভাসও নাই। সুতরাং যাহা প্রশ্নকারী নচিকেতা জানিতে চাহিয়াছেন, তদ্ভিন্ন অন্য কথা উত্তরদাতা যম বলিবেন কেন ? এই বিষয়ে সূত্র—

সূত্র— **ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ।।** ১/৪/৬

তিনটি বিষয়ঃ (১) নচিকেতার পিতার চিত্তের অপ্রসন্নভাব দূরীকরণ (২) স্বর্গলাভ-সাধন অগ্নিবিদ্যার উপদেশ (৩) আত্মবিষয়ক জ্ঞানোপদেশ— মৃত্যুর পর আত্মার গতি কি ? প্রধান সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই নাই। সুতরাং নচিকেতার প্রশ্নের জবাবে অব্যক্ত শব্দ থাকিলেও উহা সাংখ্যের প্রধানবাচী হইতে পারে না।

পরবর্তী সূত্রে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটি বলিতেছেন—

সূত্র— **মহদ্বচ্চ।।** ১/৪/৭

মহত্ত্বর ন্যায়। "মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ"— কঠশ্রুতির (১/৩/১০) মন্ত্রের মহান্ অর্থ যেরূপ সাংখ্যের মহৎতত্ত্ব বুঝায় না সেইরূপ অব্যক্ত শব্দেও প্রধানকে বুঝইবে না। মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহান আত্মা শ্রেষ্ঠ, এই বাক্যের মহৎ শব্দে

সাংখ্যের মহৎতত্ত্ব বুঝায় না। সেই প্রকার অব্যক্ত শব্দে প্রধান লক্ষিত নহে। সাংখ্যের পরিভাষা যখন বেদান্তে প্রযুক্ত হইয়াছে তখন তাহাকে শব্দ হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে, পরিভাষা রূপে নহে।

মহৎতত্ত্ব, প্রধান এগুলি সাংখ্যশাস্ত্রের পরিভাষা। বেদান্ত ঐ সব শব্দকে আভিধানিক অর্থেই ধরিয়াছে। সাংখ্যের অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধান জড় বস্তু। বেদান্তের অব্যক্ত পরমাত্মা সুতরাং চিন্ময় বস্তু। এক-কে অপর বলিয়া সন্দেহের কোন কারণ নাই।

২। **চমসাধিকরণ**——

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে ৪/৫ মন্ত্রে——

"অজমেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ।।"

নিজের মত বহু সন্তানের প্রসবকারিণী লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণা এক জন্মরহিতা প্রকৃতি আছেন। আর দুইজন অজ আছেন। তন্মধ্যে একজন বদ্ধজীব, সেবাপরায়ণ হইয়া তাহাকে পুনঃপুনঃ ভোগ করেন। আর একজন মুক্তজীব, ভোগান্তে তাহাকে ত্যাগ করেন।

এই মন্ত্রটি সাংখ্য দর্শনের ভিত্তি। সত্ত্ব-রজ-তম তিন গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি। এই প্রকৃতির পরিণাম হইতেই বিশ্বজগৎ। যদি এই কথা সত্য হয় তাহা হইলে ব্রহ্মই জগৎকারণ একথা থাকে না। চমসাধিকরণের প্রথম মন্ত্র——

সূত্র— চমসবদবিশেষাৎ।। ১/৪/৮

জানাইতেছেন উক্ত ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি অচেতনা। অচেতনা প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলা শ্রুতির উদ্দেশ্য নয়। অজা শব্দের অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। অজা শব্দ বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ২/২/৩ মন্ত্রে উক্ত চমস শব্দের ব্যবহারের মত। চমস বলিলে লৌকিক চামচ্ বুঝায়। কিন্তু বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে চমস অর্থ "অর্বাগ্‌বিলশ্চমস ঊর্ধ্ববুধ্নঃ"——অধঃ গভীর ও ঊর্ধ্ব উচ্চ-চমস্, উক্ত মন্ত্রেও অজা শব্দের অর্থ প্রকৃতি নহে, উহা ব্রহ্মাত্মক। ব্রহ্ম সর্ব কারণের কারণ, তাঁহার কোন কারণ নাই, তিনি অজা। প্রকৃতি ব্রহ্মের শক্তি। উহা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ভাগবত বলিয়াছেন, বসুদেব যখন বাহিরে যাইতে

ইচ্ছা করিতেছেন তখন অজা যোগমায়া, নন্দজায়া যশোদায় জন্মগ্রহণ করিলেন—

"যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া।"

(ভাগবত, ১০/৩/৪৭)

অজা অর্থ লীলাশক্তি যোগমায়া।

চণ্ডীও বলিয়াছেন, মহামায়া হরেঃ শক্তিঃ। অজা ভগবানের শক্তি। অজা প্রকৃতিবাচী নয়, পরমাত্মবাচী।

পরবর্তী সূত্রে অজা যে পরমাত্মা হইতে জাত তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন—

সূত্র— জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা হ্যধীয়ত একে।। ১/৪/৯

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির চতুর্থ অধ্যায় প্রথম মন্ত্রে 'স দেব স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু' এই বাক্যে তাহাকে দ্যোতনস্বভাব 'দেব' বলিয়াছেন ও ৪/১০ মন্ত্রে—

"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।"

এই মন্ত্রে প্রকৃতি মায়া ও মহেশ্বর পরমাত্মা। এই বাক্যে অজা যে ব্রহ্মশক্তি ইহা সহজেই বোধগম্য হয়। সুতরাং উপক্রম জ্যোতিঃরূপ দেব ও উপসংহারে 'অবয়বভূতেঃ ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ' এই বাক্যের সকল সন্দেহ দূর হয়। ভাগবত ব্রহ্মকে অনন্তশক্তি বলিয়াছেন—

"জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অগুণায়াবিকারায় নমস্তেঽপ্রাকৃতায় চ।।"

(ভাগবত, ১০/১৬/৪০)

পরমাত্মার অনন্তশক্তি। এই শক্তিই জগতের কারণ, প্রকৃতি নহে। প্রকৃতিকে অজা বলা হইয়াছে আবার জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মোৎপন্নত্বও বলা হইয়াছে। এই দুটি একবারে কিরূপে সম্ভব তাহার উত্তর দিয়াছেন পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ।। ১/৪/১০

'কল্পনা' শব্দ 'কৃপি' ধাতু হইতে উদ্ভূত। ঐ ধাতুর অর্থ সৃষ্টি। কল্পনং অর্থ জগৎসৃষ্টি।

শক্তির দুইটি অবস্থা—কারণাবস্থা ও কার্যাবস্থা। কারণাবস্থায় শক্তি অনভিব্যক্ত, কার্যাবস্থায় অভিব্যক্ত। কারণাবস্থায় তিনি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন তাই অজা। আর কার্যাবস্থায় প্রকাশিতা তাই "জ্যোতিরুঃপক্রমা" অর্থাৎ ব্রহ্মসম্ভবা। দৃষ্টান্ত দিয়াছেন ছান্দোগ্য-শ্রুতির মধুবিদ্যা হইতে

৩/১/১ মন্ত্রে 'আদিত্যো দেবমধু'। বাস্তবিক আদিত্য মধু নহে, তবে কার্যাবস্থায় মধুর ন্যায় উপভোগ্য। এই জন্য দেবমধু বলায় দোষ হয় নাই।

৩। সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণ—

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে ৪/৪/১৭ মন্ত্র—

"যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ।।
তমেবমন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্।।"

পাঁচটি পাঁচজন ও আকাশ যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জানিবে। এই ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন।

এই পাঁচটি পাঁচজন কথার তাৎপর্য কি এবং কি নহে তাহার জন্য পরবর্তী দুইটি সূত্র—

সূত্র— ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ।। ১/৪/১১

সূত্র— প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ।। ১/৪/১২

পঞ্চপঞ্চ শব্দে পঞ্চবিংশতি বুঝাইলেও তাহা গ্রহণীয় নহে। তদতিরিক্ত আকাশ ও আত্মাকে পৃথক্‌রূপে গ্রহণ করায় তত্ত্ব সাতাইশটি হইয়া যায়। সুতরাং এই পঞ্চপঞ্চ শব্দে সাংখ্যদর্শনের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বুঝাইবে না। কি বুঝাইবে ? প্রাণাদি পাঁচটি তত্ত্বকে বুঝাইবে। প্রাণাদি পাঁচটি বস্তু কি ?

"প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ অন্নস্য অন্নং মনসো যে মনো বিদুঃ।" (বৃহদারণ্যক, ৪/৪/১৮)
প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, ভোগ্যবস্তুর ভোগ্য, মনের মন, বলিয়া ব্রহ্মবস্তুকে জানিবে।

এই শ্রুতি হইতে পঞ্চপঞ্চজন অর্থ প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, অন্ন ও মন।

পাণিনির সূত্রে আছে, "দিক্‌সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্"— দিক্ বাচক ও সংখ্যা বাচক শব্দের সংজ্ঞা বুঝাইতে কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন, "সপ্তর্ষয়ঃ সপ্তঃ" বলিলে প্রত্যেক ঋষিকেই সপ্তর্ষি সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়া থাকে। সেইরূপ "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" বলিলেও প্রত্যেকটি পঞ্চজনসংজ্ঞক। অতএব প্রাণাদি পাঁচটি পদার্থই পঞ্চজন সংজ্ঞক।

বেদের অনেক শাখা আছে। ভিন্ন ভিন্ন শাখীদের পাঠের কিছু কিছু ভিন্নতা আছে। যে পাঁচটিকে পঞ্চজন বলা হইল তাহা মাধ্যন্দিন শাখাতে

মিলিবে কিন্তু ঐ মন্ত্রের কাণ্বশাখীদের পাঠ অন্যরূপ। তাঁহাদের পাঠ অন্নস্য অন্নং এই কথাটি নাই। তাহা হইলে পথ মিলিবে কিরূপে? তাহার উত্তর দিয়াছেন পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে।। ১/৪/১৩

যেখানে অন্ন পাঠ নাই সেখানে পূর্বমন্ত্রের "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" বাক্য দ্বারা মিলাইতে হইবে। ৪/৪/১৮ মন্ত্রে অন্ন আছে। ৪/৪/১৬ মন্ত্রে "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" আছে। যেখানে অন্ন পাঠ নাই সেখানে 'জ্যোতিঃ' দ্বারা পঞ্চপাঠের সঙ্গতি হইবে।

৪। কারণত্বাধিকরণ—

পরব্রহ্মই জগতের একমাত্র কারণ—এই কথা পুনঃপুনঃ স্থাপন করা হইয়াছে বিভিন্ন সূত্রে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত করিতে বাধা হয় শ্রুতিতে বহু প্রকারের কারণের কথা দৃষ্ট হয়। যথা,

(১) "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ।" (তৈত্তিরীয়, ২/১/৩)

(২) "সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ।" (ছান্দোগ্য, ৬/২/১) হে সোম্য, এই জগৎ অগ্রে সৎরূপেই ছিল।

(৩) "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত।" (তৈত্তিরীয়, ২/৭/১)

(৪) "অসদেব ইদমগ্র আসীৎ। তৎ সদাসীৎ।" (ছান্দোগ্য, ৩/১৯/১) এই জগৎ অগ্রে অসৎই ছিল। তাহা হইতে সৎ হইল।

(৫) "সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে।" (ছান্দোগ্য, ১/১১/৫) স্থাবর জঙ্গম সমস্তই প্রাণে বিলীন ছিল। উৎপত্তিকালে প্রাণ অবলম্বনে উৎপন্ন হয়।

(৬) "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীত্তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত।" (বৃহদারণ্যক, ১/৪/৭)

এই জগৎ তখন অব্যাকৃত ছিল। সেই অব্যাকৃতই নামরূপে ব্যাকৃত হইল।

এই শ্রুতিমন্ত্রগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সৃষ্টিপ্রক্রিয়া কথিত হইয়াছে, সুতরাং ব্রহ্মই একমাত্র কারণ ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না। এইরূপ পূর্বপক্ষ হইলে পরবর্তী সূত্রে উত্তর দিতেছেন—

সূত্র— কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ।। ১/৪/১৪

যেখানেই জগৎকারণের কথা বলা হইয়াছে সর্বত্রই অবধারিত সত্যের উল্লেখ আছে। অবধারিত সত্য অর্থ সর্বজ্ঞত্ব সর্বশক্তিমত্ত্বাদি। যেখানে ব্রহ্ম শব্দ উল্লেখ আছে সেখানে তো পরিষ্কার; যেখানে উল্লেখ নাই সেই সকল স্থলেও জগৎকারণ বস্তু যে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ একথা প্রকাশ করা হইয়াছে। ওই বিশেষণে তিনি যে ব্রহ্ম ইহা সহজেই বোধগম্য হয়। সৎ, প্রাণ, অব্যাকৃত, প্রভৃতি হয় ব্রহ্মের বাচক অথবা ব্রহ্মের শক্তিতে শক্তিমান্। তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে মন্ত্রে অসৎ কারণ বলা হইয়াছে তাহাও সূক্ষ্ম কারণরূপে বুঝিতে হইবে। অসৎ অর্থে একান্ত অভাব নহে। অসৎ অর্থ সূক্ষ্ম। সৎ অর্থ স্থূল। ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে ৩/১৯/১ মন্ত্রে যেখানে অসৎ কারণ বলা হইয়াছে, তাহা বেদানুগত জগৎকারণ নহে। উহা এক বিরুদ্ধমতের উক্তি। শ্রুতি তাহাকে খণ্ডন করিয়া, সৎ-ই কারণ ইহা স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং পূর্বপক্ষ যে আপত্তি তুলিয়াছে তাহা মূল্যহীন।

আবার পূর্বপক্ষ—বলা হইল যেখানেই জগৎকারণের কথা হইয়াছে সেখানেই ব্রহ্মশব্দ উল্লেখ থাক বা না থাক, তাহার অর্থাৎ কারণের সর্বজ্ঞত্ব সর্বশক্তিমত্ত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতে আপত্তি এই যে যেখানে অসৎকে কারণ বলিয়াছেন, সেখানে অসতের সর্বজ্ঞত্ব সর্বশক্তিমত্ত্ব কথার অর্থই হয় না। তদুত্তরে সূত্রে বলিতেছেন—

সূত্র— সমাকর্ষাৎ।। ১/৪/১৫

সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সমাকর্ষণ হেতু। সমাকর্ষণ শব্দের অর্থ সম্পর্ক সম্বন্ধ। তৈত্তিরীয়শ্রুতি যেখানে অসতের কথা বলিয়াছেন সেখানেই তারপরেই বলিয়াছেন "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। ইদং সর্বং অসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।।" (তৈত্তিরীয়, ২/৬/৩)

কামনাপূর্বিকা জগৎসৃষ্টির কথা ও সৃষ্ট জগতে অনুপ্রেবেশের কথা বলায় তাঁহার সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিমত্ত্বের কথাই বলা হইল। তারপর অসৎ কথা থাকায়, অসৎই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান বোঝা গেল। অসৎ অর্থ সূক্ষ্মরূপ। সৎ অর্থ কার্য। অসৎ অর্থ কারণরূপ। নামরূপে অভিব্যক্ত জগৎপ্রপঞ্চ সৎ। তাহার কারণ অব্যাকৃত অবস্থা। তাহাই অসৎ শব্দবাচ্য। অসৎ অর্থ কারণরূপে, জীবরূপে ব্রহ্মে লীন। অতএব সর্বকারণের কারণ ব্রহ্মই—ইহাই সুসিদ্ধান্ত।

৫। জগদ্বাচিত্বাধিকরণ—

কৌষীতকি শ্রুতিতে রাজা অজাতশত্রু পণ্ডিতাভিমানী বালাকিকে

বলিতেছেন—

"ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি। স হোবাচ। যো বৈ বালাক এতেষাং পুরুষাণাং কর্তা যস্য বৈ তৎ বৈ কর্ম স বেদিতব্য ইতি।" (কৌষীতকি, ৪/১৮)

বালাকি রাজা অজাতশত্রুকে বলিয়াছিলেন, আগে তোমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিব। বালাকি পরপর ষোল জনকে ব্রহ্ম বলিয়া বলিয়াছেন। অজাতশত্রু প্রত্যেককে অব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। তখন অজাতশত্রু বালাকিকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতেছেন—

"আপনি যাহাদিগকে পুরুষ বলিয়াছেন তাঁহাদের যিনি কর্তা ও এই বিশ্বজগৎ যাঁহার কর্ম তিনি ব্রহ্ম। তাঁহাকেই জানিতে হইবে।"

অজাতশত্রু কথিত এই ব্রহ্ম কি সাংখ্যের পুরুষ, না পরমাত্মা? এইরূপ সংশয়ের উত্তর দিতেছেন, সাংখ্যের পুরুষ ভোক্তা, কখনো কর্তা নহেন। সাংখ্যের পুরুষের কর্মও এই জগৎ নহে।

সূত্র— জগদ্বাচিত্বাৎ।। ১/৪/১৬

তিনি এই জগতের কর্তা এবং এই জগৎ যাঁহার কর্ম তিনি পরমাত্মাই।

"যত্র যেন যতো যস্য যস্মৈ যদ্ যদ্ যথা যদা।
স্বাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ।।
(ভাগবত, ১০/৮৫/৪)

কোনও কোনও স্থলে দেখা যায় ব্রহ্মতত্ত্বালোচনায় জীবের গুণ বা মুখ্যপ্রাণের গুণ বলা হইয়াছে। তখন বুঝিতে হইবে ব্রহ্মসত্তায় সকল সত্তাই আছে, জীবও আছে, মুখ্যপ্রাণও আছে, সুতরাং দোষ নাই। তাই সূত্র—

সূত্র— জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতম্।। ১/৪/১৭

এই সব কথা পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব সিদ্ধান্ত, কৌষীতকি উপনিষদে অজাতশত্রুর উপদেশের উদ্দেশ্য ব্রহ্মতত্ত্ব স্থাপনই। পরমাত্মায় জীবলিঙ্গ, মুখ্যপ্রাণের লিঙ্গ বা অন্য যাহা কিছু সবই থাকা সম্ভব।

এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত আছে।

জৈমিনি মুনি কি বলেন তাহা বলিতেছেন পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেক।। ১/৪/১৮

জৈমিনি মুনি বলেন, পরমাত্মা ছাড়া অন্য বস্তু প্রতিপাদনের জন্যই তিনি বলিয়াছেন—

অজাতশত্রু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন বালাকিকে, নিদ্রিত অবস্থায় পুরুষ কোথায় থাকে ?

বালাকি বলিলেন, আমি জানি না।

অজাতশত্রু বলিলেন, হিতা নামে নাড়ীতে হৃদয়কাশে থাকে।

সুতরাং উত্তরের তাৎপর্য জীবপর ; ব্রহ্মপর নহে। ইহা জৈমিনির মত।

আমরা বলিতে পারি, দহরাকাশ হৃদয়াকাশ তাহাও তো ব্রহ্ম। সুতরাং অজাতশত্রুর উত্তরে প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই এইরূপ বলা যায়।

৬। বাক্যান্বয়াধিকরণ—

বৃহাদারণ্যক শ্রুতিতে 'মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে' মৈত্রেয়ী বলিলেন, যাহা দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি তাহাই বলুন।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, "পতির প্রীতির জন্য পতি প্রিয় নয়, স্ত্রীর প্রীতির জন্য স্ত্রী প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই সকলে প্রিয় হয়। আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, নিদিধ্যাসন করিবে।" (বৃহদারণ্যক, ৪/৫/৭)

এই স্থলে সংশয়, এই আত্মা কি জীবাত্মা, না পরমাত্মা ? পতি-জায়া-পুত্র-বিত্তের সহিত সম্বন্ধ থাকায় জীবাত্মাই মনে হয়।

উত্তর দিতেছেন পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— বাক্যান্বয়াৎ ॥ ১/৪/১৯

আত্মা বলিতে জীবাত্মা নহে, পরমাত্মাই বাক্যের অন্বয়—অর্থাৎ ব্রহ্মপর তাৎপর্যহেতু আত্মা পদে পরমাত্মা পরব্রহ্মকেই বুঝাইবে।

প্রকরণের আরম্ভেই আছে— "অমৃতস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন" (৪/৫/৩)—বিত্তাদির দ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা নাই। সুতরাং যাহা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হইবে তাহাই প্রকরণের বিষয়। উপসংহারে বলিয়াছেন, "ইমে দেবা ইমে বেদা ইমানি ভূতানি ইদং সর্বং যদয়মাত্মা" (বৃহদারণ্যক, ৪/৫/৭)। ইহা দ্বা[illegible] [illegible]ঝা গেল এই আত্মা পরমাত্মাই। যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তির এই শেষাংশ লক্ষ্য করিয়াই আশ্মরথ্য মুনি বলেন—

সূত্র— প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ॥ ১/৪/২০

শ্রুতির প্রতিজ্ঞা আছে এক বিজ্ঞানে সকল বিজ্ঞান। যাঁহাকে জানিলে সব জানা হয়, অজানা বস্তুও জানা হয়, তিনি ব্রহ্ম। বাক্যশেষে "সর্বং যদয়মাত্মা" এই উক্তিতেই বুঝা গেল যে, আত্মা পরমাত্মাই।

ঋষি ঔড়ুলোমি বলেন—

সূত্র— উৎক্রমিষ্যত এবংভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥ ১/৪/২১

ঔড়ুলোমি বলেন, যে সাধক ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া দেহ ছাড়িয়া অথবা দেহাত্মবুদ্ধির উর্ধ্বে উঠিয়াছেন সর্ববস্তুতে আত্মদর্শন তাঁহারই হয়। ইহাতেও বুঝা গেল যে, যাজ্ঞবল্ক্য যে আত্মার কথা বলিয়াছেন, উহা পরমাত্মাই।

ব্রহ্মজ্ঞ সাধক সর্বত্রই পরমাত্মাকে দর্শন করেন। তাঁহার কাছে বিশ্বসংসার সমুদয় সুখময়। তিনি হন সর্বজনপ্রিয়।

আচার্য শঙ্কর মতে আত্মা দর্শন ও পরমাত্মার দর্শনে কোন পার্থক্য নাই। জীবাত্মা পরমাত্মায় কোন ভেদ নাই। জীবাত্মাকে যে জীবাত্মা মনে করা তাহা ঔপচারিক, যথার্থ নহে। ঘট দ্বারা পরিচ্ছিন্ন যে আকাশ আর বিশাল মহাকাশে কোনই পার্থক্য নাই। পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে ঘট, যাহা অনিত্য, অতএব মিথ্যা মায়াময়। জীবাত্মা পরমাত্মা দুইটি বস্তু নহে, একই। ভেদবুদ্ধি মায়াকল্পিত মাত্র।

আচার্য শঙ্করের একই কথা ভাষান্তরে কাশকৃৎস্ন ঋষি কহিয়াছেন পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥ ১/৪/২২

কাশকৃৎস্ন ঋষি বলেন যে, অবস্থান হেতু জীবাত্মা পরমাত্মা একই। অবস্থান অর্থ পরব্রহ্মে আশ্রয় রূপে অবস্থান হেতু। নদী যখন সমুদ্রকে আশ্রয় করে তখন নদীর নামরূপ সব ত্যাগ হইয়া যায়। সকল নদীর সাগরেই সমাশ্রয়। সকল জীবাত্মার পরমাত্মাই পরমা গতি। অতএব আত্মা পদে পরমাত্মাই লক্ষ্য।

ভাগবত বলিয়াছেন (১১/৯/১৭) "এক এবাদ্বিতীয়োঽভূদাত্মা-ধারোঽখিলাশ্রয়ঃ।" তিনি সকল আত্মার আধার। অখিলের আশ্রয় এক এবং অদ্বিতীয়।

৭। প্রকৃত্যধিকরণ—

'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলা হইয়াছে। কারণ দুই প্রকার, নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। ঘটের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার। উপাদান কারণ মাটি। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ হউন, উপাদান কারণ প্রকৃতি বলিলে দোষ কি ? এই রূপ সংশয়ের উত্তর দিতেছেন—

সূত্র— প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ।। ১/৪/২৩

যদি ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণ মাত্র হন তাহা হইলে উপাদান কারণ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন্ বস্তু হইবে ? ব্রহ্ম ছাড়া যদি অন্য বস্তুর অস্তিত্ব থাকে তাহা হইলে "ব্রহ্মকে জানা হইলে সব জানা হয়, অবিজ্ঞাত বস্তুও জ্ঞাত হওয়া যায়", ছান্দোগ্য-শ্রুতির এই প্রতিজ্ঞা (৬/১/৩) ভঙ্গ হইয়া যায়। সুতরাং ব্রহ্ম উপাদান কারণও বটেন। কুম্ভকারকে জানিলে মৃত্তিকাকে জানা হয় না। সুতরাং এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান এই আপ্তবাক্য হানি হয়। শ্রুতিবাক্য হানি হইতে পারে না।

তাছাড়া শ্রুতিতে যে দৃষ্টান্তগুলি দিয়াছে সবই উপাদান দৃষ্টে। একটি মাটির ঢেলাকে জানিলে সকল মৃন্ময় পাত্র জানা হয়, একটি নরুনকে জানিলে সমস্ত লৌহনির্মিত দ্রব্য জানা হয়, এই যে দৃষ্টান্তসকল শ্রুতি দিলেন সবই তো উপাদান কারণের দিকে লক্ষ্য করিয়া। সুতরাং ব্রহ্মই জগতের উপাদান, প্রকৃতি নহে। যদি প্রকৃতিকে ব্রহ্মের শক্তি বলেন তবে দোষ নাই। ব্রহ্ম ও প্রকৃতি অভিন্ন হইল। শক্তি শক্তিমান অভিন্ন এই শাশ্বত নিয়ম বলে। অগ্নি আর তার তেজ অভিন্ন। 'অগ্নি দগ্ধ করে', না বলিয়া 'তেজ দগ্ধ করে' এই কথা বলিলে আপত্তি নাই।

ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন কিভাবে ? কুম্ভকার যেমন মাটি আনিয়া ছানিয়া চক্র দ্বারা ঘুরাইয়া ঘট তৈয়ারী করেন সেই ভাবে ? শ্রুতি তাহা বলেন নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'তদৈক্ষত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়েতি" (ছান্দোগ্য, ৬/২/৩), তাই পরবর্তী সূত্রে বলিতেছেন—

সূত্র— অভিধ্যোপদেশাচ্চ।। ১/৪/২৪

অভিধ্যা অর্থ সঙ্কল্প। ব্রহ্ম উপাদান সংগ্রহ করেন নাই। সঙ্কল্প করিয়াছেন বহু হইবেন অমনি বহু হইলেন। ব্রহ্মের সঙ্কল্পই জগতের কারণ। তাঁহার সঙ্কল্প হইতেই নিখিল বিশ্বের প্রকাশ। সুতরাং উপাদান কারণ, নিমিত্ত কারণ সবই তিনি, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' 'সর্বকারণকারণম্।'

এই তত্ত্ব ঋগ্বেদ-সংহিতা মন্ত্র মধ্যে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ।। ১/৪/২৫

"ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র জায়ত ততঃ সমুদ্রঽর্ণবঃ।।
সমুদ্রাদর্ণবাদিব সংবৎসরো অজায়ত।

অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতো বশী।।
সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ।।"

(ঋগ্বেদ, ১০/১৯০/১-৩)

ওঁ এই শব্দময় ব্রহ্মের অভীদ্ধাৎ অর্থাৎ দীপ্তিমান তপস্যা হইতে "একোঽহং বহু স্যাং" এই সঙ্কল্পরূপ সত্য ও ঋত ব্যক্ত হইল। সৎ অর্থাৎ সৎস্বরূপ ঋত (ঋ-ধাতু গমানার্থক) উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে—নিয়মাত্মক স্পন্দন হইতে রাত্রি বা আবরিকা শক্তি উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে জন্মিল সমুদ্র ও সম্বৎসর অর্থাৎ দেশ ও কাল (Space and Time)। বশী স্বতন্ত্র ধাতা তিনি, 'মিষতো বিশ্বস্য'—কল্পনাময় বিশ্বের, 'বিদধৎ' অভিব্যক্ত করিবার জন্য সূর্য এবং চন্দ্র অর্থাৎ পুরুষশক্তি ও প্রকৃতিশক্তি যথানুগ কল্পনা করিলেন—অভিব্যক্ত করিলেন। যাহা সঙ্কল্পরূপে ছিল আত্মস্থ তাহা বাহিরে প্রকাশ করিলেন। ক্রমে স্বর্গ পৃথিবী অন্তরীক্ষ সকল সুখময় ভোগের স্থান ব্যক্ত হইল।

এই বিশাল সৃষ্টি প্রপঞ্চ কুম্ভকারের মাটি লইয়া ঘট গড়াইবার মত mechanical সৃষ্টি নহে। ইহা কবির কাব্য সৃষ্টির মত। সৃষ্টির কর্তাকে আদিকবি বলা হইয়াছে। প্রণয়নের পূর্বে কাব্যের কোন অস্তিত্ব থাকে না। কবির অন্তরে তাদাত্ম্যভাবে লীন থাকে। কবি তাঁহার অন্তর হইতে বাহিরে কাব্যাকারে অভিব্যক্ত করেন কাব্যকে।

স্তিমিত গম্ভীর সমুদ্রবক্ষে যেমন হিল্লোল উপস্থিত হয়, সেইরূপ সৎস্বরূপে স্থিত ব্রহ্মের চিদাকাশে "বহু হইব" স্পন্দন উপস্থিত হইল। এই স্পন্দনই ঋতম্। সত্যের উপর ঋত উত্থিত হইল। এই স্পন্দনই সৃষ্টির বীজ। 'বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি' সঙ্কল্পাত্মক স্পন্দন। এই স্পন্দনের তাৎপর্য শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, এই জগচ্চক্র পরিচালনার অব্যভিচারী নিয়মাত্মক স্পন্দন। এই স্পন্দনই মূলবীজ। ইহা হইতেই সৃজন।

পরবর্তী সূত্রে বিষয়টি আরো পরিষ্কার করিয়াছেন—

সূত্র— আত্মকৃতেঃ।। ১/৪/২৬

আপনাকেই তিনি বহুরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিয়াছেন, "তদাত্মানং স্বয়ং অকুরুত"— তিনি বহুরূপ ধারণ করিবার জন্য কোন বস্তুর অপেক্ষা করেন নাই। উপাদান কারণ তিনি নিজেই। তিনি মায়ার দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এইরূপ কথা শাস্ত্রে আছে বটে, কিন্তু মায়া তো অপর কেহ নহে, পরব্রহ্মেরই আশ্রিত শক্তি।

অতএব অন্য বস্তুর অপেক্ষা নাই এ-কথা পরম সত্যই। ভাগবত বলিয়াছেন—

"আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজতে সৃজতি প্রভুঃ।

ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ ।।" (ভাগঃ, ১১/২৮/৬)

প্রভু নিজ আত্মাতে অভিন্নরূপে বিশ্বকে সৃষ্টি করেন ও সৃষ্ট হন। রক্ষা করেন রক্ষিত হন। সংহার করেন সংহৃত হন। তিনি প্রভু—কর্তুম্ অকর্তুম্ অন্যথা কর্তুং সমর্থঃ। এই তত্ত্বকে পরবর্তী সূত্রে স্পষ্টতর করিতেছেন—

সূত্র— **পরিণামাৎ**।। ১/৪/২৭

ব্রহ্মই সকল বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছেন। "স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্বং অসৃজত। যদিদং কিঞ্চ।" তৈত্তিরীয় শ্রুতির এই বাণী হইতে প্রকাশ হইতেছে যে, তিনি নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ দুইই। পরবর্তী সূত্রে এই সৃষ্টি রহস্য উপসংহার করিতেছেন। এই স্পষ্ট পরিণামবাদ-সূত্র থাকিলেও শঙ্কর পরিণামবাদ মানেন নাই। বিবর্ত মানিয়াছেন।

সূত্র— **যোনিশ্চ হি গীয়তে**।। ১/৪/২৮

তিনিই যোনি অর্থাৎ উপাদানকারণ।

"যদ্ভূত যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" (মুণ্ডক, ১/১/৬) মন্ত্রে যোনি শব্দটির স্পষ্টোক্তিই রহিয়াছে। সুতরাং সংশয়ের আর কোন কারণ নাই। তাই চতুর্থ পাদের শেষ সূত্র—

৮. সর্বব্যাখ্যাধিকরণ—

সূত্র— **এতেন সর্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ**।। ১/৪/২৯

এইরূপ যুক্তি দ্বারা শেষ সিদ্ধান্ত হইল, যাহা কিছু সবই ব্রহ্মপর। একমাত্র ব্রহ্মই সত্তাবান্। তাঁহার সত্তা হইতেই নিখিল বিশ্বের সত্তা। তিনি এক অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় বর্জিত। এবং নিশ্চয়ই ইহা সত্য। 'ব্যাখ্যাতাঃ ব্যাখ্যাতাঃ' দুইবার বলিয়াছেন অধ্যায় শেষ হইল ইহা জানাইবার জন্য।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্রহ্মসূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায় : অবিরোধ

১। স্মৃত্যধিকরণ—

এ পর্যন্ত সূত্রকার স্থাপন করিয়াছেন, একমাত্র ব্রহ্মই জগতের কারণ। তিনি নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ দুইই। ছান্দোগ্য-শ্রুতির স্পষ্টোক্তি—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি" (৩/১৪/১)। ইহাতে বুঝা যায়, ব্রহ্ম বিনা জগতের আর কোন কারণান্তর নাই।

সাংখ্য-দর্শনে প্রধান বা প্রকৃতিকে জগৎসংসারের কারণ বলা হইয়াছে। শ্রুতির সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় সূত্রকার সাংখ্যশাস্ত্রকে উপেক্ষা করিয়াছেন, এই হেতু সূত্র। সূত্রে প্রশ্ন ও সমাধান দুইই আছে।

সূত্র— স্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাৎ।। ২/১/১

সাংখ্যকে উপেক্ষা করিলে স্মৃত্যনবকাশ-দোষ হয় না কি? অনবকাশ অর্থ অনর্থকতা। দোষ হয় বটে, কিন্তু সাংখ্যকে গ্রহণ করিলে অন্য অনেক স্মৃতি অনর্থকতা হইয়া পড়ে। অন্য অনেক স্মৃতি বলিতে বিষ্ণুপুরাণ, মনুস্মৃতি, শ্রীমদ্ভাগবত। সাংখ্যকে আদর করিলে বিষ্ণুপুরাণ, মনু এবং গীতাকে উপেক্ষা করিতে হয়। এই সকল স্মৃতি প্রকৃতিকে মানিয়াছেন ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া। সুতরাং ইহারা বেদানুগত। বেদানুগত স্মৃতিসমূহ উপেক্ষা করিয়া বেদবিরোধী স্মৃতি গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

প্রশ্ন হইতে পারে, সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা কপিল। তাঁহার কথা শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে আছে—"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্তি—" (৫/২) ইত্যাদি। অগ্রে—আদিতে—কল্পের প্রারম্ভে আদিতে উৎপন্ন ঋষি কপিলকে যিনি জ্ঞানে পূর্ণ করিয়াছিলেন। গীতাও বলিয়াছেন, "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ"।

উত্তর। এই কপিল কোন ব্যক্তিবিশেষ নহে। কপিল অর্থ স্বর্ণবর্ণ হিরণ্যগর্ভ। সর্বাগ্রে হিরণ্যগর্ভের জন্ম হইয়াছিল। এই শ্রুত্যুক্ত কপিল সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা নহেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে এক কপিলের কথা আছে। তিনি দেবহূতির পুত্র, বিষ্ণুর অবতার। তিনি মাতাকে সাংখ্য-উপদেশ দিয়াছিলেন। এই সাংখ্যোপদেশের সহিত বেদের বিরোধ নাই। তৃতীয় স্কন্ধে ২৬ অধ্যায়ে এই বেদানুকূল সাংখ্যের বর্ণনা আছে। এই সাংখ্য গ্রহণীয়। এই সাংখ্য প্রকৃতিকে ব্রহ্মের শক্তি বলিয়াছেন। তথাকথিত সাংখ্যদর্শনের 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ অনীশ্বরঃ' এই সাংখ্যসূত্রকে বেদবেদান্তবাদী উপেক্ষা করিয়াছেন। সাংখ্য যে গ্রহণীয় নহে এ সম্বন্ধে অপর একটি হেতু—

সূত্র— ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ ॥ ২/১/২

সাংখ্যশাস্ত্রে অন্য সকল সিদ্ধান্তও— ঈশ্বর-অসিদ্ধত্ব, পুরুষবহুত্ব— বেদানুগত গীতাদিশাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। এই কারণেও সাংখ্যশাস্ত্রের অগ্রহণতা। সাংখ্যশাস্ত্র প্রত্যাখ্যাত হইলে পাতঞ্জলের যোগদর্শনও গ্রহণ করা যায় না। পরবর্তী সূত্রে এই কথা বলিয়াছেন—

২। যোগ-প্রত্যুক্ত্যধিকরণ—

সূত্র— এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥ ২/১/৩

সাংখ্যদর্শনের ভিত্তিতেই যোগদর্শন স্থাপিত। যোগদর্শনের আর এক নাম সেশ্বর সাংখ্য। বেদান্ত ঈশ্বরতত্ত্ব মানেন সুতরাং বেদবাদী সেশ্বর সাংখ্যকে উপেক্ষা করিবেন কেন ? যোগদর্শনে ঈশ্বর অতীব গৌণ। ঈশ্বর সম্বন্ধে যে কয়টি যুক্তি আছে তাহা অত্যাবশ্যক কিছু নহে। চিত্তনিরোধের যে সকল উপায় আছে তন্মধ্যে ঈশ্বরপ্রণিধান একটি বিকল্প উপায় মাত্র (ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা)। সুতরাং যোগদর্শনে ঈশ্বরের প্রয়োজনীতা অতি অল্প। বেদান্ত সেশ্বর-সাংখ্য যোগদর্শনকেও উপেক্ষা করেন। যোগদর্শনের আসন, প্রাণায়াম, চিত্তবৃত্তি-নিরোধ, ইন্দ্রিয়-সংযম, ধারণা, ধ্যান, প্রভৃতি সহিত বেদান্তের বিরোধ নাই। কোনও অংশ গ্রহণীয়, কোনও অংশ অপ্রামাণিক, কোনও অংশ প্রামাণিক, এই রূপ সমাধান গ্রহণীয় নহে। এই জন্য বেদান্ত সমগ্র যোগ-দর্শনকেই অগ্রহণীয় কহিয়াছেন।

এই দুই সূত্র দ্বারা সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনকে বেদান্ত সমগ্রভাবেই প্রত্যাখান করিয়াছেন, উভয় দর্শনেই গ্রহণযোগ্য অনেক কিছু থাকিলেও।

৩। বিলক্ষণত্বাধিকরণ—

সূত্র— ন বিলক্ষণত্বাদস্য, তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ॥ ২/১/৩

সাংখ্য পাতঞ্জল বেদবিরোধী বলিয়া উপেক্ষিত। বেদও তো সাংখ্য-পাতঞ্জল বিরোধী বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে। উত্তর দিয়াছেন, না, পারে না। কেন, তা ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে (১০/৯০/৯) কথিত আছে—

"তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজয়ত॥"

পুরুষ হইতে সমুদয় ঋক্ সাম যজুঃ ও ছন্দঃ সকল জাত হইল। পুরুষ হইতে সাক্ষাদ্ভাবে বেদ উৎপন্ন। সাংখ্য ও যোগদর্শন কপিল ও পতঞ্জলি এই দুই ব্যক্তি হইতে ব্যক্ত। বেদের বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, উহা ঈশ্বর হইতে জাত। মানুষকৃত নহে।

জাত হইলে আবার বিনাশপ্রাপ্তও তো হইতে পারে? এইরূপ আপত্তি তুলিলে বলিব যে, জাত অর্থ ব্যক্ত। বেদ পুরুষের অন্তরে ছিল পূর্বাপূর্ব কল্পকাল হইতে, তাহা অভিব্যক্ত হইল মাত্র। সুতরাং বেদের নিত্যত্ব স্থির রহিল। অন্য কোন শাস্ত্র এইরূপ নহে। ইহাই বেদের বিশিষ্টতা। ভাগবত বলিয়াছেন,

"বেদস্য চ ঈশ্বরাত্মত্বাৎ তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ।" ১১/৩/৪৪

৪। অভিমানি ব্যপদেশাধিকরণ—

সূত্র— অভিমানি-ব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্॥ ২/১/৫

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে— "তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" (৬/২/৩)। তেজঃ ইচ্ছা করিল, বহু হইল। জল ইচ্ছা করিল, বহু হইল। বেদের এই সব কথা কিরূপে প্রমাণ্য হইবে? তেজ জল ইহারা কি ইচ্ছা করিতে পারে?

উত্তর দিতেছেন, 'অভিমানব্যপদেশঃ'। তেজঃ অপ্ যে ইচ্ছা করিয়াছে তাহা অভিমান ব্যপদেশে অর্থাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে হইবে। উক্ত শ্রুতির পূর্বেও বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন, আমি তেজঃ, জল ও পৃথিবী এই দেবতাত্রয়ের সহিত জীবাত্মারূপে অনুপ্রবেশ করিয়া নামরূপে অভিব্যক্ত হইব। তেজঃ, জল, পৃথিবীকে দেবতা বলা হইয়াছে ও তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবেশের কথা বলা হইয়াছে।

"হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যকরবাণীতি।" (ছান্দোগ্য, ৬/৩/২)

সুতরাং তেজঃ ও জলের ইচ্ছা তত্তৎ অভিমানী দেবতার ইচ্ছা। ঐ দেবতা পরব্রহ্মই। অতএব ঐ ইচ্ছা পরব্রহ্মেরই ইচ্ছা। সুতরাং ঐসব উক্তিতে বেদের অপ্রমাণতা হয় না।

৫। দৃশ্যতেঽধিকরণ—

সূত্র— দৃশ্যতে তু॥ ২/১/৬

ব্রহ্মকে উপাদান কারণ বলা হইয়াছে। কারণের গুণ কার্যে থাকিবে। মাটি উপাদানে তৈয়ারী ঘট মাটির ঘটই হইবে। সুবর্ণ উপাদানে তৈয়ারী ঘট সুবর্ণঘটই হইবে। চৈতন্যময় ব্রহ্ম উপাদানে জড়জগৎ হইল কি রূপে ?

এই পূর্ব পক্ষের উত্তর— চেতন হইতে অচেতন সৃষ্টিও দেখা যায়। ঊর্ণনাভ হইতে জাল। সচেতন দেহ হইতে কেশ, নখ, লোম—

"যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥" (মুণ্ডক, ১/১/৭)

৬। অসদিত্যধিকরণ—

সূত্র— অসদিতিচেন্ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ॥ ২/১/৭

'অসদেব ইদমগ্র আসীৎ।' পূর্বে অসৎ ছিল, তারপর তাহা হইতে প্রপঞ্চ সৃষ্টি— একথা তো বেদে আছে। উত্তর— না, এইরূপ বাক্য নাই। অসৎ হইতে সৎস্বরূপ হইতে পারে না, ইহাই বলা হইয়াছে। অসৎ হইতে সৎ হয় নাই। এই কথাটি স্পষ্টই আছে।

অসৎ কার্যবাদকে দৃঢ়ভাবে নিষেধ করা হইয়াছে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল, সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অসৎ ছিল না। সৎস্বরূপের মধ্যে ছিল। বীজরূপে ছিল।

সূত্র— অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্॥ ২/১/৮

প্রলয়কালে বিশ্বজগৎ, জীব ও প্রকৃতি, সকলই যদি ব্রহ্মেতে লয় হয়, তাহা হইলে, জীবের দুঃখশোকাদি দোষ ও প্রকৃতির নশ্বরতাদি দোষ ব্রহ্মেতেও বর্তায়। যদি বর্তায়, তাহা হইলে ব্রহ্মকে যে সর্বদোষ রহিত বলা হইয়াছে, তাহাতে অসামঞ্জস্য উপস্থিত হয়। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ। উত্তর দিতেছেন পরসূত্রে—

সূত্র— ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ॥ ২/১/৯

সেইরূপ হয় না। কিছু অসামঞ্জস্য হয়। একখানি বস্ত্রের দুই স্থানে দুই রং থাকিলে একস্থানে রং অন্যস্থানে লাগে না। একটি ইন্দ্রিয় দোষযুক্ত হইলে আর একটি ইন্দ্রিয় দোষযুক্ত হয় না। চক্ষু কানা হইলে কর্ণ বধির হয় না। দেহের বাল্য কৈশোর বা জরা ব্যধি আত্মাকে স্পর্শ করে না। তদ্রূপ জীবের দুঃখ শোক প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতা ব্রহ্মে স্পর্শ করে না। ভাগবতও বলিয়াছেন—

"ত্বং বা ইদং সদসদীশ ভবাংস্ততোহন্যো
মায়া যদাত্ম-পরবুদ্ধিরিয়ং হ্যপার্থা।
যদ্ যস্য জন্ম নিধনং স্থিতিরীক্ষণঞ্চ
তদ্বৈ তদেব বসুকালবদষ্টিতর্বোঃ॥"(ভাগবত, ৭/৯/৩১)

হে ভগবান্। তোমার বিহারযোগ অর্থাৎ লীলা আমাদের নিকট দুর্বোধ্য। তোমার আশ্রয় নাই, শরীর নাই এবং তুমি নির্গুণ; অথচ তুমি নিজেই সগুণ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছ। অথচ কোন-প্রকার বিকার-মাত্র তোমাকে স্পর্শ করিতেছে না।

উপরোক্ত পূর্বপক্ষ তুলিয়াছেন সাংখ্যশাস্ত্র। বেদান্ত— 'ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ'—উত্তর দিয়া আবার বলিতেছে যে সাংখ্যশাস্ত্র বেদান্তে যে দোষ দিয়াছে সেই দোষ তাহার নিজেরও আছে। পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— স্বপক্ষদোষাচ্চ॥ ২/১/১০

প্রকৃতি নির্গুণা। কিন্তু প্রকৃতি হইতে জাত পঞ্চমহাভূতে শব্দ-রসাদি গুণ আছে। এইসব গুণযুক্ত ভূতাদি প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়— তখন ক্ষিত্যাদির গন্ধাদি গুণ প্রকৃতিতে সংক্রমিত হয় না। প্রকৃতি বিকারহীন অথচ প্রকৃতি হইতে জাত যাবতীয় বস্তু বিকারশীল। এইরূপ নির্গুণত্ব ও গুণযুক্তত্ব পাশাপাশি থাকে, কেহ কাহাকেও নিজ দোষ-গুণ যুক্ত করে না। এই সকল তত্ত্বরহস্য শাস্ত্র দ্বারাই জানিতে হইবে। তর্ক, বিচার, অনুমিতি দ্বারা জানা যাইবে না। এই বিষয়ে সূত্র—

সূত্র— তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি॥ ২/১/১১

যে সকল বিষয় অচিন্ত্য তাহা লইয়া তর্কের আয়োজন করিবে না। যাহা প্রকৃতির অতীত কথা তাহাই অচিন্ত্য।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যা ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"

সূত্র— অন্যথাহনুমেয়মিতি চেৎ, এবমপ্যানির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ॥

২/১/১২

সাংখ্যের পূর্বপক্ষ অন্যপ্রকার যুক্তিতে তর্ক-বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া 'প্রধান-কারণ' স্থাপন করিব। এই কথার উত্তর দিতেছেন বেদান্ত— 'এবমপ্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ', তর্কের শেষ হওয়া অসম্ভব। এক পণ্ডিতের স্থাপনা অন্য পণ্ডিত খণ্ডন করিতেই পারেন। সুতরাং যুক্তির দ্বারা কোন শাশ্বত সিদ্ধান্ত লাভ করা যাবে না। অতএব শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ। ব্রহ্মই জগৎকারণ ; ইহাই প্রকৃত সত্য।

৭। শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণ—

সূত্র— এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ।। ২/১/১৩

ইহা উপরোক্ত যুক্তি দ্বারা, অবশিষ্ট ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন, প্রভৃতি বিভিন্ন দর্শন বেদানুসারী নহে বলিয়া উপেক্ষণীয়।

৮। ভোক্ত্রাপত্ত্যাধিকরণ—

সূত্র— ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ, স্যাল্লোকবৎ ।। ২/১/১৪

ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ এই কথা যদি স্বীকার করি তাহা হইলে জীবরূপে ব্রহ্মই সুখদুঃখের ভোক্তা হইয়া পড়েন। এইরূপ আপত্তিতে উত্তর দিতেছেন— 'লোকবৎ'। লৌকিকে দণ্ডধারী পুরুষ ও পুরুষ অভিন্ন হইলেও দণ্ড ও পুরুষে যেরূপ ভেদ আছেই, শক্তিমান ব্রহ্ম জীবের সহিত অভিন্ন হইলেও জীবশক্তি ও শক্তিমান্ ব্রহ্মে ভেদ আছেই। জল আর দুধ মিশাইয়া দিলে যেমন অভেদ মনে হয়—এইরূপ মনে হইবার কারণ মিশ্রণ।

আবার পূর্বপক্ষ বলিতেছেন—

৯। আরম্ভণাধিকরণ—

সূত্র— তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ ।। ২/১/১৫

'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্' ছান্দোগ্য উপনিষদের এই বাক্যে (৬/১/৪) উপাদেয়-উপাদানের অভিন্নতা বুঝা যায়। মৃত্তিকা ও ঘট যেরূপ অভিন্ন সেইরূপ বিশ্বপ্রপঞ্চ ও ব্রহ্ম অভিন্ন ইহা জানা যায়। কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘট। ঘট নাশশীল, মৃত্তিকা নাশশীল নহে। ঘট সৃষ্টির পূর্বে মৃত্তিকা ছিল ঘট ছিল না। সুতরাং ঘট অনিত্য, মৃত্তিকা

নিত্য। ঘটের একটি নির্দিষ্ট আকার আছে, মৃত্তিকার নির্দিষ্ট আকার নাই। ঘট হইতে কুম্ভকার ও চক্রদণ্ডের অপেক্ষা আছে— মৃত্তিকা-স্থিতির জন্য কাহারও অপেক্ষা নাই। ঘট দ্বারা জলাহরণ কার্য সিদ্ধ হয়, মৃত্তিকা দ্বারা তাহা হয় না। সুতরাং ঘট ও মৃত্তিকার অনন্যত্ব অর্থাৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সেই ব্রহ্ম হইতে জীব ও জগৎ সৃষ্টি হইলে তাহাদের অভিন্নত্ব হয় না। ঘটের নাম ও রূপ কুম্ভকারের প্রযত্নে ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সেইরূপ বিশ্বজগতের নাম ও রূপ ব্রহ্মের সংকল্প ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল এই যে, কার্য কারণ হইতে অনন্য হইলেও কার্য কারণ নহে। কার্য বিভিন্ন নামরূপে অভিব্যক্ত ও পরিচিত। কারণ তাহা নহে। সুতরাং জীবে ও ব্রহ্মে অভিন্নতা থাকিলেও ভিন্নতা আছে। ইহা দ্বারা ভেদাভেদবাদ স্থাপিত হয়। অদ্বৈতবাদ নহে। জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও জীব ও জগৎ ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্ম প্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে তাহাতে অনাসক্ত ও অবিকৃত স্বরূপে অবস্থিত।

সূত্র— **ভাবে চোপলব্ধেঃ** ।। ২/১/১৬

'ভাবে' অর্থাৎ কার্য সদ্ভাবে। কার্যের সত্তা থাকিলে তাহা হইতে কারণ সত্তার উপলব্ধি হয়। ঘট হইতে মৃত্তিকার উপলব্ধি হয়। কুণ্ডল হইতে স্বর্ণসত্তার উপলব্ধি হয়। যদি কার্য ও কারণ অত্যন্ত ভিন্ন হইত তাহা হইলে কুণ্ডল দেখিলে সুবর্ণেরও প্রতীতি হইত না।

সকল বস্তুই যে আছে অর্থাৎ সত্তাবান্ বা 'সৎ'— ইহাতে উপলব্ধি হয় ব্রহ্ম সৎস্বরূপ। জাগতিক সমুদয় বস্তুতে 'সৎ' শক্তির বিদ্যমানতাকে 'সত্তাসামান্য' বলা হয়। এই সত্তাসামান্য হইতে ব্রহ্ম সৎস্বরূপ ইহা উপলব্ধি হয়। ব্রহ্মের সদ্ভাবেই সকল বস্তু সত্তাবান্।

সূত্র— **সত্ত্বাচ্চাপরস্য** ।। ২/১/১৭

"সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্"।

(ছান্দোগ্য, ৬/২/১)

পরে অভিব্যক্ত কার্যপদার্থের পূর্বে কারণে অবস্থিতি হেতু কার্য ও কারণের অনন্যত্ব এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে একটি অদ্বিতীয় সৎস্বরূপে অনভিব্যক্ত ছিল। সৎস্বরূপ এক এবং অদ্বিতীয় কিরূপে হইতে পারে, যদি কারণ ও কার্যের অনন্যত্ব না হয় ?

সূত্র— **অসৎ ব্যপদেশান্নেতি, চেন্ন, ধর্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ** ।। ২/১/১৮

ছান্দোগ্য ৬/২/১ মন্ত্রে বলিয়াছেন, 'অসদেবেদমগ্র আসীৎ' অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অসৎ ছিল। এই ভাবে জগৎ অসৎ ছিল বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ থাকায়—ব্রহ্ম জগৎকারণ নহে, ইহা যদি বল— এই অংশে আপত্তির উল্লেখ। পরবর্তী অংশে— উত্তর 'না' ইহা বলিতে পার না, কারণ 'ধর্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ'। স্থূলত্ব ও সূক্ষ্মত্ব বস্তুর ধর্মান্তর আছে। যদি স্থূলবস্তুকে সৎ বলি, তাহা হইলে সূক্ষ্ম বস্তুকে অসৎ বলিতে হয়। অভিব্যক্ত বস্তুকে যদি সৎ বলি, তাহা হইলে অনভিব্যক্তকে অসৎ বলিতে হয়। জগৎ অসৎ ছিল একথার অর্থ হইল অনভিব্যক্ত ছিল। ইহাই বক্তব্য। আরো একটি কথা— 'অসৎ' শব্দের অর্থ যদি কর একেবারে অনস্তিত্ব— Non-existence, তাহা হইলে অসৎ আসীৎ এই বাক্যের অর্থ কিরূপ হইবে ? অনস্তিত্ব ছিল !! এরূপ কথার কি কোন তাৎপর্য থাকিতে পারে ? Non-existence existed ইহা অশ্রদ্ধেয় বাক্য। সুতরাং অসৎ অর্থ সত্তাহীনতা নহে, সত্তার অনভিব্যক্ততা।

'বাক্যশেষাৎ' কথাটির তাৎপর্য বলা যাইতেছে। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে— 'অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ' (২/৭) এই স্থলে অসৎ আসীৎ— এই কথা নিরর্থক উক্তি, পূর্বে বলিয়াছি। ঐ কথাটির শেষাংশে আছে "ততো বৈ সৎ অজায়ত। তদা আত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত।" অর্থাৎ সেই অসৎ হইতে সৎ জন্মিল এবং তিনি নিজে নিজেকেই বহুরূপ করিয়াছিলেন। এই বাক্যশেষ হইতে বুঝা যায় যে, অসৎ অর্থ সত্তার অভাব নহে, সত্তার অনভিব্যক্ততা।

ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হইল যে, কার্যকে সৎ ও অনভিব্যক্ত বলিয়া কারণকে অসৎ বলা হইয়াছে। কার্য ও কারণ অনন্য, ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ।

সূত্র— যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ॥ ২/১/১৯

যুক্তিদ্বারা ও শব্দান্তর দ্বারাও এই কথা সিদ্ধান্তিত হয়। পূর্ব সূত্রের কথারই পুনরাবৃত্তি করিতেছেন। উৎপত্তির পূর্বে কার্যকারণে অনভিব্যক্ততা থাকে। ইহা হইল যুক্তি আর শব্দান্তর। ইহা তৈত্তিরীর শ্রুতির বাক্য তাহা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে। কারণরূপে অনভিব্যক্ত অবস্থায় সৎ স্বরূপে ছিল, ইহাই সুসিদ্ধান্ত।

তৎপর দুইটি সূত্রদ্বারা বক্তব্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতেছেন।

সূত্র— পটবচ্চ॥ ২/১/২০

অর্থাৎ পটের ন্যায়। সূত্র ও পট অভিন্ন। তবু সূত্রই পট নহে, সূত্র সমূহ টানা-পোড়েন দ্বারা গ্রথিত হইয়া পট এই নাম ও রূপ ধারণ করে। আর একটি সূত্র বলিতেছেন—

সূত্র— যথা চ প্রাণাদিঃ। ২/১/২১

একই বায়ুর পাঁচটি নাম— প্রান, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। শরীরের বিশেষ বিশেষ বৃত্তি অনুসারে স্বতন্ত্র কার্যকারিতার পরিচয় দেয় মাত্র।

১০। ইতরব্যপদেশাধিকরণ—

সূত্র— ইতর-ব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ॥ ২/১/২২

জীবশক্তি যে জগতের কর্তা নহে, এ বিষয়ে আর একটি অভিনব যুক্তি দিয়াছেন এই সূত্রে।

কেহ যদি নিজের বসবাস করার জন্য একখানি গৃহ নির্মাণ করে—তাহা হইলে সে তাহা এমনভাবে করে যাহাতে নানা প্রকার সুখ-সুবিধা হয়। যাহাতে সর্বদা সকল কার্যে অসুবিধা হয় এমন একখানি গৃহ কেহ নিজের জন্য নির্মাণ করে না। এই জগৎপ্রপঞ্চ জীবের পক্ষে নানা প্রকার দুঃখের আকর। জীব যদি নির্মাতা হইত তাহা হইলে কখনও এইরূপ স্থান নিজের জন্য নির্মাণ করিত না।

হিতাকরণাদি অর্থাৎ হিতের অননুষ্ঠান, অহিতের অনুষ্ঠান। জীবের চারিদিকে অসংখ্যপ্রকার তার উন্নতির বাধক অগণিত অহিত অনুষ্ঠানাদির অবস্থিতি দৃষ্ট হয়। জীব নিজে কর্তা হইলে এইরূপ সে করিত না। জীবের একাদশ ইন্দ্রিয় একাদশ দিকে তাহাকে টানিয়া নিয়া সর্বদাই জীবনকে দুঃখকর করিয়া রাখে। ইহার কারণ জীব হইলে কখনও সে এইরূপ সৃষ্টি করিত না। কেহ কখনও নিজের বন্ধন নিজে তৈয়ারী করে না। জগৎটি সকল জীবের পক্ষে নিদারুণভাবে বন্ধনাগার। ইহাতে বুঝা যায়, জীব ইহার কর্তা বা স্রষ্টা নহে।

সূত্র— অধিকন্তু ভেদব্যপদেশাৎ॥ ২/১/২৩

অথবা, অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ।।২/১/২৩

কার্য ও কারণের যদিও অনন্যত্ব আছে। ব্রহ্ম হইতে জীব সৃষ্ট বলিয়া জীব-ব্রহ্মে একটি অভিন্নতা আছে, তথাপি ব্রহ্ম জীব হইতে অনেক বড়।

জীব, ব্রহ্মের তটস্থশক্তি বা জীবশক্তি। ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি—

তাঁহার একটি শক্তি জীব। একটি শক্তি পুরস্কারে জীব-ব্রহ্ম অভিন্ন হইলেও জীব ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্ম জীব হইতে অনেক অধিক। ঘট মৃত্তিকা দ্বারাই তৈয়ারী কিন্তু মৃত্তিকা ঘট হইতে অনেক অধিক। ঘট ঘটই থাকে। মৃত্তিকা দ্বারা ঘট কলসী থালা সরা হাড়ি প্রদীপ প্রতিমা পুতুল—শত শত দ্রব্য তৈয়ারী হইতে পারে। মৃত্তিকা নিরুপাধি। ঘট ঘটত্বাবিচ্ছিন্ন। ঘটত্বই ঘটের উপাধি। জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। ব্রহ্ম নিরুপাধি, জীব উপাধিযুক্ত। জীব অহংকার উপাধিতে অভিমানী হইয়া, কর্তৃত্বজ্ঞানে অন্ধ হইয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে। উপাধিতে অভিমান ত্যাগ করিলেই জীব নিরাময়যুক্ত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং সোপাধিক জীবের সুখ-দুঃখের ভোক্তা নিরুপাধি ব্রহ্ম হইবে কেন? ঘটত্বাবচ্ছিন্ন ঘট ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যায় কিন্তু নিরুপাধি মৃত্তিকার ভাগ হয় না। সুতরাং মৃত্তিকা ঘট হইতে অধিক। ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক। অনেক অধিক। অত্যধিক। 'অধিকন্তু' সূত্রের ইহাই তাৎপর্য।

সূত্র— অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তেঃ॥ ২/১/২৪

'অশ্মাদিবৎ'— প্রস্তরের মত। প্রস্তর যেমন মাটি হইতেই জন্মে কিন্তু পরস্পরের গুণ-দোষ পরস্পরে নাই। প্রস্তরখণ্ড দ্বারা মাটির কার্য হয় না। মাটি দ্বারাও প্রস্তরের কার্য হয় না। সুতরাং মাটি ও প্রস্তর ভিন্ন এবং অভিন্ন। তদ্রূপ ব্রহ্ম ও জীবের অভিন্নত্ব খণ্ডন হইল।

১১। উপসংহারদর্শনাধিকরণ—

সূত্র— উপসংহার-দর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি॥ ২/১/২৫

সকল দ্রব্যই সৃজিত হইতে কর্তৃকরণাদি কারকের প্রয়োজন হয়। ব্রহ্মের জগৎ সৃজনে কারকাদির স্থান কোথায়? প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, তাঁহার কিছুরই প্রয়োজন নাই। দুগ্ধ দধি হইতে যেমন কিছুরই প্রয়োজন নাই। যদি বল, দুধ দধি হইতে সাজা-র প্রয়োজন তদুত্তরে বলিব ব্রহ্মের সংকল্প প্রয়োজন। উপসংহার অর্থ উপকরণ সংগ্রহ।

সূত্র— দেবাদিবদপি লোকে॥ ২/১/২৬

দেবতারা ঋষিরা যেমন উপকরণ ছাড়া কার্য করেন তদ্রূপ। ইন্দ্রের বর্ষণাদি ও সৌভরি কর্দম ঋষির সৃষ্টির কথা ভাগবতে আছে। তদ্রূপ ব্রহ্ম উপকরণ ছাড়াই এই জগৎ সৃষ্টি করেন।

ভাগবতে (৩/২৩) কর্দম ঋষির বিমান সৃষ্টির কথা আছে। ভাগবতে

(৯/৬) সৌভরি ঋষির পঞ্চাশখানি গৃহ নির্মাণের কাহিনী আছে। সুতরাং ব্রহ্মও উপকরণ সংগ্রহ না করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ইহাতে আশ্চর্য কিছু নাই। যোগবলে যাহা সম্ভব অচিন্ত্য শক্তিবলে তাহা কি সম্ভব নহে?

১২। কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণ—

সূত্র— কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা।। ২/১/২৭

দুগ্ধের যে দধিরূপে পরিণতি তাহা সবটা দুধেরই হয়। একটা অংশের হয় না। দুধ দধি হইয়া আর অবশেষ থাকে না। ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হইলে সবটাই হইয়াছেন। তাহা হইলে ব্রহ্মে নিজ সত্তা আর নাই। যদি বল একাংশে হইয়াছেন, তাহাও বলা যায় না, কারণ তাঁহাকে নিরবয়ব বলা হইয়াছে। মুণ্ডক উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

"দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।" (মুণ্ডক, ২/১/২)

উত্তর দিতেছেন পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।। ২/১/২৮

ঈশ্বর সম্বন্ধে সমস্ত প্রমাণই শাস্ত্রবাক্য হইতে জানিতে হইবে। "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" এই তথ্য শাস্ত্র স্বীকার করিয়াছেন।

ব্রহ্মতত্ত্ব বাক্য মনের অগোচর। সুতরাং বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত হইবে না। শ্রুতিই একমাত্র প্রামাণ্য।

উক্ত পূর্বপক্ষ সাংখ্য ও ন্যায়-বৈশেষিকের। তাঁহাদের প্রশ্ন— নিরবয়ব ব্রহ্ম সৃষ্টি করিলেন কিরূপে? করিলে কৃৎস্নপ্রসক্তি হয়। এই কথা সাংখ্য ন্যায় বলিতে পারে না কারণ—

সূত্র— আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি।। ২/১/২৯

সূত্র— স্বপক্ষদোষাচ্চ।। ২/১/৩০

সাংখ্যের প্রধান ও বৈশেষিকের পরমাণু নিরংশ— তাহা হইতে কিরূপে সৃষ্টি হয়? কৃৎস্নপ্রসক্তি দোষ হয় না?

সূত্র— সর্বোপেতা চ সা তদ্দর্শনাৎ।। ২/১/৩১

ব্রহ্মেতে বিচিত্র শক্তি আছে। "পরাস্য শক্তিঃ বিবিধৈব শ্রূয়তে।" ব্রহ্মে যে বিভিন্ন শক্তি আছে তাহা নয় — সর্বশক্তিমান্ তিনি। সকল শক্তি আছে এবং তাহা অনন্ত প্রকার। অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব।

একই ব্রহ্মেতে বহুবিধ শক্তিমত্ত্বার পরিচয় আছে। তিনি আশ্চর্যকর্মা।

সূত্র— বিকরণত্বান্নেতি চেৎ, তদুক্তম্।। ২/১/৩২

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলিয়াছেন— 'অপাণিপাদঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে যে তাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয় নাই। দেহ-ইন্দ্রিয়হীন হইলে তাঁহার পক্ষে কোন প্রকার কার্যারম্ভ করা কিরূপে সম্ভব হইবে ? তাৎপর্য এই যে, তিনি সর্বশক্তিমান্ হউন কিন্তু দেহেন্দ্রিয়াদি না থাকিলে শক্তি কাহাকে আশ্রয় করিয়া কার্য করিবে ?

উত্তর দিয়াছেন— তদুক্তম্। শ্বেতাশ্বতরের যে মন্ত্র অবলম্বন করিয়া দেহেন্দ্রিয় নাই বলিয়াছেন, সেই শ্রুতিই তাঁহার সকল কার্যক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন যথা—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।" (শ্বেতঃ, ৩/১৯)

তাঁহার হস্ত পদ নাই তথাপি গমন করেন, গ্রহণ করেন, দেখেন, শুনেন। ইহাতে বুঝা গেল সবই আছে। আছে আর নাই দুই একই প্রকার সত্য হয় কি রূপে ? প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয় নাই, অপ্রাকৃত দেহেন্দ্রিয় আছে— ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য।

শ্রুতি স্পষ্ট করিয়া কহিয়াছেন,

"সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।"

তিনি পাণিপাদ বিরহিত হইলেও সর্বতঃ পাণিপাদ বিশিষ্ট। সর্বতঃ চক্ষু, মস্তক ও বদন সম্পন্ন, সর্বত্রই শ্রুতি সম্পন্ন। ইহা দ্বারা পরিষ্কার বুঝা গেল যে, অপাণিপাদের 'অকার' নিষেধার্থক নহে। অকার অপ্রাকৃত অর্থবোধক। অকর্ম অর্থ— অপ্রাকৃত কর্ম আছে, প্রাকৃত কর্ম নাই ইত্যাদি শ্রুতির মর্মার্থ।

শ্রীভগবান্ শরীরধারী। প্রাকৃত শরীর নহে, অপ্রাকৃত শরীর। ব্রহ্মসংহিতা বলিয়াছেন— 'অঙ্গানি যস্য সকল-ইন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি।' সকল ইন্দ্রিয়ে সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বা শক্তি আছে। দর্শকের চক্ষুতে হস্তপদাদি রূপে প্রতীয়মান হইলেও তাহা প্রত্যেকে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কার্য সাধনে সমর্থ। ইন্দ্রিয় অপ্রাকৃত বলিয়াই এই সামর্থ্য সম্ভব।

শ্রীমদ্ভাগবতে পুলিন-ভোজনলীলায় (ভাগবত, ১০/১৩) বনভোজন সময় তাঁহার সখাগণ তাঁহার চতুর্দিকে উপবেশন করিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। যদি তাঁহার দেহ প্রাকৃত হইত তাহা হইলে

কেহ সম্মুখভাগে, কেহ পৃষ্ঠভাগে বসিত। কিন্তু ভাগবতকার বলেন— তাহারা শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে বসিলেও শ্রীকৃষ্ণ সকলের সম্মুখেই ছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণন এই—

"কৃষ্ণস্য বিষ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈঃ অভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ।
সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজুঃ ছদা যথাম্ভোরুহকর্ণিকায়াঃ ।।"

(ভাগবত, ১০/১৩/৮)

বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের চারিদিকে অনেক অনেক পঙ্‌ক্তি রচনা করিয়া আহার করিতে বসিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেক ব্রজবালক আপন সমক্ষে কৃষ্ণের মুখ দেখিয়া উৎফুল্ল দৃষ্টিতে বিরাজমান রহিল। দৃষ্টান্ত দিয়াছেন— পদ্মকর্ণিকার চতুর্দিক্‌স্থ পত্রসকল যেমন সকলেই কর্ণিকার অভিমুখে থাকে সেইরূপ সমুদয় ব্রজবালক আপন সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ দর্শন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখ অপ্রাকৃত বলিয়া এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইতে পারিল।

১৩। **প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণ**—

সূত্র— **ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ**।। ২/১/৩৩

কি প্রকারে জগৎ সৃষ্টি করেন না হয় বুঝিলাম, কিন্তু সৃষ্টি করার প্রয়োজনটি কি তাহা বুঝিলাম না। যিনি আত্মকাম তাঁহার প্রয়োজন থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রয়োজন ছাড়া কোন কার্যারম্ভ সম্ভব নহে।

প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— **লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্**।। ২/১/৩৪

'লীলাকৈবল্যম্' শব্দের অর্থ লীলাই কেবল প্রয়োজন। লীলার প্রয়োজনেই লীলা আর কোন প্রয়োজন নাই। 'লোকবৎ' অর্থ শিশু যেমন অকারণে নাচে, মানুষ যেমন অকারণে গান ধরে। ইহা অবশ্য ঠিক অকারণে নহে। ইহার কারণ আনন্দাতিশয্য। শিশু আনন্দাতিশয্যে নাচে। মানুষও মনের আনন্দে বিভোর হইয়া আপন মনে গায়। ইহা আনন্দের অতিশয়তায় হয়। শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন, শক্তির পরিপূর্ণতায়— বা পূর্ণতার অতিরিক্ত থাকায় তার উচ্ছলন (over-flow)। একটি শিশুর শক্তি এত বাড়িতেছে যে তাহা তাহার বাঁচিতে খরচ হয় না। বাড়িতে থাকে— সেই বাড়তি শক্তির জন্য খেলা করে। এই অসীম জগৎ ব্রহ্মের একপাদ শক্তিতে স্থিত। বাকী তিনপাদ দ্বারা কি করেন? আনন্দাস্বাদন করেন। 'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি'। তিনপাদ

দিব্যলোকে। দিব্যলোক অর্থ ক্রীড়ালোকে। লীলালোকে (দিবি ক্রীয়ায়াং)। ভাগবত বলিয়াছেন—

"নতেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং
বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে॥" (ভাগবত, ১১/১৯/৭)

আত্মবিনোদনের জন্যই এই লীলাময় জগৎ। ভাগবত নানাস্থানে এই কথাটি বলিয়াছেন।

১৪। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাধিকরণ—

সূত্র— বৈষম্য-নির্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ, তথা হি দর্শয়তি॥
২/১/৩৫

ব্রহ্ম স্রষ্টা হইলে তাঁহাতে বৈষম্য ও নির্দয়তা দোষ আসে। উত্তম, মধ্যম, অধম, নানা প্রকার অবস্থানে জীব থাকায় ব্রহ্মের বিষমতা ও নির্দয়তা দোষ মনে হয়।

উত্তর দিয়াছেন, না,—হয় না। ঐরূপ হয় সাপেক্ষত্বে। অর্থাৎ জীবের কর্মই সৃষ্টিগত বৈষম্যের কারণ। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন ১/৪/৫ মন্ত্রে, "সাধুকারী সাধুঃ ভবতি, পাপকারী পপো ভবতি, পূজ্যঃ পূজ্যেন কর্মণা ভবতি।" কর্মই যদি সৃষ্টি বৈষম্যের কারণ তবে সৃষ্টির অগ্রে যখন কোন বিভাগ ছিল না তখন সৃষ্টি হইল কিরূপে ? প্রথম কর্ম কোথা হইতে আসিল ? এই প্রশ্ন ও তদুত্তর দিয়াছেন পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— ন কর্মাবিভাগদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ॥ ২/১/৩৬

যখন কিছু ছিল না তখন আদিতে কর্ম কোথা হইতে আসিল ? কর্মের যখন অবিভাগ ছিল— জীব ও ব্রহ্মে, জগৎ ও ব্রহ্মে বিভাগ ছিল না— সব একেতেই লীন ছিল, তখন প্রথম কর্ম কোথা হইতে আসিল ? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, 'অনাদিত্বাৎ'— সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন—

"সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পৎ।"

সূর্য চন্দ্রকে পূর্ব সৃষ্টিতে যেমন ছিল সেইরূপ কল্পনা করিয়াই সৃষ্টি করিলেন। সূর্য অর্থ পুরুষশক্তি, চন্দ্র অর্থ প্রকৃতিশক্তি। ব্রহ্মেতেই অঙ্কুর রূপে ছিল। ভাগবত—

"বিশ্বমাত্মগতং ব্যঞ্জন্ কূটস্থো জগদঙ্কুরঃ।" (৩/২৬/২০)

সৃষ্টি প্রবাহ অনাদি। জীবের কর্ম ও বৈষম্যও অনাদি। সুতরাং

তাহাদের অবিভাগের কল্পনার অবকাশ নাই।

এই সত্য যুক্তিদ্বারা স্থাপনীয় এবং প্রতীতি হয়— তাহাই সূত্রে বলিয়াছেন—

সূত্র— উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ।। ২/১/৩৭

যুক্তিতে ও উপলব্ধিতে জ্ঞান হয় সৃষ্টি অনাদি; শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তিদ্বারা সর্বপ্রকারেই জানা যায় যে, সৃষ্টি অনাদি।

সূত্র— সর্বধর্মোপপত্তেশ্চ।। ২/১/৩৮

অতএব ধর্মের সঙ্গতি একমাত্র পরব্রহ্মতেই। পরস্পর বিরুদ্ধভাবেরও পরিণতি বা সমাধান পরব্রহ্মেতে। সকল ধর্ম বলিতে— কারণধর্ম, বিরুদ্ধ ধর্ম, অবিরুদ্ধ ধর্ম— ব্রহ্মেই সকলের পর্যবসান এবং চরম সমাধান।

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায় : দ্বিতীয় পাদ

এই পাদে জড়বাদের খণ্ডন করিয়াছেন। জড়বাদের খণ্ডন গ্রন্থের বহুস্থানেই আছে। চৈতন্যময় এক মহাসত্তা পরব্রহ্ম জগৎসৃষ্টির কারণ, চৈতন্যহীন কোন বস্তু নহে। ইহাই বেদান্তের মূল কথা। সাংখ্যশাস্ত্র-মতে জড়া প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। এইজন্য জড়বাদের খণ্ডনকেই সকল ভাষ্যকারেরা সাংখ্যের খণ্ডন ধরিয়া ব্যাখ্যাদি করিয়াছেন।

সূত্র মধ্যে কোথাও সাংখ্য শব্দের উল্লেখ নাই। সূত্রসমূহকে আচার্য শঙ্কর যেভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তৎপরবর্তী সকল আচার্যপাদগণ কি অদ্বৈতবাদী কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী কি ভেদাভেদবাদী সকলেই প্রায় সেইভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। খণ্ডন-মণ্ডনের ধারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। দুইটি সূত্রকে একটি সূত্র ধরিয়া লওয়া, একটি সূত্র দুইটি করিয়া ভাঙ্গিয়া লওয়া, পূর্বপক্ষকে উত্তরপক্ষীয় সূত্র বলা, উত্তরপক্ষকে পূর্বপক্ষীয় সূত্র বলা— এইরূপ কতিপয় স্থান আছে বিভিন্ন আচার্য পাদগণের ভাষ্যে অনুভাষ্যে। কিন্তু কোন অধ্যায় বা পাদ বা পাদাংশের মুখ্য বক্তব্য কি— তদ্‌বিষয়ে মতান্তর বিশেষ কোথাও দৃষ্ট হয় না। আচার্য শঙ্করই প্রধান পথপ্রদর্শক। কোন মতের দিকে আনুগত্য না করিয়া বেদান্তানুশীলন করা অতি কঠিন। তবু আমরা এই নিবন্ধে নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

১। রচনানুপপত্ত্যধিকরণ—

সূত্র— রচনাঽনুপপত্তেশ্চ নানুমানম্।। ২/২/১

জড়া প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি— এইকথা সাংখ্যদর্শনের উক্তি। এইকথা বেদশাস্ত্রে নাই। যাহা বেদে আছে তাহা প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ। যাহা বেদে নাই তাহা অনুমান মাত্র। অনন্যোপায় না হইলে অনুমান করিব কেন ? প্রথম অধ্যায়ে প্রথম পাদে 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' সূত্রে ভাষ্যকাররা অশব্দ অর্থ অবৈদিক ধরিয়াছেন ও সাংখ্যকে লক্ষ্য করিয়া বিশ্বজগতের নির্মাণে যে অপূর্ব শৃঙ্খলা তাহার সঙ্গে অনুপপত্তি হয় অর্থাৎ অসঙ্গতি হয় যদি অবৈদিক অনুমান গ্রহণ করি। তাহার তাৎপর্যও এই জড়া

প্রকৃতি হইতে এই বিশ্বরচনা, এই কথার সঙ্গে পরিদৃশ্যমান বিশ্বের পারিপাট্য সঙ্গতিহীন হয়। বিশ্বরচনায় সুনিয়ন্ত্রণতা অনুধাবন করিলে স্বতঃই অনুভূতি জাগে যে, ইহার মূলে কোন বিরাট চৈতন্যসত্তা ক্রিয়মাণ। যেমন দৃষ্টান্ত—শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহার ক্ষুধা- নিবৃত্তি প্রয়োজন, ইহা নিপুণভাবে বিবেচনা করিয়া মাতৃস্তন্যে দুগ্ধের আয়োজন। ইহা কোন চৈতন্যসত্তা ছাড়া জড়বস্তুর পক্ষে সম্ভবপর নহে।

সূত্র— **প্রবৃত্তেশ্চ**॥ ২/২/২

কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইতেই চৈতন্যের প্রয়োজন। সুতরাং সৃষ্টির কারণ জড় নহে, চৈতন্যই। ব্রহ্মবস্তুর ইচ্ছা বা সংকল্প ব্যতীত জগৎ-রচনার প্রয়োজনই জাগিতে পারে না।

সূত্র— **পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি**॥ ২/২/৩

জড়বাদী বলিতে পারেন, দুগ্ধ অচেতন। স্তন হইতে তাহার ক্ষরণ হয় শিশুর দেহপুষ্টির জন্য স্বতঃ আপনা-আপনি। চৈতন্য স্বীকারের প্রয়োজন কোথায় ? 'তত্রাপি' শব্দটি দ্বারা বুঝাইতেছেন এই আপত্তির উত্তর। শ্রুতি এই কথা মানেন না। বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলিয়াছেন অন্তর্যামী প্রকরণে— পরমাত্মা পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আদিত্য দিবা চন্দ্র তারা তেজ ইত্যাদি সর্বভূতে সতত অবস্থিত। তিনি বস্তু সকল হইতে পৃথক্। অথচ তাহারা কেহই তাঁহাকে জানে না। 'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি'....ইত্যাদি। (বৃহদারণ্যক, ৩/৮/৯)

সূত্র— **ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ**॥ ২/২/৪

ব্যতিরেক+অনবস্থিতেঃ+চ+ অনপেক্ষত্বাৎ॥

জড়বাদী বলেন প্রকৃতি কাহারও অপেক্ষা না করিয়া স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়। এই কথা স্বীকার করিলে কখনও সৃষ্টির ব্যতিরেক অর্থাৎ প্রলয় হইতে পারে না। সাংখ্যশাস্ত্র বলেন, প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির আরম্ভ। আবার সাম্যাবস্থায় পৌঁছিলেই প্রলয়। এই সাম্যাবস্থায় নাশ ও আবার সাম্যাবস্থায় ফিরিয়া আসা স্বতঃসম্ভবে না কোন চৈতন্যবস্তুর সংস্পর্শ ব্যতীত। তৎপর্য, এই জড়বস্তু দ্বারা সৃষ্টিও সম্ভবে না, সৃষ্টির নাশও সম্ভবে না। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়— কোন ব্যাপারই জড়বস্তু করিতে পারে না। সে একই অবস্থায় থাকিতে পারে। প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি কোনটাই জড়ে থাকিতে পারে না।

সূত্র— **অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ**॥ ২/২/৫

যদি কেহ আপত্তি তুলেন, ধেনু কর্তৃক ভক্ষিত তৃণ অন্যের সাহায্য বিনা দুগ্ধরূপে পরিণত হয়। তাহা হইলে দেখা যায় জড়বস্তুও অন্য-নিরপেক্ষভাবে কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে। তদুত্তর বলিতেছেন— তৃণ যে দুগ্ধ হয় তাহা ধেনুতেই, বৃষতে হয় না। কতকগুলি ঘাস- তৃণ-জল প্রাঙ্গণে স্তূপ করিয়া রাখিলে তো দুগ্ধ হয় না। সুতরাং ধেনু-ভক্ষিত তৃণাদির দুগ্ধত্ব প্রাপ্তি ঈশ্বর-ইচ্ছা ছাড়া হয় না। ঈশ্বরানুগ্রহেই জড়া প্রকৃতি হইতে বিশ্বের উৎপত্তি হইতে পারে, অন্যথায় পারে না।

সূত্র— অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ।। ২/২/৬

অভ্যুপগমে অর্থাৎ স্বীকার করিলেও 'অর্থাভাবাৎ'— প্রয়োজনাভাব। সাংখ্যাচার্য বলেন, প্রধান নিরপেক্ষভাবে জগৎ রচনা করিতে পারে, পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্য। ইহা স্বীকার করিলেও কিছু লাভ নাই কারণ, সাংখ্যের পুরুষ স্বরূপতঃই চৈতন্যময়। সুতরাং নিত্যমুক্ত। তাঁহার ভোগ ও মুক্তি অর্থহীন।

সূত্র— পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ, তথাপি।। ২/২/৭

যদি বল, অন্ধ-পঙ্গুর ন্যায়ে কার্য হইবে। পঙ্গুপুরুষ যেমন কেবল নিকটবর্তী থাকিয়া অন্ধপুরুষকে পরিচালিত করে— চুম্বক যেমন নিজে নিস্পন্দ থাকিয়া লৌহে স্পন্দন সৃষ্টি করে, সেইরূপ নিষ্ক্রিয় পুরুষের সান্নিধ্যে অচেতনা প্রকৃতিও জগৎ নির্মাণ করিতে পারে। সাংখ্যাচার্যের এই কথা খণ্ডন করিতে সূত্রকার বলিতেছেন— অন্ধ ও পঙ্গু দুইজনই চেতন। একজনের উপদেশ দিবার ক্ষমতা আছে, অপরজনের উপদেশ গ্রহণের ক্ষমতা আছে। প্রকৃতি-পুরুষের বেলায় এক অচেতন, অন্য চেতন, সুতরাং দৃষ্টান্ত ঠিক নহে। চুম্বক-লোহার দৃষ্টান্তে দুই-ই অচেতন, অধিকন্তু চুম্বক লোহাকে আর্কষণ করে অন্য কোন চেতন ব্যক্তি তাহাদের নিকটবর্তী করিয়া দিলে। পুরুষ প্রকৃতির সান্নিধ্য কে করিয়া দিবে? সর্বদাই সান্নিধ্যে থাকে— তাহা হইলে সর্বদাই সৃষ্টি চলিত। কখনও প্রলয় ঘটিত না। সুতরাং পুরুষের মোক্ষ লাভ অসম্ভব হইবে।

সূত্র— অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ।। ২/২/৮

সাংখ্যেরা গুণত্রয়ের মধ্যে কোন অঙ্গীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, অর্থাৎ গুণত্রয়ের মধ্যে একটি অঙ্গী বাকী দুইটি অঙ্গ এইরূপ কথা সাংখ্যে অস্বীকৃত।

সূত্র— অন্যথাঽনুমিতৌ চ জ্ঞ-শক্তি-বিয়োগাৎ।। ২/২/৯

এই প্রসঙ্গে যতই কারণ উপন্যাস করা হউক না কেন, জ্ঞান-শক্তির অভাববশত জগৎ কারণ হইতে পারে না।

সূত্র— বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্।। ২/২/১০

পরস্পর বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদিত হওয়ায় সাংখ্যদর্শন অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সূত্রটি এই অধিকরণের শেষ সূত্র। শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি দ্বারা অগ্রাহ্য সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি জগৎ কারণ নহে। "পূর্বোত্তরবিরোধাচ্চেদং কপিল-দর্শনমসমঞ্জসং নিঃশ্রেয়স-কামৈ-র্হেয়মিত্যর্থঃ।" গোবিন্দ-ভাষ্য।

সাংখ্য দর্শন খণ্ডন করিয়া সূত্রকার কণাদ ঋষির বৈশেষিক দর্শন খণ্ডন করিতেছেন। সূত্রে কোথাও বৈশেষিক দর্শন কথার উল্লেখ নাই। সূত্রের মর্ম হইতে ভাষ্যকারগণ বুঝিয়া লইয়াছেন। এক বিষয় শেষ হইল পরবর্তী আর এক বিষয় আরম্ভ হইল এরূপ কোন সঙ্কেতও সূত্রে নাই।

২। মহদ্দীর্ঘাধিকরণ—

সূত্র— মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাম্।। ২/২/১১

সূত্র— উভয়থাঽপি ন কর্মাতস্তদভাবঃ।। ২/২/১২

কণাদ মতে পরমাণু হইতে বিশ্বসৃষ্টি। ইহার খণ্ডন না করিলে বেদান্ত-মত— 'ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টি'— মত স্থাপিত হইতে পারে না। বর্তমান পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানও বহু বর্ষ পরমাণুবাদের উপর স্থাপিত ছিল। এখনও সম্পূর্ণ যায় নাই। পরমাণু অংশ, তাহার অংশ আবিষ্কৃত হইলেও— ইলেকট্রন, প্রোটন— সবই জড়। সুতরাং বর্তমান বিজ্ঞান এখনও জড়বাদের উপর স্থাপিত। পূর্বে যে সাংখ্যমত খণ্ডনে জড়বাদ খণ্ডন করা হইয়াছে তাহাও বর্তমান কালে অতি প্রাসঙ্গিক। বিজ্ঞান এখন খুব অস্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন, ইলেকট্রন, প্রোটনগুলির চেতনাশক্তি আছে এইরূপ মনে হয়। এই সংবাদ যদি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানের জড়বাদ ত্যাগ হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

বৈশেষিক পরমাণুও জড়। সুতরাং জড়বাদ খণ্ডনেই উহা খণ্ডিত হয়। সেই সকল খণ্ডনের যুক্তি পরমাণুবাদেও খাটিবে। তথাপি খণ্ডনার্থ অন্য যুক্তির অবতারণা করা হইতেছে।

পরমাণু দৃষ্টির গোচরীভূত নহে। দুই পরমাণু মিলিয়া এক দ্ব্যণুক। ইহার পরিমাণ হ্রস্ব। তিন দ্ব্যণুক মিলিত এক ত্র্যণুক। ইহার পরিমাণ

মহৎ। এই মতের বিরুদ্ধে বেদান্তের সমালোচনা এই যে, পরমাণু যখন নিরবয়ব তখন দ্ব্যণুকও নিরবয়ব। তাহা হইলে ত্র্যণুকও নিরবয়ব। তাহারা কেহই অবয়বী নহে। সুতরাং তাহা হইতে স্থূল জগতের উৎপত্তি অসম্ভব। সুতরাং বৈশেষিকমত সামঞ্জস্যহীন। বেদান্ত পরমাণুবাদ স্বীকার করে না। বৈশেষিকেরা বলেন, পরমাণুর প্রথম স্পন্দনের হেতু জীবাত্মার অদৃষ্ট। বেদান্ত বলেন, জীবগত অদৃষ্ট, পরমাণু-গত স্পন্দনের হেতু হইতে পারে না। বেদান্ত বলেন, সৃষ্টি সার্থক একমাত্র সর্বশক্তিমান পরব্রহ্মের ইচ্ছাবশতঃ। ভগবদিচ্ছা বা সংকল্প সৃষ্টির মূলকারণ একথা স্বীকার না করায় বেদান্ত বৈশেষিক মতবাদ উপেক্ষা করিয়াছেন।

সূত্র— সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥ ২/২/১৩

সূত্র— নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥ ২/২/১৪

বৈশেষিক মতে সমবায় নামক একটি পৃথক্ বস্তু আছে। অবয়বের সহিত অবয়বীর যে সম্বন্ধ তাহা সমবায় সম্বন্ধ। দ্রব্যের সহিত জাতি-গুণ-কর্মাদির সম্বন্ধ রক্ষার্থ সমবায় স্বীকার করা হয়। বেদান্ত আপত্তি করেন— দ্রব্যের সহিত সমবায়ের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে তাহা হইলে আর একটি সমবায় স্বীকার করিতে হয়। এবং তাহার সম্বন্ধের জন্য আর একটি সমবায় স্বীকার করিতে হয়— এইরূপ হইলে অনবস্থা দোষ হয়। সুতরাং সমবায় স্বীকৃতিতে অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। কণাদ সমবায়কে নিত্য বলেন। তাহা হইলে সৃষ্টিও নিত্য হয়। কিন্তু কণাদ জগৎকে নিত্যবস্তু বলেন না। জগৎ অনিত্য তাহা হইলে সমবায়ের নিত্যত্ব সামঞ্জস্যহীন।

সূত্র— রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্যয়ো দর্শনাৎ ॥ ২/২/১৫

সূত্র— উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ২/২/১৬

ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ ইত্যাদির শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি গুণ আছে। কিন্তু পরমাণুতে রূপ-রসাদি গুণ নাই। ইহা কিরূপে সম্ভব? রূপাদি থাকিলে নিরবয়ব হইতে পারে না। রূপাদি স্বীকার করিলেও দোষ, না করিলেও দোষ। যেহেতু কারণের গুণ কার্যে থাকিবেই। পরমাণু রূপাদি যুক্ত না হইলে জল-বায়ু-ক্ষিতিতে ঐ সব গুণ থাকিবে কিরূপে?

সূত্র— অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥ ২/২/১৭

অপরিগ্রহাৎ অর্থাৎ মনু প্রভৃতি বেদানুবর্তিগণ দ্বারা গৃহীত না হওয়ায় কণাদের পরমাণুবাদ উপেক্ষণীয়।

২/২/১৮ সূত্র হইতে ২/২/৩২ এই পঞ্চদশটি সূত্র বেদান্তের বৌদ্ধমত খণ্ডন।

৩। সমুদায়াধিকরণ—

সূত্র— সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ ॥ ২/২/১৮

আক্ষরিকার্থ— সমুদয় স্বীকার করিলেও জগৎস্বরূপ সমুদায়ের অসিদ্ধি হইতেছে।

সূত্র— ইতরেতর প্রত্যয়ত্বাদুপপন্নমিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্র-নিমিত্তত্বাৎ ॥ ২/২/১৯

অক্ষরার্থ— 'ইতরেতর প্রত্যয়ত্বাদিতি চেৎ ন'— পরস্পর হেতু হেতুমদ্ভাবাপন্ন এইরূপ সংঘাত যুক্তিযুক্ত— এই যাহা বলিয়াছ তাহা সঙ্গত নহে কারণ, 'উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ'। পূর্ব পূর্ব নির্দিষ্ট পদার্থ পর পর নির্দিষ্ট কার্যের উৎপত্তি মাত্রের প্রতি কারণ হইতে পারে।

সূত্র— উত্তরোৎপাদে চ পূর্বনিরোধাৎ ॥ ২/২/২০

অক্ষরার্থ— 'উত্তরোৎপাদে চ'— পরক্ষণে কার্য জন্মিতে থাকিলে, 'পূর্বানিরোধাৎ'— সেই কার্যের পূর্বক্ষণে কারণ বিনষ্ট হইয়া যায়।

সূত্র— অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা ॥ ২/২/২১

অক্ষরার্থ— উপাদান কারণ পূর্বে না থাকিলে যদি কার্যোৎপত্তি হয় বল, তবে প্রতিজ্ঞোপরোধে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইয়া পড়িল। যদি বল অসৎ উপাদান হইতে কার্যোৎপত্তি, তবে কার্য-কারণের যৌগপদ্য হইয়া যায়।

সূত্র— প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ॥
২/২/২২

অক্ষরার্থ— ভাব পদার্থগুলির বুদ্ধিপূর্বক যে ধ্বংস তাহা প্রতি-সংখ্যা-নিরোধ— ইহার অপ্রাপ্তি— অর্থাৎ দুইটি নিরোধ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কেন ? অবিচ্ছেদত্বাৎ— সদ্বস্তুর ধ্বংস হয় না। অবস্থান্তর প্রাপ্তিই তাহাদের উৎপত্তি ও বিনাশ।

সূত্র— উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ২/২/২৩

অক্ষরার্থ— মুক্তি কি সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইতে উৎপন্ন নাকি তত্ত্বজ্ঞানকে অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই উৎপন্ন হয় ? উভয় পক্ষেই দোষ আছে।

সূত্র— আকাশে চাবিশেষাৎ ॥ ২/২/২৪

আকাশ বিষয়ে যে নিরুপাখ্যতা তাহাও সম্ভব হইতেছে না কারণ, পৃথিবী প্রভৃতির ন্যায় অবিশেষে তাহার প্রতীতি হইতেছে!

সূত্র— **অনুস্মৃতেশ্চ**।। ২/২/২৫

পূর্বানুভূত বস্তুবিষয়ক যে স্মৃতি অর্থাৎ ইহা সেই বস্তু এইরূপ যে প্রত্যভিজ্ঞা— ক্ষণিক পদে তাহা অনুপপন্ন।

সূত্র— **নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ**।। ২/২/২৬

অক্ষরার্থ— বিনষ্ট পদার্থের আকার জ্ঞান হইতে পারে না কারণ, ধর্মী বিনষ্ট হইলে ধর্মের অন্যত্র স্থিতি কুত্রাপি দেখা যায় না।

সূত্র— **উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ**।। ২/২/২৭

অক্ষরার্থ— অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি স্বীকার করিলে যাহারা উদাসীন উপায়হীন তাহাদেরও কার্যসিদ্ধি হইত পারে।

৪। **উপলব্ধ্যধিকরণ—**

সূত্র— **নাভাব উপলব্ধেঃ**।। ২/২/২৮

অক্ষরার্থ— বাহ্য পদার্থের অভাব বলিতে পার না— কি জন্যে, উপলব্ধেঃ। "ঘটের জ্ঞান" এই কথায় ঘট ও জ্ঞান দুই পদার্থের উপলব্ধি হয়।

সূত্র— **বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ**।। ২/২/২৯

অক্ষরার্থ— বৈধর্ম্যবশতই অর্থাৎ জাগ্রদ্‌দশা ও স্বপ্ন দশার পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মবশত 'স্বপ্নাদিবৎ' স্বপ্ন দৃষ্টান্তে জাগরণের ব্যবহার সিদ্ধি হইতে পারে না।

সূত্র— **ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ**।। ২/২/৩০

অক্ষরার্থ— ভাবঃ ন- বাসনার সদ্ভাব সম্ভব নহে। কি হেতু— 'অনুপলব্ধেঃ।' বাহ্য পদার্থের উপলব্ধির অভাববশত বাসনা হইতেই পারে না।

সূত্র— **ক্ষণিকত্বাচ্চ**।। ২/২/৩১

অক্ষরার্থ— বাসনাশ্রয় পদার্থ ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় সংস্কারবাদে দোষোদ্ধার হইতেছে না।

৫। **সর্বথাঽনুপপত্ত্যধিকরণ—**

সূত্র— **সর্বথাঽনুপপত্তেশ্চ**।। ২/২/৩২

অক্ষরার্থ— শূন্যকে সৎস্বরূপ, অসৎস্বরূপ অথবা সদসদ্‌ স্বরূপ যাহা কিছু বলিবে কোন প্রকারই অভিমত সিদ্ধ হইবে না। কারণ

'অনুপপত্তেশ্চ' তাহাতে যুক্তির অভাব।

এই পনেরটি সূত্রে আচার্যপাদগণ সকলেই বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছেন। ইহাতে বৌদ্ধমত বা কোন্‌টি কোন্ মতের খণ্ডন তাহা সূত্র-পাঠ-মাত্র জ্ঞান হয় না। সূত্রগুলির আক্ষরিক অর্থ পাশে পাশে দিলাম। এই অনুবাদে গোবিন্দভাষ্যকে অনুসরণ করিয়াছি। কাহাকেও অনুসরণ না করিয়া সূত্রের অক্ষরগত অর্থও লেখা অসম্ভব। এখন আমাদের মোটামুটি জানিয়া লওয়া বৌদ্ধমত কি? তাহার কতগুলি বিভাগ এবং প্রত্যেকের মূল কথাটি কি?

বেদান্তের মূল কথা অফুরন্ত সত্তা, অনন্ত চেতনা, অসীম আনন্দ এই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। তাহার বহু হইবার সঙ্কল্প জাগিল। এই সঙ্কল্প হইতেই বিশ্ব প্রপঞ্চের প্রকাশ। যাহা কিছু আছে সবই ব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠিত।

এই কথা এই পরমসত্তা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব নীরব। এই ব্রহ্মসত্তা লইয়া বিচার করিবার কোনও প্রয়োজন আছে ইহাই বুদ্ধদেব স্বীকার করেন না।

এক শিষ্য জিজ্ঞাসা করেন, ঈশ্বর কি আছেন?

বুদ্ধদেব নীরব।

আবার জিজ্ঞাসা করেন, তবে কি ঈশ্বর নাই?

বুদ্ধদেব এবারও নীরব।

উভয় প্রশ্নেই নীরবতা অবলম্বনের কারণ কি, আর এক শিষ্য জানিতে চাহেন। বুদ্ধদেব যাহা উত্তর দিলেন তাহার তাৎপর্য এই, যাহা চিন্তার অতীত, মানবীয় ভাবনার অতীত, তাহা লইয়া কোন কথা বলা, কোন তর্ক-বিচার করা অনর্থক। তিনি বলেন, কোনও গৃহে যদি আগুন লাগে তখন উপস্থিত লোকজনদের কি কর্তব্য? আগুন নিভানো। অগ্নিলাগা ঘরের মধ্যের মানুষগুলি ও দ্রব্যগুলি বাঁচানো—নাকি আগুন কোথা হইতে আসিল, কে লাগাইল, ইহা লইয়া তর্ক বিচার করা?

এইসব করার সময় কোথায়? প্রয়োজনই-বা কি? আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ তাপজ্বালায় জগৎ-জীব পরিতপ্ত। প্রত্যেক নরনারী জর্জরিত। জন্ম-মৃত্যু-জরা ব্যাধির ভীষণ কবলে সকলেই পতিত। এখন মানুষের কর্তব্য কি? কেন সৃষ্টি করিল, কে সৃষ্টি করিল, তিনি কোথায় থাকেন, তিনি সগুণ না নির্গুণ, সাকার

না নিরাকার, দয়াল না নির্দয়, না উদাসীন, ইহা লইয়া অনর্থক গবেষণা করা, নাকি কিসে নরনারী তাপজ্বালা দুঃখ কষ্ট আধি-ব্যাধি হইতে রক্ষা পাইবে তাহার চেষ্টা করা ?

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা একান্তভাবেই অপ্রয়োজনীয়। দুঃখ-কষ্ট কিসে দূর হইবে— ইহাই একমাত্র জিজ্ঞাস্য। ইহাই একমাত্র জ্ঞাতব্য। দুঃখের কারণ অনুসন্ধান ও দুঃখ দূর করার উপায় উদ্ভাবন করিয়া মানুষকে তাহা জানাইয়া দিয়া— তাহার দুঃখ-তাপ দূর করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা— ইহাই সর্বতোভাবে কর্তব্য। বলা বাহুল্য, বুদ্ধদেবের জীবনসাধনা ইহাই।

বুদ্ধদেব হিন্দুর গৃহে জন্মিয়াছিলেন, মৃত্যু পর্যন্ত হিন্দুই ছিলেন— আজও হিন্দুরা তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া মানেন। বুদ্ধদেব হিন্দুর দেবদেবী মানিতেন, তাঁহাদিগকে সজীব মনে করিতেন। বর্ণাশ্রম মানিতেন। গুণগত জাতিভেদ মানিতেন। যজ্ঞে পশুবধের ঘোর বিরোধী ছিলেন। যে কোন প্রকারে প্রাণীকে আঘাত করার তিনি তীব্র বিরোধী ছিলেন। পশুর জন্য চিকিৎসালয় (পিঞ্জরাপোল) তিনি পৃথিবীতে প্রথম স্থাপন করেন। উপনিষদের শিক্ষা উপদেশ মানিতেন। কেবল মানিতেনই না, উপনিষদের শিক্ষা উপদেশের সঙ্গেও তাঁর কোন বিশেষ পার্থক্য ছিল না।

আমরা জানি বৌদ্ধধর্মের মূল গ্রন্থের নাম 'ত্রিপিটক'। বস্তুতঃ ত্রিপিটক বেদ-বাইবেলের মত কোন গ্রন্থের নাম নহে। বুদ্ধদেব কোন গ্রন্থ লিখেন নাই। তাঁহার শ্রীমুখের বাণী বহু, তাহা দিয়াছেন বহু ভক্ত- শিষ্যকে। তাঁহার মৃত্যুঃ পর বাণীগুলি নিয়া নানা তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হয়। এইজন্য কয়েক বৎসরের মধ্যেই অজাতশত্রুর রাজত্বকালে রাজগৃহে বিরাট একটি অধিবেশন হয়। তখন যাহার যাহা জানা আছে সেই বাণীগুলি লিপিবদ্ধ হয় ও তিন ভাগ করিয়া রাখা হয়। যেগুলি শুদ্ধ উপদেশ— সেগুলির নাম 'অভিধর্ম', তাহা এক পেটিকায় রাখা হয়। যেগুলি আবার পদ্ধতি সেগুলি আর একটি পেটিকায় রাখা হয়, তাহার নাম 'বিনয়', আর যেগুলি আখ্যায়িকা জাতীয় সেগুলিকে বলা হয় 'সূত্র', তাহা আর এক পেটিকায় রক্ষা করা হয়। তিনটি পেটিকায় রক্ষিত হয় বলিয়া নাম হয় 'ত্রিপিটক'। বুদ্ধভক্তগণের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় দুইশত বৎসর পর বৈশালীতে।

বুদ্ধদেবের মতে, তিনি দীর্ঘদিন কঠোর তপস্যায় যে সত্য উপলব্ধি

করিয়াছেন, যেসব উপদেশ দিয়াছেন— তাহা যথাযথ পালন করিলে নির্বাণ লাভ হইবে। নির্বাণই পরম পুরুষার্থ। 'ব্রহ্মনির্বাণ' শব্দটি গীতায় একবার আছে। 'ব্রহ্মনির্বাণ' এই শব্দটিই আছে।

বুদ্ধদেব বলিতেন, আমার উপদেশ অন্ধবিশ্বাসে মানিয়া লইতে হইবে না। বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বিচারপূর্বক গ্রহণীয়। বুদ্ধদেবের উপদেশ প্রধানতঃ নীতিভিত্তিক। পরবর্তীকালে দার্শনিকতা প্রবেশ করে। তত্ত্ববিচার লইয়া মতভেদ হওয়ায় বৌদ্ধগণ দুইভাগ হইয়া যায়। হীনযান ও মহাযান। হীনযানেরা দুইভাগ— বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক। মহাযানেদেরও দুইভাগ— যোগাচার ও মাধ্যমিক।

এই চারিমতেরই খণ্ডন বেদান্তদর্শনে দৃষ্ট হয়। এই চারিপ্রকার বিভাগের অনেক পূর্বে বেদান্তদর্শন বা ব্রহ্মসূত্র রচিত হয়। গীতায় ব্রহ্মসূত্রের নাম আছে। সুতরাং পরবর্তী মতগুলি, বহু পূর্ববর্তী বেদান্ত খণ্ডন করিল কিভাবে ?

ইহার উত্তর এইরূপে হইতে পারে। ওই ওই মতগুলি বহুপূর্বে ছিল। হয়তো বীজাকারে ছিল। গৌতম বুদ্ধের পূর্বে আরও ২৪ বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। গৌতম বুদ্ধ পঞ্চবিংশতিতম বুদ্ধ। পূর্ববর্তী ২৪ জন বুদ্ধের প্রবর্তিত মত গৌতম বুদ্ধ অব্যাহত রাখিয়াছেন এই কথা বলা হয়। গীতোক্ত অবতারবাদের মতে ধর্মের গ্লানি হইলেই একজন বুদ্ধ (জ্ঞানী) আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ষড়বিংশতিতম বুদ্ধ হইবেন মৈত্রেয় ঋষি একথা গৌতম বুদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন।

গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী যে ২৪ জন অতীতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের শিক্ষার মধ্যে উক্ত বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক মত-সকলের বীজ থাকিতে পারে। সেই বীজ ধরিয়া বেদান্তসূত্রে ওই মত সকল খণ্ডন করা হইয়াছে— এইরূপ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু মতগুলি খণ্ডন-মণ্ডনের যে চেহারা তাহাতে মতগুলি পূর্ণাঙ্গভাবে না পাইলে করা সম্ভব নয়। সূত্র মধ্যে যাঁহাদের মত খণ্ডিত হইতেছে তাঁহাদের নামগন্ধ নাই। নাম উল্লেখ করিয়াছেন ভাষ্যকারেরা। আদি ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য। অল্পবিস্তর পরিবর্তন করিয়া পরবর্তী ভাষ্যকারেরা সকালেই তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। খুব সম্ভব শঙ্করাচার্যের সময় ওই সকল বৌদ্ধমত পূর্ণাঙ্গরূপে প্রচলিত ছিল। সূত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া বিস্তর কথা লেখা হইয়াছে। এই সূত্রগুলির অর্থ তাৎপর্য লিখিতে হইলে কোনও ভাষ্যকারের অনুসরণে লিখিতে হইবে। স্বাধীন ভাবনার

বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকিবে না। আমি সূত্রগুলি উল্লেখ ও সহজ অর্থ যাহা বোধগম্য হয় তাহাই লিখিলাম। বৌদ্ধমতের খণ্ডন সম্বন্ধে যে কথা, জৈনমত খণ্ডন সম্বন্ধেও সেই একই কথা।

চক্ষুর সম্মুখে যে ঘটটি দেখিতেছি, উহা বাহ্যবস্তু। আমার মনের মধ্যে একটি ঘটের চেহারা আছে ঐটি আন্তর বস্তু। বৌদ্ধ-বৈভাষিকগণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্থূল বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বৌদ্ধ-সৌত্রান্তিকগণ প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্তুকে স্বীকার করেন কিন্তু বলেন, প্রত্যক্ষ- দৃষ্ট বস্তু, বস্তুর প্রত্যক্ষ নহে উহা অনুমানে সিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে জানি আন্তর বস্তুকেই। বৌদ্ধ-যোগাচারগণ বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ব একেবারেই অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, অন্তরের বুদ্ধিস্থ জ্ঞানই বাহিরে ঘটাদি বিষয়াকারে প্রতীত হয়। বস্তুতঃ বিজ্ঞানাতিরিক্ত কোন পদার্থ নাই। বৌদ্ধ-মাধ্যমিকগণ বাহ্য-আন্তর কোন বস্তুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন শূন্যই প্রকৃত সত্য।

যাঁহারা বাহ্যবস্তুকে স্বীকার করেন— তাঁহারাও বলেন যে, সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক। উৎপত্তির পর এক ক্ষণের অধিক কোন বস্তু স্থায়ী হয় না।

প্রধানতঃ ক্ষণিকবাদের দুর্বলতা অবলম্বন করিয়াই বৈদান্তিকেরা বৌদ্ধমতকে খণ্ডন করিয়াছেন। বেদান্তী বলেন, ক্ষণিক বস্তুতে যাহার স্থিরত্ব বুদ্ধি হয়— সেও যদি পরক্ষণেই বিনষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে বিজ্ঞান-ধারাও অসম্ভব হয়। জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান কিছুই থাকে না। কোন দার্শনিকতাই সম্ভব হয় না। ক্ষণিক বস্তুসমূহের পিছনে একটি স্থিরতর বস্তুও যদি স্বীকার না করা যায় তাহা হইলে ক্ষণিককে ক্ষণিক বলিয়া জানিব কেমনে? জানিবেই বা কে? স্থির আশ্রয় না থাকিলে শুধু জ্ঞানই অসম্ভব নহে, সৃষ্টিও অসম্ভব। বেদান্ত এক নিত্য-সত্য-সত্তাকে, চির-বিদ্যমান বলিয়া স্বীকার করে।

বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ববাদী বৈভাষিক, বাহ্যবস্তু ও বুদ্ধি বিজ্ঞানবাদী সৌত্রান্তিক, শুদ্ধ বিজ্ঞানবাদী যোগাচার ও শূন্যবাদী মাধ্যমিক সব মতই আচার্য শঙ্কর খণ্ডন করিয়াছেন; কিন্তু শেষোক্ত শূন্যবাদ খণ্ডন শঙ্করের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কারণ শঙ্করের নির্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্ম ও মাধ্যমিক নাগার্জুনের 'শূন্যবাদ' প্রায় একই কথা। নাগার্জুন দাক্ষিণাত্য- ব্রাহ্মণ ছিলেন। ধীশক্তি সম্পন্ন দার্শনিক ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়া 'মাধ্যমিক-সূত্র' গ্রন্থ রচনা করেন। মাণ্ডূক্য

উপনিষৎ তাঁহার গভীরভাবে আয়ত্ত ছিল। এই উপনিষদের যুক্তিই নাগার্জুনের সম্পদ্। শঙ্করাচার্যের নির্বিশেষ ব্রহ্মাবাদও মাণ্ডূক্য উপনিষদের বিশেষজ্ঞ গৌড়পাদের কারিকার উপর প্রতিষ্ঠিত।

নাগার্জুন তাঁহার 'মাধ্যমিক-সূত্র' গ্রন্থে শূন্যবাদীকে দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছেন। নাগার্জুনের মতে 'শূন্য' অভাব-পদার্থ নহে। উহা ভাববস্তু এবং একমাত্র পরমার্থ সত্য।

শূন্যতত্ত্ব ভাষাদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। তবে 'শূন্য'-ই বলা হয় কেন ? উত্তর এই — প্রজ্ঞপ্তির জন্য। অর্থাৎ ইহা অন্য সমুদয় বস্তু হইতে একেবারেই পৃথক্ পদার্থ— ইহা জানাইবার জন্য। 'শূন্য' অভাবাত্মক নহে। জাগতিক-বাহ্য-আন্তর যাহা কিছু বস্তু সবই 'শূন্য' তত্ত্বের উপর স্থাপিত।

শাঙ্করীয় 'নেতি নেতি' বিচার দ্বারা সকলই সত্য নহে বলিলে, সকল হইতে পৃথক্ যে একটি বস্তুর অস্তিত্ব আছে, তাহার নিগূঢ় ইঙ্গিত উপলব্ধি হয়। ইহাই শঙ্করের অদ্বৈতবাদের কূটস্থ ব্রহ্ম।

ঋগ্বেদে একটি সূক্ত আছে— 'নাসদীয় সূক্ত'। তাহাতে এই শূন্যতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বের মূলবীজ খুঁজিয়া পাওয়া যায়—

"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্।।
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস।।"

(ঋগ্বেদ, ১০ মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত)

তখন অসৎ ছিল না। সৎ ছিল না। পৃথিবী ছিল না। আকাশ ছিল না। আবরণকারী কিছু ছিল না। দুর্গম গভীর জল ছিল না। মৃত্যুও ছিল না। অমৃতও ছিল না। রাত্রিদিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল একটি মাত্র বস্তু, বায়ুর সহকারিতা শূন্য হইয়া, স্বধার সঙ্গে যুক্ত হইয়া জীবিত ছিল। তিনি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।

সূক্তটি আরও দীর্ঘ। কবিতার মাধুর্যে ও ভাবগাম্ভীর্যে সূক্তটি অতুলনীয়। আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সৃষ্টির পশ্চাতে একটি মহাসত্য বিদ্যমান আছে। তাহাকে সৎ বা অসৎ কিছু বলা যায় না। স্বধার সঙ্গে যুক্ত হইয়া ছিলেন। স্বধা অর্থ যদি করি আত্মাশ্রয়— তাহা হইলে তাৎপর্য হয় এই যে, তিনি অন্য নিরপেক্ষ হইয়া আত্মাশ্রয়ে চির বিদ্যমান।

এই সূত্রের মধ্যে শঙ্করের কূটস্থ ব্রহ্মবাদ ও বৌদ্ধদের মাধ্যমিক সূত্রের নাগার্জুনের শূন্যবাদ দুইই প্রকটিত হইয়া উঠে। ইহা সমুদয় নিষেধের পর্যবসান স্বরূপ। নাগার্জুনের ভাবাত্মক শূন্যও তাহাই।

বৌদ্ধমতের সঙ্গে শঙ্করের মতের এই মিল দেখাইয়াই বৈষ্ণবাচার্যগণ শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্যেরা যাহাই বলুন, শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে ও অনুভাষ্যকারীরা সকলেই শক্তিশালী যুক্তি-তর্ক-বিচার দ্বারা শূন্যবাদকে খণ্ডন করিয়াছেন।

এই সূত্রে শঙ্কর শূন্যবাদীদের প্রশ্ন করেন, শূন্য কি ভাবপদার্থ? শূন্য কি অভাব পদার্থ? শূন্য কি ভাবাভাব পদার্থ? যদি বল শূন্য ভাব পদার্থ— তাহা হইলে শূন্যবাদ ব্যর্থ হইল। যদি বল শূন্য অভাব পদার্থ, তাহা হইলে তাহার বিদ্যমানতা নাই।

শূন্যবাদে তুমি সিদ্ধান্তকারী শূন্য। তোমার তর্ক-বিচারও শূন্য। সুতরাং গ্রহণযোগ্য নহে। যদি বল শূন্য ভাবাভাব বস্তু তাহা হইলে বলিব— পরস্পর বিরোধী বস্তু এক শূন্যে থাকিতে পারে না। সর্বপ্রকারেই শূন্যবাদ অসঙ্গত।

শঙ্করের সমসাময়িক কালে শূন্যবাদ বীজাকারে ছিল। তিনি তাহাই খণ্ডন করিয়াছেন। পরবর্তী শঙ্করবাদীরা বৌদ্ধ-শূন্যবাদ কঠোরভাবে খণ্ডন করিয়াছেন।

বৌদ্ধমত খণ্ডনের পর সূত্রকার জৈনমত খণ্ডন করিয়াছেন।

৬। একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণ—

সূত্র— নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥ ২/২/৩৩

সূত্র— এবঞ্চাত্মাঽকাৎর্স্ন্যম্‌ ॥ ২/২/৩৪

সূত্র— ন চ পর্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ ॥ ২/২/৩৫

সূত্র— অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ॥ ২/২/৩৬

এই চারিসূত্রে জৈনমত খণ্ডন করিয়াছেন।

জৈনধর্মমত এখনও জীবন্ত কিন্তু জৈনদর্শন যথাযোগ্য আলোচনার অভাবে এখন মৃতকল্প। তাহা লইয়া আলোচনা খণ্ডন-মণ্ডন ব্যর্থ মানসিক পরিশ্রম মাত্র।

জৈনধর্ম সংক্ষেপে এই— জৈনরা জন্মান্তরবাদ ও সর্বভূতে একটি

চেতনাযুক্ত জীবসত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই জন্য 'অহিংসা' তাঁহাদের মতে পরমধর্ম। কায়-মনঃ-প্রাণে কোনও প্রকারেই জীবহিংসা না করা জৈনধর্মের বিশেষত্ব। দেবতার অস্তিত্ব বা সর্বোপরি একজন ঈশ্বর তাঁহারা স্বীকার করেন না। তীর্থঙ্করত্ব প্রাপ্তি পরম পুরুষার্থ। বৌদ্ধমতে যেমন বৌদ্ধত্ব প্রাপ্তি, সেই মত জৈনমতে তীর্থঙ্করত্ব প্রাপ্তি জীবের লক্ষ্য। তীর্থঙ্করকে জিন বলা হয়। জিন হইতে জৈন ধর্ম নিষ্পন্ন।

ভাগবতে ঋষভদেবের নাম আছে। সম্ভবতঃ ইনিই প্রথম তীর্থঙ্কর। ইনি পরমহংসধর্ম প্রচার করেন। ঋষভদেব হইতে ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ। বর্ধমান চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর। পূর্বে জৈনদের ধর্মীয় আচরণ ছিল কিন্তু কোনও গ্রন্থ ছিল না। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে পাটলিপুত্রে একটি সমিতির অধিবেশন হয়। তখন জৈনমণ্ডলী তীর্থঙ্করদিগের উপদেশসমূহ সংগৃহীত করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। তারপর খ্রীষ্টীয় ৪৫৪ অব্দে পাটলিপুত্রে সমিতিতে উহা পুনঃসংশোধিত ও লিপিবদ্ধ হয়।

বেদান্ত-সূত্রকার তাঁহার সময়ে যে জৈনমত প্রচলিত ছিল তাহাকে খণ্ডন করিয়াছেন। খণ্ডনের মূল যুক্তি একটি— জৈনমতে পারমার্থিক সত্য বলিয়া কিছু নাই। সবই আপেক্ষিক সত্য। সূত্রকার বলেন, আপেক্ষিক সত্য মানিলেই একটি শাশ্বত সত্তার কথা মনে জাগে। কিন্তু জৈনমতে এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না কারণ, তাঁহারা একটি পরম ব্রহ্মসত্তা মানেন না। এইজন্যই ইহা খণ্ডনীয়।

৭। পশুপত্যধিকরণ—

সূত্র— পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ॥ ২/২/৩৭

জৈনমত নিরসনের পর সূত্রকার পাশুপত্যাদি মত নিরসন করিতেছেন। পশুপতির মত অনাদরণীয় কারণ, সামঞ্জস্যের অভাব। পাশুপত আদি, আদি পদে শৈব, গাণপত্য ও সৌর সকল সম্প্রদায়কেই বুঝাইতেছেন। পশুপদবাচ্য জীবনের পাশ অর্থাৎ বন্ধনের মোচনের জন্য পশুপতি কর্তৃক এই মত প্রবর্তিত হইয়াছে। এই মতে পশুপতিই সংসারের নিমিত্তকারণ। মহদাদি পদার্থ তাঁহার কার্য। ধ্যানের নামই যোগ। ত্রৈকালিক-স্নানাদি বিধি এবং দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি। এই পাঁচটি দ্রব্য স্বীকৃত— কারণ, কার্য, যোগ, বিধি ও দুঃখান্ত। শৈবগণের মতে শিব, গাণপত্যগণের গণেশ, সৌরগণের মতে সূর্যই প্রকৃতি ও কালের সাহায্যে জগৎসৃষ্টি করেন। উঁহারা জগৎকর্তা। তাঁহাদের

উপাসনা দ্বারাই দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ হয়।

সূত্রকার এই সূত্রে বলিয়াছেন— পশুপতি প্রভৃতির সিদ্ধান্ত সংগত নহে, কারণ, উহা সামঞ্জস্যহীন। অর্থাৎ ঐ সিদ্ধান্ত বেদবিরুদ্ধ। বেদে একমাত্র নারায়ণকেই জগৎকর্তা বলিয়াছেন। অন্যান্য দেবতাদের কার্য নারায়ণ বা বিষ্ণুর অধীনতায় নিষ্পন্ন।

সূত্র— **সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ**।। ২/২/৩৮

পতি-র অর্থাৎ পশুপতি, গণপতি, দিনপতি ইঁহাদের জগৎকর্তৃত্ব সম্বন্ধ অনুপপন্ন। যেহেতু তাঁহাদের শরীর নাই।

সূত্র— **অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ**।। ২/২/৩৯

দেহধারী ব্যক্তি কোনও একস্থানে অধিষ্ঠান করিয়া সৃষ্টিকার্য করেন, কিন্তু ঈশ্বরের দেহাদি না থাকায় অধিষ্ঠান নাই, কিরূপে সৃষ্টি করিবেন ?

সূত্র— **করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ**।। ২/২/৪০

ইন্দ্রিয়ের মত প্রধানকে অধিষ্ঠান করতঃ ঈশ্বর (পতি) জগৎ সৃষ্টি করেন— একথা বলিতে পার না। 'ভোগাদিভ্যঃ'— তাহা হইলে দুঃখ-সুখভোগ, জন্ম-মরণ প্রভৃতি সম্বন্ধ হেতু অনীশ্বরত্ব হইয়া পড়ে।

সূত্র— **অন্তবত্ত্বমসর্বজ্ঞতবা**।। ২/২/৪১

ইহা বলিলে তাহার জীবের বিনাশ স্বীকার করিতে হয়। অসর্বজ্ঞতাও হইয়া পড়ে। যদি অদৃষ্টানুরোধে দেহাদি সম্বন্ধ পতির হয় তবে তাঁহার দেহাদি জীবের মত হইয়া পড়ে। কর্মাধীন ব্যক্তির সর্বজ্ঞতাও যুক্তিসঙ্গত হয় না।

৮। **উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণ**—

সূত্র— **উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ**।। ২/২/৪২

সূত্র— **ন চ কর্তুঃ করণম্**।। ২/২/৪৩

সূত্র— **বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ**।। ২/২/৪৪

সূত্র— **বিপ্রতিষেধাচ্চ**।। ২/২/৪৫

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষের এই চারিটি সূত্র লইয়া মত-মতান্তর অনেক। শঙ্করাচার্য বলেন, এইসব সূত্রে পাঞ্চরাত্র মত খণ্ডন করা হইয়াছে।

রামানুজ বলেন, প্রথম দুই সূত্রে পাঞ্চরাত্র মতের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষ তুলিয়া পরবর্তী দুই সূত্রে উহা স্থাপন করা হইয়াছে।

মধ্বাচার্য ও বলদেব বলেন, এই চারিমন্ত্রে শাক্তমত খণ্ডিত হইয়াছে।

কারণ— পাঞ্চরাত্রমত আর ভাগবতমত একই। ব্রহ্মসূত্রকার ও ভাগবতকার একই ব্যক্তি বেদব্যাস বাদরায়ণ। তিনি ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ ভাগবত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে ভাগবতমত খণ্ডন করা অসম্ভব কার্য।

রামানুজের মতও গ্রহণীয় নহে, কারণ, এই পাদটি বেদান্ত-বিরুদ্ধ মতের খণ্ডনের জন্যই। এই খণ্ডনের প্রকরণে কোন মত স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইবেন কেন? রামানুজ নিজেও তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন "পরপক্ষপ্রতিক্ষেপায় অনন্তরঃ পাদঃ প্রবর্ত্ততে।" অর্থাৎ পরমত খণ্ডনার্থ পরবর্তী পাদটি (২য় পাদ) আরম্ভ হইতেছে।

মধ্বাচার্য ও বলদেব বলেন, এই সূত্র কয়টিতে শাক্তমত খণ্ডিত হইয়াছে। শাক্তমতে শক্তি সর্বশক্তিমতী। শক্তি হইতে বিশ্বপ্রপঞ্চের উৎপত্তি। তাহা সম্ভব কি অসম্ভব তাহা নিরসনের জন্য পরবর্তী সূত্র।

সূত্র— **উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ**।। ২/২/৪২

সর্বত্রই দৃষ্ট হয় পুরুষানুগ্রহ ব্যতীত কেবলমাত্র শক্তি হইতে কোন সৃষ্টিই সম্ভব নহে।

সূত্র— **ন চ কর্তুঃ করণম্**।। ২/২/৪৩

এই সূত্রে বলিয়াছেন শক্তির অনুগ্রহের জন্য যদি পুরুষ স্বীকার করা হয় তাহা হইলেও তাহার ইন্দ্রিয়াদি করণ না থাকায় সৃষ্টিকার্য সম্ভব হয় না, যদি বলা যায় যে পুরুষ নিত্যজ্ঞান ও নিত্য ইচ্ছাযুক্ত, তাহা হইলে তো বেদান্তের সঙ্গে একমতই হইয়া গেল। একথা পরবর্তীসূত্রে বলিয়াছেন—

সূত্র— **বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ**।। ২/২/৪৪

সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ পরমপুরুষ স্বীকার করিলে আর শক্তিমত খণ্ডনের প্রয়োজন হয় না। আবার ঐরূপ পুরুষ স্বীকার করিলে শক্তির আর কোন প্রয়োজন থাকে না। একমাত্র ঐ ব্রহ্মপুরুষই সৃষ্টি করিতে সক্ষম।

সূত্র— **বিপ্রতিষেধাচ্চ**।। ২/২/৪৫

এই সূত্রে বক্তব্য এই যে শক্তিবাদের সঙ্গে শ্রুতি-স্মৃতির বিরোধ আছে। গীতাদি শাস্ত্র কোথাও পুরুষ ভিন্ন আর একটি শক্তি স্বীকার করেন নাই। মনুও করেন নাই। এই প্রকারে শাক্তমত খণ্ডিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত।

ব্রহ্মসূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায় : তৃতীয় পাদ

এই পাদে এই জগৎপ্রপঞ্চ যে ব্রহ্মকার্য তা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেখানে শ্রুতিবিরোধ দৃষ্ট হয় তাহার সমাধান করা হইয়াছে।

১। বিয়দধিকরণ—

সূত্র— ন বিয়দশ্রুতেঃ।। ২/৩/১

আকাশের উৎপত্তি নাই। কেননা তৎ সম্বন্ধে শ্রুতি নাই।

ছান্দোগ্য ৬/২/৩ সূত্রে বলিয়াছেন—

"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি, তৎ তেজোঽসৃজত।।"

তিনি সঙ্কল্প করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব, তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। এই মন্ত্রে আকাশের উল্লেখ না থাকায় আকাশ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় নাই। ইহা পূর্বপক্ষ সূত্র। পরবর্তী সূত্রে উত্তর দিয়াছেন।

সূত্র— অস্তি তু।। ২/৩/২

তৈত্তিরীয়-শ্রুতিতে আকাশ উৎপত্তির কথা আছে। যথা— "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ।।" (তৈত্তিরীয়, ২/১/৩)

সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধিসকল, ওষধিসকল হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইল।

ছান্দোগ্যের যে প্রকরণে ৬/২ মন্ত্র অন্তর্নিবিষ্ট, উহা মুখ্যত সৃষ্টি-প্রকরণ নহে। উহা মুখ্যত ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকরণ।

সূত্র— গৌণ্যসম্ভবাৎ।। ২/৩/৩

এখানে আকাশের উৎপত্তির কথা আছে তা গৌণার্থ প্রকাশক। আকাশের উৎপত্তিবোধিকা অন্যান্য শ্রুতিসকল গৌণীমাত্র বুঝিতে হইবে। এইটিও পূর্বপক্ষ সূত্র। ইহার সমর্থনের পরবর্তী সূত্র—

সূত্র— শব্দাচ্চ।। ২/৩/৪

এটিও পূর্বপক্ষ সূত্র। এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, যদি আকাশ উৎপত্তিমান হইত, তাহা হইলে অমৃত বা নিত্য কি প্রকারে হইবে? জন্ম পদার্থ মাত্রেরই ধ্বংস আছে। আকাশ যদি জাত বস্তু হইত, তাহা হইলে শ্রুতি ইহাকে 'অমৃত' বলিয়া নির্দেশ করিতেন না। অতএব ইহা উৎপত্তি নাই।

সূত্র— স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ।। ২/৩/৫

ব্রহ্ম-শব্দ এক-মন্ত্রেই মুখ্য ও গৌণ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। তৈত্তিরীয়ে "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব তপো ব্রহ্মেতি।" অর্থাৎ তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা কর। তপই ব্রহ্ম। এখানে স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, প্রথম 'ব্রহ্ম' শব্দ মুখ্যার্থে এবং দ্বিতীয় 'ব্রহ্ম' শব্দ গৌণার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং 'সম্ভূত' শব্দও ঐরূপ আকাশ পক্ষে গৌণ-অর্থে এবং তেজ-অপ্ আদি-পক্ষে মুখ্য-অর্থে ব্যবহার অসঙ্গত নহে। এইটিও পূর্বপক্ষ সমর্থক সূত্র।

পরবর্তী সূত্রে উপরোক্ত পূর্বপক্ষ সূত্রগুলির উত্তর দেওয়া হইতেছে।

সূত্র— প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাৎ শব্দেভ্যঃ।। ২/৩/৬

যদি আকাশ, ব্রহ্ম কার্যবিধায় তেজঃ, অপ্, ও পৃথিবীর সহিত অভিন্ন হয় অর্থাৎ তেজঃ-অপ্ প্রভৃতির ন্যায় ব্রহ্ম হইতে আকাশের উৎপত্তি অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে এক-বিজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞার অহানি বা সার্থকতা রক্ষা হয়। অতএব পূর্বপক্ষ আকাশের উৎপত্তি গৌণ বলিয়া যে আপত্তি করিয়াছেন তাহা অসঙ্গত।

সূত্র— যাবদ্‌বিকারস্তু বিভাগো লোকবৎ।। ২/৩/৭

পরিদৃশ্যমান সকলই ব্রহ্মাত্মক। আকাশও পরিদৃশ্যমান সমস্তের অন্তর্ভূক্ত সুতরাং আকাশও ব্রহ্মাত্মক হওয়ায় উহার উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতে। সমস্তই ব্রহ্মাত্মক হওয়ায় "ব্রহ্ম তেজঃ সৃষ্টি করিলেন" (ছান্দোগ্য, ৬/২/৩) বলায় আকাশের সৃষ্টি বা উৎপত্তি বারণ করা হইল না।

সূত্র— এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ।। ২/৩/৮

যে সমুদয় যুক্তি, বিচার ও শ্রুতি, প্রমাণে আকাশের উৎপত্তি স্থাপিত হইয়াছে, সেই সমুদয় দ্বারাই বায়ুর উৎপত্তিও প্রতিষ্ঠিত হইল।

সূত্র— অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ।। ২/৩/৯

সৎ বা ব্রহ্ম নিত্য বলিয়া তাহার উৎপত্তির প্রশ্ন উঠিতে পারে না। অতএব 'সৎ' বলিলেই যাঁহার সত্তায় প্রপঞ্চ সত্তাবান্, সেই পরমসত্তা, পরমব্রহ্মকে বুঝায়, তাঁহার উৎপত্তি যে অসম্ভব তাহা বলা

বাহুল্য মাত্র।

২। তেজোঽধিকরণ—

সূত্র— তেজোঽতস্তথা হ্যাহ॥ ২/৩/১০

তৈত্তিরীয় (২/১) "বায়োরগ্নি"। এই মন্ত্রের বলে অগ্নি বায়ু হইতে উৎপন্ন ব্রহ্ম হইতে নহে। ইহা পূর্বপক্ষ সূত্র।

সূত্র— আপঃ॥ ২/৩/১১

তৈত্তিরীয় (২/১) "আগ্নেরাপঃ" বলে, জল ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন নহে। তেজঃ বা অগ্নি হইতে উৎপন্ন। এইটিও পূর্বপক্ষ সূত্র।

সূত্র— পৃথিবী॥ ২/৩/১২

তৈত্তিরীয় (২/১) "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" এই সূত্র হইতে প্রমাণিত হয় পৃথিবী ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন নহে। এইটিও পূর্বপক্ষ সূত্র।

সূত্র— অধিকার-রূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ॥ ২/৩/১৩

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে জল হইতে পৃথিবী সৃষ্টি উল্লিখিত আছে। ইহা হইতে বুঝা গেল, অন্ন ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট নহে। অন্ন ও পৃথিবী একার্থবাচী। এটিও পূর্বপক্ষ সূত্র।

উপরোক্ত পূর্বপক্ষগুলি উত্তর দিতেছেন—

সূত্র— তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ॥ ২/৩/১৪

'অভিধ্যানাৎ' অর্থ সংকল্প হইতে। তেজঃ জল অচেতনের পক্ষে সংকল্প সম্ভব হয় না।

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, ব্রহ্ম যে ভূত সকলের উৎপাদক কারণ মাত্র, তাহা নহে। প্রত্যুত তিনি আপনাকে জগদ্রূপে আকারিত করিয়া তাহার আদি, মধ্যে, অন্তে, অন্তরে, বাহিরে অবস্থানপূর্বক বহু নামরূপে নামরূপবান্ হইয়া আপনার 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' স্বরূপ হইতে বহু হইবার সংকল্পের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন।

সূত্র— বিপর্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ॥ ২/৩/১৫

ব্রহ্মই সমুদায় ভূতে, সমুদায় বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ভূত সকলের বিকারসংঘটন করেন এবং তিনি আপনি আপনাকে জগদাকারে আকারিত করেন। এইজন্য ব্রহ্মই মুখ্য কারণ— নিমিত্ত বটে, উপাদানও বটে। সৃষ্টির যে ক্রমবিপর্যয় পরিলক্ষিত হয় তাহাতে কোনও বিরোধের কারণ নাই।

সূত্র— অন্তরা বিজ্ঞান-মনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ॥

২/৩/১৬

তিনিই যখন সর্বময়, তখন সৃষ্টিক্রমের উক্তি বা অনুক্তি অথবা বিপরীত ক্রমোক্তি কিছুই বিরোধের কারণ নহে। তেজঃ অপ্ প্রভৃতি, শব্দসকল ব্রহ্ম অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কারণ, উহারা কেহই ব্রহ্ম হইতে ব্যতিরিক্ত নহে।

সূত্র— **চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাৎ তদ্ব্যপদেশো ভাক্তস্তদ্ভাব-ভাবিত্বাৎ।।** ২/৩/১৭

জগতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক যাহা কিছু আমরা দেখি, (১) ব্রহ্মের সত্তাতেই উহারা সত্তাবান্, (২) উহারা ব্রহ্মকেই মুখ্যভাবে প্রতিপাদন করে। জগতে যে কোনও ভাষায় যে কোন শব্দ আছে, তাহা মুখ্যরূপে ব্রহ্মেরই বাচক। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,

"ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্তিহ কিঞ্চন"। (ভাগবত, ১০/১৪/৫৬)

অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গম অখিল ভগবদ্রূপ তদ্ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুই নাই।

৩। আত্মাধিকরণ—

সূত্র— **নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ।।** ২/৩/১৮

কঠোপনিষদে আছে—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"

আত্মা জন্মে না, মরে না, কোন কিছু হইতে হয় নাই এবং ইহা হইতেও কেহ জন্মে নাই।

গীতাতেও এই কথাই ব্যক্ত হইয়াছে।

৪। জ্ঞাধিকারণ—

সূত্র— **জ্ঞোঽত এব।।** ২/৩/১৯

আত্মা কেবলমাত্র জ্ঞানস্বরূপ নহে। জ্ঞাতৃস্বরূপও বটে। চৈতন্য, আত্মার আগন্তুক গুণমাত্র নহে। উহা আত্মার স্বরূপ। আত্মা অনুভূতিস্বরূপ। আত্মা অনুভবকর্তাও বটে। এইজন্য জীবের অপর একটি নাম ক্ষেত্রজ্ঞ বা ক্ষেত্রবিৎ।

সূত্র— **উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাম্।।** ২/৩/২০

উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি— জীবাত্মার সম্বন্ধে শ্রুতিতে এবং ভাগবতে উক্তি থাকায় জীবাত্মা সর্বগত বিভু নহেন। ইহার দ্বারা জীবের অণুত্ব সিদ্ধ হইল।

সূত্র— **স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ** ।। ২/৩/২১

শ্রুতিতে গতি ও অগতি স্পষ্টতঃ উল্লেখ থাকায় জীব অণুই বটে।

সূত্র— **নানুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ** ।। ২/৩/২২

আত্মার মহত্ত্ব প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। উহা পরামাত্মার অধিকরণে। জীবাত্মাকে মহান্ বলা হয় নাই। সুতরাং জীবাত্মা অণু পরিমাণই।

সূত্র— **স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ** ।। ২/৩/২৩

স্বশব্দ অণু শব্দের স্পষ্ট প্রয়োগ আছে। জীবাত্মা সম্বন্ধে যথা মুণ্ডকে 'এষোঽণুরাত্মা' (৩/১/৯), শ্বেতাশ্বতরে (৫/৮) 'আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ'। আরা— চর্ম ভেদক সূক্ষ্ম সূঁচের অগ্রভাগের ন্যায় অতিসূক্ষ্ম জীবাত্মা।

সূত্র— **অবিরোধশ্চন্দনবৎ** ।। ২/৩/২৪

চন্দনের ন্যায় বিরোধের অভাব, অল্পাংশ হইয়াও সমস্ত দেহেতে বেদনাদি অনুভব করে আত্মা। ইহাতে বিরোধ হয় না কারণ, চন্দন-বিন্দু যেমন শরীরের ক্ষুদ্রাংশগত হইয়াও সমস্ত শরীরগত স্নিগ্ধতা অনুভব করায় তদ্রূপ।

সূত্র— **অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাৎ হৃদি হি** ।। ২/৩/২৫

চন্দন শরীরে বিশেষস্থানে অবস্থান হেতু সর্ব শরীরে স্নিগ্ধতা আনে। আত্মার কি কোন অবস্থান নির্ধারিত আছে ? নিশ্চয় আছে, প্রশ্ন শ্রুতিতে (৩/৬) 'হৃদি হ্যেষ আত্মা'। বৃহদারণ্যকে (৪/৩/৭) 'প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ' জীবাত্মার স্থান হৃদয়ে, সুতরাং দৃষ্টান্তে দোষ নাই। সিদ্ধান্ত হইল, আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করিয়া সমগ্র দেহের উপলব্ধি করিতে সক্ষম।

সূত্র— **গুণাদ্বাঽঽলোকবৎ** ।। ২/৩/২৬

প্রদীপ যেমন গৃহের একস্থানে থাকিয়া অনেক স্থান আলোকিত করে আত্মাও সেইরূপ দেহের একদেশে থাকিয়া স্বীয় জ্ঞান গুণদ্বারা সর্বদেহব্যাপী কর্ম করিতে সক্ষম।

সূত্র— **ব্যতিরেকো গন্ধবৎ, তথা চ দর্শয়তি** ।। ২/৩/২৭

গন্ধের আশ্রয় পৃথিবী। অথচ পৃথিবী হইতে ভিন্নভাবে গন্ধগুণকে প্রতীয়মান হয়। তদ্রূপ জ্ঞাতা হইতে পৃথক্ জ্ঞানরূপ আত্মার গুণরূপে

প্রতীয়মান হয়। এই জন্য আমরা বলি, "আমি বলিতেছি"।

সূত্র— **পৃথগুপদেশাৎ**॥ ২/৩/২৮

আত্মা জ্ঞানস্বরূপ হইলেও, জ্ঞাতাও বটে। বৃহদারণ্যক-শ্রুতি (৪/৩/৩০) বলিয়াছেন, "ন হি বিজ্ঞাতুঃ বিজ্ঞাতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে।" বিজ্ঞাতার বিজ্ঞান কখনও বিলুপ্ত হয় না।

সূত্র— **তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্গুণব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ**॥ ২/৩/২৯

যেহেতু সেই গুণ অর্থাৎ জ্ঞানই সারভূত সেইজন্য আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ বলা হয়।

সূত্র— **যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ**॥ ২/৩/৩০

জ্ঞান আত্মার নিত্যসহচর। কখনও অন্যথা হয় না। এই জন্যই জীবাত্মা জ্ঞানস্বরূপ হইলেও জ্ঞাতা বটে।

সূত্র— **পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ**॥ ২/৩/৩১

বালকে যেমন পুরুষত্ব অনভিব্যক্ত, সেইরূপ সুষুপ্তিতে জ্ঞান অনভিব্যক্ত। জ্ঞানের ঠিকানা থাকে না কিন্তু অস্তিত্ব ব্যাহত হয় না।

সূত্র— **নিত্যোপলব্ধি অনুপলব্ধি প্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বাঽন্যথা**॥ ২/৩/৩২

সময় সময় আত্মার কোন কোন বিষয় উপলব্ধি হয়, কোন কোন বিষয় উপলব্ধি হয় না। আত্মা যদি সর্বগত সর্বব্যাপী হইত, তাহা হইলে এরূপ হইত না। একমাত্র ব্রহ্মই সর্বগত সর্বব্যাপী চেতনাময়। জীবাত্মা ব্রহ্ম নহে। অণুচৈতন্য ব্রহ্মের অংশমাত্র। ব্রহ্ম একই সময় সর্বত্র আছেন, সকলই জানেন কারণ, তিনি সর্বগত সর্বব্যাপী।

৫। **কর্ত্রধিকরণ**—

সূত্র— **কর্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ**॥ ২/৩/৩৩

জীবাত্মা অণু হইলেও কর্তা বটে। জীবাত্মার কর্তৃত্ব না থাকিলে জীবের প্রতি শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

গীতায় কর্মের পাঁচটি কারণ বলিয়াছেন অধিষ্ঠান, কর্তা, করণ, চেষ্টা ও দৈব (গীতা, ১৮/১৪) ইহার মধ্যে কর্তাকে স্বীকার করা হইয়াছে এই কর্তৃত্ব জীবের অহংকার হইতে জাত। অহংকারশূন্য হইলে আর কর্তৃত্ব থাকে না।

গীতা বলিয়াছেন— "যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে। হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।" যতক্ষণ অহংকারের

অধীন ততক্ষণই কর্তৃত্ব। ব্যবহারিক জীবই কর্তা এবং তজ্জন্যই তাহার ভোগ।

সূত্রটির তাৎপর্য এই যে, জীবাত্মার ঔপচারিক সীমাবদ্ধ স্বাতন্ত্র্য আছে। তাহা না থাকিলে শাস্ত্রোক্ত বিধি নিষেধ ব্যর্থ হয়। শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ উপাধিতে অভিমানী জীবের জন্য। তাদৃশ জীবের সীমাবদ্ধ কর্তৃত্ব আছে।

সূত্র— **বিহারোপদেশাৎ** ॥ ২/৩/৩৪

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে পাওয়া যায় (৮/১২/৩)— মুক্ত জীবও ভোজন ক্রীড়াদি করিয়া বিহার করেন। ইহাতে বুঝা যায় মুক্তজীবেরও কর্তৃত্ব থাকে। থাকে বটে কিন্তু একেবারে নিরুপাধি। সকল গুণশূন্য মুক্তাত্মার কর্তৃত্ব পরিচালনায় সুখদুঃখাদি কর্মফল বর্তে না। কর্মফল বদ্ধজীবকেই বন্ধন করে। ঐ সব ভোগাদি স্বর্গলোকে হয় আবার 'ক্ষীণে পুণ্যে' মর্ত্যে আসে।

সূত্র— **উপাদানাৎ** ॥ ২/৩/৩৫

বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ২/১/১৮ মন্ত্রে দৃষ্ট হয় "এবমেবৈষ এতৎ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামাৎ পরিবর্তেত।" আত্মা প্রাণকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় শরীর মধ্যে লইয়া যথাকাম যথেচ্ছ বিহার করেন। এই বাক্যে প্রাণকে সঙ্গে লইয়া করেন বলা হইয়াছে। শুদ্ধচৈতন্যময় আত্মার বিচরণ নাই। এই সূত্রে— বিচরণে আত্মার কর্তৃত্ব উপদেশ করা হইয়াছে।

সূত্র— **ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দেশবিপর্যয়ঃ** ॥ ২/৩/৩৬

তৈত্তিরীয়-শ্রুতিতে (২/৫) আছে "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে"। ইহাতে মনে হয়, শুদ্ধ জ্ঞানই কর্মের কর্তা। বিজ্ঞান অর্থ জীবচৈতন্য ধরিলে কথা নির্দোষ হয়। ব্যবহারিক ভাবে জীবচৈতন্য যজ্ঞাদি কর্মের কর্তা। মূল কর্তৃত্ব ব্রহ্মেরই। অহংকারের উপাধিবশত জীব নিজেকে কর্তা মনে করে। "অহংকার-বিমূঢ়" জীবই নিজেকে কর্তা মনে করে।

সূত্র— **উপলব্ধিবদনিয়মঃ** ॥ ২/৩/৩৭

যদি প্রকৃতিকে কারণ বলি তাহা হইলে, কর্মফল সকলেই সমান ভোগ করিত। যেমন সর্বব্যাপী বায়ুতে কম্পন হইলে মেঘগর্জন হয়— তাহা কিন্তু সকলেই শুনিতে পায়। বায়ু ধূলিময় বা কোন গন্ধময় হইলে তাহা সকলেই ভোগ করে। প্রকৃতির কর্মের ফল সকলেরই সমান হইত। এই জন্য বুঝা যায় প্রকৃতি কর্তা নহে। জীবাত্মাই কর্তা ও

ফলভোক্তা।

সূত্র— **শক্তি-বিপর্যয়াৎ**।। ২/৩/৩৮

প্রকৃতি কর্তা হইলে প্রকৃতিই ভোক্তা হইত। একজনের আহার অন্যজনের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। কর্তা প্রকৃতি, আর ভোক্তা জীব— ইহা হইতে পারে না। সুতরাং জীবই কর্তা ও ভোক্তা। জীবের কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব থাকে না কখন তাহা পরবর্তী সূত্রে বলিতেছেন!

সূত্র— **সমাধ্যভাবাচ্চ**।। ২/৩/৩৯

সমাধি অবস্থায় জীবের কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব থাকে না। পূর্ণ আত্মসমর্পণে সমাধির মতই অবস্থা হয়। প্রকৃতি কর্তা হইলে তাহার সমাধিও হইতে পারিত। অচেতনা প্রকৃতির সমাধি হইতে পারে না। জীবাত্মাই সমাহিত হয়। সুতরাং কর্তা-ভোক্তা জীবাত্মাই।

সূত্র— **যথা চ তক্ষোভয়থা**।। ২/৩/৪০

তক্ষণকারী কাঠের মিস্ত্রী সূত্রধর যেমন অস্ত্রাদি সাহায্যে তক্ষণ করে। অস্ত্রাদি হাতে থাকিলেও সে কার্য হইতে বিরত থাকিতে পারে। ইন্দ্রিয়াদি থাকিলেও জীব তাহা ব্যবহার করিতে বা না করিতে পারে। চেতনা ও ইচ্ছাশক্তি-বিহীন প্রকৃতি তাহা পারে না। চেতনাবিশিষ্ট আত্মার সাধনা দ্বারা সমাধি লাভ হইতে পারে। চৈতন্যহীন প্রকৃতির পক্ষে তাহা সম্ভবে না। সুতরাং চেতনা-শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট আত্মাই কর্তা। আত্মা কর্তা বলিয়াই শাস্ত্রের উপদেশ সার্থক। প্রকৃতি কর্তা হইলে শাস্ত্রোপদেশ নিরর্থক হইত।

৬। পরায়ত্তাধিকরণ—

সূত্র— **পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ**।। ২/৩/৪১

জীবের এই কর্তৃত্ব পরমাত্মা হইতে সিদ্ধ। স্বাভাবিক বা নিরপেক্ষ নহে।

তৈত্তিরীয়-শ্রুতি বাক্য— "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাত্মা" পরমাত্মা জীবগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শাসন করিয়া থাকেন।

জীবের যেটুকু কর্তৃত্ব স্বীকার করা হইল তাহাও তাহার নিজস্ব নহে, পরমাত্মার। এই জ্ঞান হইতে জীবাত্মা আত্মাসমর্পণে পূর্ণতা লাভ করে। সমর্পিত আত্মাকে কর্মফল স্পর্শ করে না। যোগশাস্ত্র মতে, সমাধিস্থ জীব কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের অতীত। ভক্তিশাস্ত্রমতেও সর্বতোভাবে শ্রীহরিতে আত্মসমর্পিত জীব কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বশূন্য।

সূত্র— কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিত-প্রতিষিদ্ধাঽবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥ ২/৩/৪২

ভগবান্ জীবকৃত কর্মানুসারে অনুমতিপ্রদানে জীবকে সমস্ত কর্মে প্রবর্তিত করেন। জীবের সুখ-দুঃখ প্রভৃতি তাহার নিজহাতে গড়া। ঈশ্বরের বিধান তাহার কর্মানুসারে। ভগবানের কার্যে কোন পক্ষপাতিত্ব নাই। সৎকর্ম দ্বারা জীবের চিত্তের মলিনতা দূর হয়। কর্মদ্বারা চিত্ত নির্মল হইলে নির্মলচিত্তে ভগবদ্ভাব স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়।

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

"অনিত্যং অসুখং লোকম্ ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাং ॥"

এই অনিত্য অসুখকর লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাকে ভজনা কর। এই প্রচেষ্টাতেই মানবের জীবন-ধারণের সার্থকতা। ভগবান্ অনুকূল থাকিয়া এই চেষ্টার সার্থকতা বিধান করেন।

৭। অংশাধিকরণ—

সূত্র— অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে ॥ ২/৩/৪৩

জীব-ব্রহ্মের ভেদবাদী ও অভেদবাদী দুই প্রকার শ্রুতিই দৃষ্ট হয়। অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত, জীব ও ব্রহ্ম অভেদ। তাঁহারা ভেদবাচক সূত্রকে নানা চাতুর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা উড়াইয়া দেন। ভক্তিবাদের সাধকেরা ভেদবাদী। তাঁহারা জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলেন। অংশ হইলে ভেদ অভেদ দুই শ্রুতিই বজায় থাকে। অংশ অংশী নহে বলিয়া ভেদ তো বটেই। আবার অংশের সত্তা, ক্রিয়া সবই অংশী-হেতু অভেদও বটে। মহাপ্রভু বলিয়াছেন— জীব 'কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ ॥'

অথর্ববেদে আছে— "ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মে মে কিতবাঃ"— ব্রহ্মই দাসসমূহ, ব্রহ্মই কিতবা (ধূর্ত) সমূহ। ইহা দ্বারা জগতে যে ব্রহ্মবস্তু ভিন্ন আর বস্তু নাই ইহাই বলা হইল। জীব ব্রহ্মের অংশ হইলে উভয় শ্রুতিই অব্যাহত থাকে। গীতার স্পষ্টোক্তি— 'মমৈবাংশো জীবলোকে' (গীতা, ১৫/৭)।

সূত্র— মন্ত্রবর্ণাচ্চ ॥ ২/৩/৪৪

ব্রহ্মের অংশ যে জীব তাহা বেদমন্ত্র হইতেও নিশ্চিত হওয়া যায়। পুরুষসূক্তে (ঋগ্বেদ, ১০/৯০/৩)—

"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।"

সমস্ত ভূত ব্রহ্মের একপাদে আর অপর পাদ অমৃত ধামে। এখানে পাদ অর্থে চতুর্থাংশ নহে, সামান্য অংশমাত্র ইহাই বুঝাইতেছে।

সূত্র— **অপি চস্মর্য্যতে**।। ২/৩/৪৫

স্মৃতিতেও ঐ কথা উক্ত আছে। এইখানে স্মৃতিপদে গীতা। গীতায় স্পষ্টোক্তি আছে 'মমৈবাংশো জীবলোকে'। (১৫/৭)

সূত্র— **প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ**।। ২/৩/৪৬

যেমন সূর্যের প্রভা সূর্যের অংশ বটে কিন্তু সূর্যের স্বরূপ এবং স্বভাব উহার প্রভা হইতে ভিন্ন। অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের অংশ হইলেও ব্রহ্মের স্বভাব ও স্বরূপ জীবের স্বভাব ও স্বরূপ হইতে ভিন্ন।

সূত্র— **স্মরন্তি চ**।। ২/৩/৪৭

পুরাণকারগণ স্বীকার করিযাছেন, শক্তি ও শক্তিমানের ন্যায় ব্রহ্ম ও জীব শরীর ও শরীরিবৎ।

"একদেশ স্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তদেতদ্ অখিলং জগৎ।।"
(বিষ্ণুপুরাণ, ১/২২/৫৫)

বৃহদারণ্যক-শ্রুতিবাক্য, 'যস্যাত্মা শরীরং'। (৩/৭/২২)

পুরাণের বাক্য দ্বারা শ্রুতির সমর্থন করা হইয়াছে এই সূত্রে।

সূত্র— **অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাৎ জ্যোতিরাদিবৎ**।। ২/৩/৪৮

যদি সর্বত্র একই ব্রহ্মের অংশ আত্মা, তাহা হইলে বিধি-নিষেধ কেন? জীবে জীবে বিধি-নিষেধের এত দ্বন্দ্ব শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় কেন? যেমন এই কার্যে ব্রাহ্মণের অধিকার, স্ত্রী-শূদ্রের অনাধিকার ইত্যাদি বিধি-নিষেধ কেন। উত্তর দিতেছেন, জীব ব্রহ্মাংশ হইলেও দেহ সম্বন্ধে লৌকিক-বৈদিক অনুজ্ঞা, পরিহার অসঙ্গত নহে। দৃষ্টান্ত দিয়াছেন— অগ্নি এক হইলেও যজ্ঞাগ্নি পূত, শ্মশানের অগ্নি পবিত্র নহে। সর্বত্র একই সর্বলোক তথাপি পূজার স্থান পূত, শৌচস্থান অপবিত্র। তদ্বৎ।

সূত্র— **অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ**।। ২/৩/৪৯

তড়িৎ আলোক সর্বত্র এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন আকারের কাঁচ-আবরণের মধ্য দিয়া ভিন্ন ভিন্ন দর্শন ও ব্যবহার হইয়া থাকে। তদ্রূপ আত্মা এক হইলে— ভিন্ন ভিন্ন বেষ্টনীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জগদ্ব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকে। জীবাত্মা সর্বদাই বেষ্টনী আবৃত। আত্মা দেহভেদশূন্য হয় মুক্তিতে। যতদিন উপাধিতে অভিমান, ততকাল সংসারের গতাগতি, ততকাল দেহসম্বন্ধ, ততকাল বিধিনিষেধের সার্থকতা। বস্তুতঃ আত্মা বিধিনিষেধের অতীত।

সূত্র— **আভাস এব চ**।। ২/৩/৫০

সর্বত্র একই আত্মা। তবে ভোগের যাথার্থ্য হয় না কেন ? একের ভোগ অন্যের বর্তে না কেন ? উত্তর দিয়াছেন— দশটি জলপাত্রে প্রত্যেকটিতে সূর্য বিম্বিত। যে পাত্রের জলে কম্পন হইবে সেই পাত্রের সূর্যবিম্বই কম্পিত দৃষ্ট হইবে।

পারমার্থিকস্বরূপ ও ব্যবহারিকস্বরূপে জীবাত্মার ভেদনির্দেশ ভাবনা করিয়া ভেদের আলোচনা।

সূত্র— অদৃষ্টানিয়মাৎ ।। ২/৩/৫১

অদৃষ্ট অর্থ প্রাক্তন কর্ম ফল। ইহা প্রত্যেকের বিভিন্ন। এইজন্য ভিন্ন ভিন্ন ফলভোগ হয়। বৈষ্ণবাচার্যদের মত এই— জীব স্বরূপতঃ অবিকারী নির্গুণ। কিন্তু জীব অহংকারে বিমূঢ় হইয়া প্রকৃতির যোগে নিজেকে কর্তা মনে করিয়া ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মে। সংসারী হইয়া ফলভোগ করে। অহংকারশূন্য হইয়া গোবিন্দপদে আত্মসমর্পণ করিলে দুঃখের অতীত হইয়া যাইতে পারে।

সূত্র— অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্ ।। ২/৩/৫২

অভিসন্ধি অর্থাৎ ইচ্ছাকে ঈশ্বরমুখী করিতে পারিলে নিস্তারের আশা। অন্যথা ভুগিতেই হইবে। ক্ষুদ্র আমিত্ব, অহংকারের আমিত্ব, যদি গোবিন্দের বিরাট আমিত্বে সমর্পিত হয় তবে কর্মবন্ধন শেষ হইয়া যায়। যে কর্মভোগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে তাহাকে বলে নিয়তি। তাহা সহজে কাটে না। আমিত্ব অহংকর্তৃত্ব একেবারে শূন্যে পরিণত হইলে কাটে।

সূত্র— প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ ২/৩/৫৩

যদি মনে কর সুখ-দুঃখ ভোগ হয় স্বর্গ-মর্ত্য-নরকে অবস্থান হেতু— তাহা ঠিক নহে কারণ, অবস্থান কর্মসাপেক্ষ, জন্মবিধানের জন্য কর্ম। কর্মের জন্য বিভিন্ন স্থানে অবস্থান। জন্মলাভ প্রাক্তন কর্মসাপেক্ষ। ভাগবত বলিয়াছেন—

> "যেন যাবান্ যথাধর্মো ধর্মো বেহ সমীহিতঃ।
> স এব তৎফলং ভুঙ্ক্তে তথা তাবদমুত্র বৈ।।"
>
> (ভাগবত, ৬/১/৪৫)

ধর্মানুসারে সুখভোগ ও অধর্মানুসারে দুঃখভোগ অনিবার্য।

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

ব্রহ্মসূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায় : চতুর্থ পাদ

এই পাদে জীবের লিঙ্গশরীর সংক্রান্ত বাক্যসমূহের পরস্পর বিরোধ পরিহার বর্ণিত হইয়াছে।

১। প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণ—

সূত্র— তথা প্রাণাঃ ॥ ২/৪/১

প্রাণসমূহেও সেই প্রকার। আকাশাদির ন্যায় উৎপত্তিমান। মুণ্ডক শ্রুতির (২/১/৩) মন্ত্রে আছে— "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।" অর্থাৎ ইহা (এই ব্রহ্ম) হইতে প্রাণ, মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ উৎপন্ন হয়। প্রাণসকল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ উৎপত্তিমান।

সূত্র— গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥ ২/৪/২

উক্ত উৎপত্তিবোধক শ্রুতিগণের গৌণী অর্থে তাৎপর্য নহে। যদি উৎপত্তিবোধকে শ্রুতি গৌণী অর্থে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ এক ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি বাস্তবিক না হয়, তবে এক বিজ্ঞানে সর্ব বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা ব্যাহত হইয়া পড়ে।

সূত্র— তৎ প্রাক্ শ্রুতেশ্চ ॥ ২/৪/৩

মুণ্ডক শ্রুতির ২/১/৩ মন্ত্রে,

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।"

'জায়তে' পদের সহিত প্রাণ মন সর্বেন্দ্রিয় আকাশ বায়ু তেজ জল পৃথিবী সকলের সম্বন্ধে রহিয়াছে। উক্ত সম্বন্ধ শুধু প্রাণের সহিত 'গৌণ' অর্থে এবং আকাশদির সহিত 'মুখ্য' অর্থে হইবে, ইহা অসম্ভব। সকলের সহিত 'মুখ্য' অর্থে সম্বন্ধ হইবে, ইহাই সিদ্ধান্ত।

সূত্র— তৎপূর্বকত্বাদ্বাচঃ ॥ ২/৪/৪

ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে মহাভূতগণের সৃষ্টি উল্লেখের পর, সেই প্রকরণেই উক্ত হইয়াছে— "অন্নময়ং হি সৌম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজময়ী বাক্" (ছন্দোগ্য, ৬/৫/৪)। সৃষ্টিকথনে যখন তেজঃ, অপ্ এবং অন্ন বা পৃথিবীর উৎপত্তি বলা হইল, তখন তাহাদের

বিকারস্বরূপ মন, প্রাণ ও বাক্ যে উৎপত্তিমান, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি? সুতরাং বাক্, শব্দ, প্রাণ, ও মন ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তাহা সিদ্ধ হইল।

২। সপ্তগত্যধিকরণ—

সূত্র— সপ্তগতের্বিশেষিতত্বাচ্চ।। ২/৪/৫

"সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ"— ইত্যাদি মন্ত্রে (মুণ্ডক, ২/১/৮) সাতটি ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ আছে। অতএব ইন্দ্রিয় সাতটি। ইহা পূর্বপক্ষ সূত্র।

সূত্র— হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবম্।। ২/৪/৬

এই সূত্রে তাহার উত্তরে বলিতেছেন— ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা একাদশই বটে, সাত নহে। বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে, "হস্তো বৈ গ্রহঃ"— অপর উক্ত সূত্রের ৩/৯/৪ মন্ত্রে উক্ত আছে, "দশমে পুরুষে প্রাণ আত্মৈকাদশ"— এখানে আত্মা শব্দ মন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব ইন্দ্রিয় মোট একাদশটি : পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ও মন।

৩। প্রাণাণুত্বাধিকরণ—

সূত্র— অণবশ্চ।। ২/৪/৭

বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ৪/৪/২ মন্ত্রে প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সকলের জীবের উৎক্রান্তির সহিত উৎক্রমণ উল্লিখিত হইয়াছে। উহারা সর্বব্যাপী হইলে উৎক্রান্তি অসম্ভব হইত। বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ৪/৪/২ মন্ত্রটি হইল—

"প্রাণমনুৎক্রামন্ত সর্বে প্রাণা অনুৎক্রামন্তি।"

সূত্র— শ্রেষ্ঠশ্চ।। ২/৪/৮

মুখ্য প্রাণ ও ব্রহ্ম প্রভব। মুখ্য প্রাণ শ্রেষ্ঠত্ব কেন তাহা প্রশ্ন উপনিষদ্ ৩/৪ মন্ত্রে বলিয়াছেন— "যথা সম্রাডেবাধিকৃতান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে— এতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেতি— এবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সন্নিধত্তে।"

অর্থাৎ, রাজা যেমন নিজের অধিকৃত রাজপুরুষ নিযুক্ত করিয়া এই সকল গ্রাম শাসন কর বলিয়া স্থাপন করেন, সেইরূপ প্রাণও ইতর প্রাণ-সকলকে পৃথক্ পৃথক্ কার্যে নিয়োগ করে। (প্রশ্নঃ ৩/৪)

৪। বায়ুক্রিয়াধিকরণ—

সূত্র— **ন বায়ু-ক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ**।। ২/৪/৯

প্রাণের ক্রিয়া শরীরে প্রত্যক্ষত বায়ুক্রিয়া বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও উহা বায়ুক্রিয়া নহে, পৃথক্ নির্দেশ হেতু। প্রাণকে "জড় ও চৈতন্যের সংযোগ সেতু" বলা হইয়াছে।

"এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।।"

(মুণ্ডক-শ্রুতি, ২/১/৩ মন্ত্র)

সূত্র— **চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ**।। ২/৪/১০

চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় মুখ্য প্রাণও জীবের একপ্রকার করণ বা ভোগসাধনই বটে। জীবোপকরণ ইন্দ্রিয়াদির সহিত একপর্যায়ে, একপ্রকরণে মুখ্যপ্রাণেরও উপদেশ থাকায় বুঝিতে হইবে।

সূত্র— **অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথা হি দর্শয়তি**।। ২/৪/১১

মুখ্যপ্রাণ কর্তা বা ভোক্তা নহে। জীবই কর্তা ও ভোক্তা। মুখ্য প্রাণ চক্ষুরাদির ন্যায় জীবোপকবণ।

সূত্র— **পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ ব্যপদিশ্যতে**।। ২/৪/১২

প্রাণের পাঁচটি বৃত্তি হইল প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। এই পাঁচটি বৃত্তি হইল প্রাণের বৃত্তি। প্রাণ একটিই। মনের যেমন সংকল্প, বিকল্প, সংশয় প্রভৃতি বহু বৃত্তি, মন বস্তুটি একটিই, ইহাও তদ্রূপ সত্য।

৫। শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণ—

সূত্র— **অণুশ্চ**।। ২/৪/১৩

প্রাণ— অণু। মুখ্যপ্রাণ যদি সর্বব্যাপী হইত, তাহা হইলে উহার উৎক্রান্তি সম্ভব হইত না। অতএব প্রাণ অণু বটে। জীবাত্মা অণু। জীবের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ প্রাণেরও অণুত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে।

৬। জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানাধিকরণ—

সূত্র— **জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্তু তদামননাৎ**।। ২/৪/১৪

"অগ্নির্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ, বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ, আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ, দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ

প্রাবিশন্"... ইত্যাদি। (ঐতরেয়, ১/২/৪)

অর্থাৎ, অগ্নি বাক্য হইয়া মুখে, বায়ু প্রাণ হইয়া দুই নাসিকাতে, আদিত্য চক্ষু হইয়া দুই অক্ষিগোলকে, দিক্ শ্রবণেন্দ্রিয় হইয়া দুই কর্ণে... প্রবেশ করিলেন।

ইন্দ্রিয়গণ কি স্বাভাবিকভাবে নিজ নিজ কার্য করে, নাকি দেবতা কর্তৃক অধিষ্ঠিত হওয়ায় ঐ সকল দেবতার শক্তিতে কার্যশীল হইয়া থাকে? ২/৪/১৪ সূত্রে জানাইয়াছেন যে, অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণের পরিচালনায় ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য করিয়া থাকে। আবার পরব্রহ্মের সংকল্প অনুসারেই দেবতাগণ অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাদিগকে পরিচালনা করেন।

সূত্র— **প্রাণবতা শব্দাৎ**॥ ২/৪/১৫

জীবের দেহ তাহার স্বোপার্জিত। প্রাক্তন কর্মলভ্য জীবের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ মহারাজার সহিত প্রজাগণের সম্বন্ধের ন্যায় বর্তমান। জীব ভোগের জন্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-গ্রামে অধিষ্ঠান করেন। অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ রাজপুরুষগণের ন্যায় ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব কার্যে নিয়োগ ও পরিচালনা করেন মাত্র, ভোগ করেন না।

সূত্র— তস্য চ নিত্যত্বাৎ॥ ২/৪/১৬

জগতে একমাত্র পরমাত্মাই নিত্য। নিত্য বলিয়া "তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চভবৎ।" (তৈত্তি: ২/৬)

যতদিন ভগবানের বহু হইবার সংকল্প বর্তমান থাকিবে, ততদিন এই সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ অব্যাহতভাবে চলিতে থাকিবে। ইহাই পরামাত্মার প্রসঙ্গের কারণ।

৭। ইন্দ্রিয়াধিকরণ—

সূত্র— **ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ**॥ ২/৪/১৭

"এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।" (মুণ্ডক, ২/১/৩)

এই মন্ত্রটি অনুসারে চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্ প্রভৃতি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞান-কর্ম উভয়াত্মক মন, সাকুল্যে একাদশ ইন্দ্রিয়। মুখ্য-প্রাণ ইন্দ্রিয়পর্যায়ভুক্ত নহে। একাদশ ইন্দ্রিয় মুখ্য প্রাণের বিষয় নহে।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ১/৫/২১ ইত্যাদি মন্ত্রে উল্লেখিত আছে "হন্তাস্যৈব সর্বে রূপমসামেতিত এতস্যৈব সর্বে রূপমভবন স্তস্মাদেত

এতেনাখ্যায়ন্তে প্রাণা ইতি।”

অর্থাৎ ইতর ইন্দ্রিয়গণ মুখ্য প্রাণের রূপ ভজনা করিয়া তৎস্বরূপই হইল। অতএব তাহারা বস্তুন্তর হইবে কেন ?

ইহার উত্তরে সূত্রে হইল :

সূত্র— **ভেদশ্রুতেঃ** ।। ২/৪/১৮

বৃহদারণ্যক-শ্রুতির— “তে হ বাচমুচুঃ” মন্ত্রে কথিত উপাখ্যান হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, মুখ্যপ্রাণ ও ইতর ইন্দ্রিয়গণের ভেদবর্ণনা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে।

সূত্র— **বৈলক্ষণ্যাচ্চ** ।। ২/৪/১৯

বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ১/৫/২১ মন্ত্রে এক আখ্যায়িকা আছে। তাহা পড়িলে বুঝা যায়, মৃত্যু মুখ্য-প্রাণকে অভিভব করিতে পারে নাই। এই বৈলক্ষণ্য হেতু মুখ্য-প্রাণ অন্যান্য ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ বস্তু।

৮। সংজ্ঞামূর্তিক৯প্ত্যধিকরণ—

সূত্র— **সংজ্ঞামূর্তিক্৯প্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্বত উপদেশাৎ** ।। ২/৪/২০

“জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবানীতি ।।”

ছান্দোগ্যের এই ৬/৩/২ মন্ত্রানুসারে নামরূপ সৃষ্টিও পরমাত্মারই কার্য।

ঐ মন্ত্রের মধ্যে যে ‘জীবেনাত্মনা’ প্রয়োগ আছে, উহার অর্থ জীব-শক্তি বিকাশ দ্বারা। এই জীবের শক্তিকে বৈষ্ণব আচার্যেরা বহিরঙ্গ শক্তি বলেন। পরব্রহ্ম নিজ সংহননকারিণী শক্তি দ্বারা ত্রিবৃৎ কার্য সম্পাদন করিলেন। উহা এইরূপ : পৃথিবীর অর্ধাংশ, জলের এক চতুর্থাংশ ও তেজের এক-চতুর্থাংশ মিশাইয়া যে পদার্থ উৎপন্ন হইল তাহাই ব্যষ্টি প্রপঞ্চের উপাদান ‘পৃথিবী’। পৃথিবীর অংশ অধিক থাকায় ঐ নামে সংজ্ঞিত হইল। ঐরূপ জলের অর্ধাংশ, পৃথিবীর এক-চতুর্থাশ ও তেজের এক চতুর্থাংশ মিশাইয়া ব্যষ্টি প্রপঞ্চের উপাদান ‘জল’ এবং তেজের অর্ধাংশের সহিত পৃথিবী এবং জলের প্রত্যেকের এক চতুর্থাংশ মিশাইয়া ব্যষ্টিপ্রপঞ্চের উপাদান ‘তেজঃ’ উৎপন্ন হইল। পৃথিবীর দৃষ্টান্তে উহাদের মধ্যে যথাক্রমে জল ও তেজের অংশ অধিক থাকায়, যথাক্রমে উহাদের নাম জল ও তেজ হইল। ইহাই ত্রিবৃৎকরণ।

শ্রীভগবান্ই ত্রিবৃৎকর্তা। আকাশ ও বায়ু এই দু'টি মহাভূতকে গ্রহণ করিলে ত্রিবৃৎকরণস্থানে পঞ্চীকরণই উৎপন্ন হয়। পঞ্চীকরণ যথা—

ক্ষিতি— ক্ষিতি ১/২ + অপ ১/৮ তেজঃ ১/৮ + বায়ু ১/৮ + আকাশ

$^1/_8$ = ক্ষিতি ১ ইত্যাদি।

সূত্র— **মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ**।। ২/৪/২১

ত্রিবৃৎকরণের কর্তৃত্ব জীবের হইতে পারে? ইহার উত্তর দিচ্ছেন। মাংস, পুরীষ, মন ইহারা ভৌম বা পার্থিব। মূত্র, রক্ত, প্রাণ ইহা জলীয়, এবং অস্থি, মজ্জা ও বাক্ ইহারা তৈজস্। ছান্দোগ্যের ৭/৪/৭ মন্ত্রে এই কথাই অভিপ্রেত। এই মন্ত্রে ত্রিবৃৎকরণ উপদিষ্ট হয় নাই। ইহা জীবকর্তৃক কিনা এ প্রশ্নের অবকাশ নাই।

সূত্র— **বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ**।। ২/৪/২২

যদি সমুদায় পদার্থকে ত্রিবৃৎকৃত বা পঞ্চীকৃত বল, তাহা হইলে ইহা জল, ইহা ক্ষিতি এই বিশেষ নাম হইবার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, 'বৈশেষ্যাৎ' অর্থাৎ ভূত আধিক্য হেতু, 'তদ্বাদঃ' অর্থাৎ তাহার নাম।

যে যে ভূতের আধিক্য বর্তমান, তাহাকে সেই সেই নামে উল্লেখ করা হইয়া থাকে, দ্বিতীয়বার 'তদ্বাদঃ' অর্থ অধ্যায় সমাপ্তি সূচক।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্রহ্মসূত্র

তৃতীয় অধ্যায় : সাধন

প্রথম পাদ

১। তদন্তর প্রতিপত্ত্যধিকরণ——

সূত্র—— তদন্তর-প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাম্ ।। ৩/১/১

সূত্রে তৎ শব্দটি ২/৪/২০ সূত্রের 'মূর্তি' শব্দটিকে বুঝানো হইয়াছে। 'তদন্তর' অর্থ দেহান্তর। 'প্রতিপত্তৌ' অর্থ প্রাপ্তিতে। রংহতি—— গমন করে। কিভাবে গমন করে? সম্পরিষ্বক্তঃ অর্থাৎ আলিঙ্গিত বা মিলিত হইয়া। অতএব সিদ্ধান্ত হইল, জীব সূক্ষ্মভূত পরিবেষ্টিত হইয়া দেহান্তরে গমন করে। অন্নময় কোষই স্থূল শরীর। প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, এই তিন কোষের সমবায়ে সূক্ষ্মশরীর এবং আনন্দময় কোষ কারণশরীর। আত্মা সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীরে লোকান্তরে গমন করে।

সূত্র—— ত্র্যাত্মকত্বাৎ তু ভূয়স্ত্বাৎ।। ৩/১/২

সমস্ত ভূতই যখন ত্রিবৃৎকৃত তখন ছান্দোগ্যের ৫/৯/১ মন্ত্রের 'আপ' শব্দ প্রয়োগ দ্বারা অপরাপর ভূতসূক্ষ্মের অনুগমন বুঝিতে হইবে। অতএব, 'আপঃ' শব্দের উল্লেখ থাকায় অপরাপর ভূতসূক্ষ্মের অনুগমনও বুঝিতে হইবে।

সূত্র—— প্রাণগতেশ্চ।। ৩/১/৩

দেহ হইতে জীব দেহান্তরে গমনকালে সূক্ষ্মভূতে পরিবেষ্টিত হইয়া যায়।

সূত্র—— অগ্ন্যাদি-গতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ভাক্তত্বাৎ।। ৩/১/৪

"যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি" (বৃহঃ, ৩/২/১৩) ইত্যাদি মন্ত্রে বাক্যাদির অগ্নিপ্রভৃতিতে লয় হয় এইকথা বলা হইয়াছে। তাহা হইলে ইন্দ্রিয়গণ কিভাবে জীবের অনুগমন করিবে? মন্ত্রের পূর্বার্ধে এই প্রশ্ন। উত্তর দিতেছেন "ন ভাক্তত্বাৎ"। অর্থাৎ উক্ত গমন শ্রুতি গৌণার্থ-বোধক। 'ভাক্ত', মুখ্য অর্থে নহে কারণ, উক্ত মন্ত্রে আছে লোমসকল ও কেশসকল বনস্পতিতে লয় হয়। সুতরাং মুখ্য অর্থেই

গ্রহণ করার কোন অর্থ হয় না। সুতরাং গৌণ অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। একই মন্ত্রের কতকগুলি মুখ্য অর্থে ও কতকগুলি গৌণ অর্থে গ্রহণ সম্ভব হয় না। জীবৎকালে অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ ইন্দ্রিয়গণে অধিষ্ঠিত থাকিয়া উহাদের উপকার করেন। মরণকালে সে-উপকার নিবৃত্ত হয়।

সূত্র— প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব হ্যুপপত্তেঃ।। ৩/১/৫

ছান্দোগ্যের ৫/৪/২ মন্ত্রে "তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি"—অর্থাৎ প্রথম দেবতারা অগ্নিতে শ্রদ্ধা রূপে আহুতি অর্পণ করেন। জলের নাম মাত্রও নাই। তাহা হইলে পূর্বাপর সামঞ্জস্য কি করিয়া হয়? উত্তরে বলিতেছেন যে, না, এই সামঞ্জস্য আছে। প্রথম আহুতিতে 'অশ্রবণাৎ'। জলের বিষয় শ্রবণ না থাকায় কি করিয়া সামঞ্জস্য হয়?

উত্তরে বলিতেছেন, "ন তা এব হ্যুপপত্তেঃ", যুক্তিসঙ্গত হয় কারণ, শ্রুতিতে 'শ্রদ্ধা'কে জল বলা হইয়াছে। "অপঃ প্রণয়তি শ্রদ্ধা বা আপঃ।।"

সুতরাং শ্রদ্ধা যে জলরূপী ইহা শ্রুতিপ্রমাণে স্পষ্ট বুঝা গেল। সুতরাং মৃত্যু সময়ে জীব জলে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে।

সূত্র— অশ্রুতত্বাদিতি চেন্ন ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ।। ৩/১/৬

যদি বল জলযুক্ত হইয়া জীবের গতি শ্রুতি নহে, অতএব উহা বলা উচিত নহে। এই কথা বলিতে পার না, যেহেতু ছান্দোগ্য উপনিষদে ইষ্টপূর্তিকারিগণের (জীবের) চন্দ্রলোকে গমন প্রতীতি হইয়াছে।

সূত্র— ভাক্তং বানাত্মবিত্ত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি।। ৩/১/৭

ছান্দোগ্যের ৫/১০/৪ মন্ত্রে আছে— "পিতৃলোকাদাকাশ-মাকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ" অর্থাৎ পিতৃলোক হইতে আকাশে, আকাশ হইতে চন্দ্রলোকে গমন করে। ইহাই দেবগণের প্রসিদ্ধ অন্ন, সোমরাজ্যে দেবগণ তাহাকে ভক্ষণ করেন।

আবার ছান্দোগ্যের ৩/৬/১ মন্ত্রে আছে "ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্টা তৃপ্যন্তি"— দেবগণ নিশ্চয়ই ভক্ষণ বা পান করেন না। পরন্তু এই অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন।

সুতরাং উক্ত শ্রুতির ৫/১০/৪ মন্ত্রে যে ভক্ষণের উল্লেখ আছে, তাহা গৌণার্থবোধক মাত্র, ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল।

৩/১/৭ মন্ত্রের ভাক্ত অর্থ উপচারিক বা গৌণার্থক। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, যতদিন জীবের দেহ হইতে দেহান্তরে গমনের সময়ে

বীজ ভূতসূক্ষ্মরূপে জীবকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাহার সহিত দেহ হইতে দেহান্তরে গমনাগমন করে।

২। কৃতাত্যয়াধিকরণ—

সূত্র— কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবঞ্চ।। ৩/১/৮

কৃত কর্মফল ভোগের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া অবশিষ্ট ফলপ্রদ কর্মবিশিষ্ট হইয়া যেই পথে গমন করিয়াছিলেন, সেই পথেই আবার তিনি পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এইরূপ কথা ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে আছে। ভাগবতস্মৃতিতেও আছে— "...যং সম্পদ্য জঁহত্যজমনুশয়ী সুপ্তঃ কুলায়ং যথা।।" (ভাগঃ, ১০/৮৭/৫০)

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ৫/১০/৭ মন্ত্রে জীবের দুই প্রকার আচরণের কথা আছে। রমণীয়চরণা ও কপূয়চরণা। চরণ শব্দের অর্থ আচরণ। আচার-চরিত্র। সুতরাং শ্রুতির তাৎপর্য চরণ হইতেই— চরিত্র হইতেই জন্মবিশেষ লাভ করিয়া থাকে। 'অনুশয়' অর্থাৎ ভুক্তাবশেষ কর্ম হইতে নহে। উত্তরে বলি, আচরণ তো শূন্যে থাকিতে পারে না। জীবের আশ্রয়েই থাকে। এই প্রসঙ্গে আচার্য কার্ষ্ণাজিনির মত—

সূত্র— চরণাদিতি চেন্ন তদুপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ।। ৩/১/৯

চরণ অর্থাৎ আচরণ শব্দে তদুপলক্ষণে জীবের কর্মেরই বোধক। সুতরাং শুধু চরিত্র লইয়া জীব দেহত্যাগ করে। ভুক্তাবশিষ্ট কর্মফল সহিতই করে। ফলোন্মুখী পরিপক্ক কর্মই প্রারব্ধরূপ ইহলোকে জন্মের কারণ হয়।

সূত্র— আনর্থক্যমিতি চেন্ন, তদপেক্ষত্বাৎ।। ৩/১/১০

যদি বল, চরণ অর্থ শুধু আচার নহে, যাবতীয় কর্ম, তাহা হইলে সদাচার নিরর্থক। উত্তরে বলিতেছেন, সদাচার নিরর্থক নহে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম প্রতিপালন করিতে হইলে সদাচার সম্পন্ন হইতেই হইবে। বর্ণাশ্রম প্রতিপালন সকলেরই কর্তব্য।

সূত্র— সুকৃত-দুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ।। ৩/১/১১

আচার্য বাদরি মুনি বলেন, ছান্দোগ্যের 'চরণ' শব্দ সুকৃতি-দুষ্কৃতি উভয় বোধক। লক্ষণা করিবার প্রয়োজন নাই। সুকৃতি-দুষ্কৃতি-রূপ চরণ ফলদানের জন্য জীবের অনুবর্তী হয়।

অতঃপর জীব যে "সানুশয়" অর্থাৎ অভুক্ত কর্মফল সহিত গমন করে, ইহার বিরুদ্ধে পাঁচটি পূর্বপক্ষ সূত্র—

৩। অ-নিষ্টাদিকার্যাধিকরণ—

সূত্র— অ-নিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্।। ৩/১/১২

সূত্র— সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামরোহাবরোহৌ তদ্গতিদর্শনাৎ।। ৩/১/১৩

সূত্র— স্মরন্তি চ।। ৩/১/১৪

সূত্র— অপি চ সপ্ত।। ৩/১/১৫

সূত্র— তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ।। ৩/১/১৬

৩/১/১২ হইতে ৩/১/১৬ এই পাঁচটি সূত্র পূর্বপক্ষ সূত্র। এই সূত্রগুলি পূর্বপক্ষ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন যে, শ্রুতিমন্ত্র হইতে বুঝা যায় যে, পুণ্যবান্ ও পাপী প্রাণীমাত্রেই মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে গমন করে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সূত্রকার ৩/১/১৭ হইতে ৩/১/২১ পর্যন্ত পাঁচটি সূত্র করিয়াছেন।

সূত্র— বিদ্যা-কর্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ।। ৩/১/১৭

সূত্র— ন, তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ।। ৩/১/১৮

সূত্র— স্মর্যতেঽপি চ লোকে।। ৩/১/১৯

সূত্র— দর্শনাচ্চ।। ৩/১/২০

সূত্র— তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য।। ৩/১/২১

এই পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ আলোচনা দ্বারা এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। দেবযান ও পিতৃযান দুইটি মার্গ।

দেবযান উচ্চাধিকারীগণের বিশেষ পথ। ওই পথে গিয়া শ্রীভগবানের নিত্যধামে পৌঁছায়।

পিতৃযান কাম্য-কর্মানুষ্ঠানকারীদের বিশেষ পথ। উহার পর্যবসান চন্দ্রলোক। উহা লাভ করিতে পারিলে বুঝিতে হইবে জীব ক্রমোন্নতির পথ পাইবে।

পাপীগণের চন্দ্রলোক গমনের সুযোগ নাই। তাহাদের গতাগতি মর্ত্যলোক ও নরকের মধ্যে। 'জায়স্ব মৃয়স্ব' জন্মমৃত্যুর শোচনীয় পথ। মর্ত্যলোক আর নরকের মধ্যে তাহাদের গতাগতি।

৪। স্বাভাবাপত্ত্যাধিকরণ—

সূত্র— (তৎ) স্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ।। ৩/১/২২

জীবাত্মা গমনানুসারে এই পথে প্রত্যাবর্তন করে। প্রথমে আকাশে— বায়ুতে— ধূম— মেঘ— বৃষ্টি। আকাশাদির ভাব প্রাপ্ত হয় কিন্তু স্বরূপ প্রাপ্তি হয় না। সে অবস্থায় সুখ-দুঃখের ভোগ থাকে

না।

৫। নাতিচিরাধিকরণ—

সূত্র— নাতিচিরেণ বিশেষাৎ॥ ৩/১/২৩

'নাতিচিরেণ'— অতিশীঘ্র। অনুশয়ী জীব শীঘ্র শীঘ্র আকাশাদি সদৃশভাব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বৃষ্টির সহিত পৃথিবীতে নামিয়া আসে।

আকাশাদিতে স্থিতি অতি অল্প সময়ের জন্য। পরে ধান্য-যবাদি-রূপে পরিণত হয়।

৬। অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণ—

সূত্র— অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ববদভিলাপাৎ॥ ৩/১/২৪

আকাশাদি প্রাপ্তির উল্লেখে কোন কর্মের উল্লেখ নাই। ধান্যাদির (ব্রীহি) উল্লেখ হইলেও কোন কর্মের উল্লেখ নাই। সুতরাং ব্রীহ্যাদি-ভাব প্রাপ্তিতে সংশ্লেষ মাত্র শ্রুতির বক্তব্য।

সূত্র— অশুদ্ধমিতি চেন্ন, শব্দাৎ॥ ৩/১/২৫

সূত্রটির প্রথমাংশে দ্বিতীয়াংশের উত্তর।

"ন হিংস্যাৎ সর্বা ভূতানি"— কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না। তবে যজ্ঞে অগ্নি ও সোমদেবতার উদ্দেশ্যে পশুবধ শাস্ত্রবিধি। "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত।" যোষিৎসঙ্গঃ, আমিষ-ভক্ষণ, মদ্যপান, পাপকার্য, যথেচ্ছ ব্যবহার নিবারণের জন্য ঋতুকালে বিবাহিত স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞে পশুবধ ও সৌত্রামণিতে মদ্যপান বিহিত হইয়াছে। তাহাতে পাপ হয় না।

সূত্র— রেতঃসিগ্‌যোগোঽথ॥ ৩/১/২৬

ধান্য-যবাদি-ভাব প্রাপ্তির পর অনুশায়ী জীবাত্মার রেতঃসিগ্‌যোগ হয়। যাহারা রেতঃসেক্ সমর্থ তাহাদের শরীরে প্রবেশ করে।

সূত্র— যোনেঃ শরীরম্॥ ৩/১/২৭

যোনি— উৎপত্তি স্থান। তাহা প্রাপ্তির পর মনুষ্যাদি দেহ প্রাপ্তি হয়।

তৃতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ সমাপ্ত।

ব্রহ্মসূত্র

তৃতীয় অধ্যায় : দ্বিতীয় পাদ

জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি— জীবাত্মার এই তিনটি স্থান। জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা কিছু জানি দেখি— বিশ্বসংসারের তাবৎ বস্তু ব্রহ্মের সৃষ্টি একথা বলা হইয়াছে। সুষুপ্তিকালেও জীব ব্রহ্মসান্নিধ্য পায়, প্রায় ব্রহ্মভূত হয়— একথাও বলা হইয়াছে। দুইটি অবস্থার সন্ধিস্থানে যে স্বপ্নভূমি ইহা কাহার সৃষ্টি এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা জাগিতে পারে। সেই বিষয় আলোচনা করা হইতেছে দ্বিতীয় পাদের প্রথম অধিকরণে। তাই অধিকরণের নাম সন্ধ্যাধিকরণ।

১। সন্ধ্যাধিকরণ—

সন্ধ্যা— জাগ্রৎ-সুষুপ্তির সন্ধিস্থানে তৃতীয় একটি স্থান আছে তাহার নাম স্বপ্নস্থান। বৃহদারণ্যক শ্রুতি এই কথা জানাইয়াছেন, "ইদং য পরলোকস্থানং চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্"(বৃহঃ, ৪/৩/৯) তারপর ৪/৩/১০ মন্ত্রে বলিয়াছেন, "ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে"। স্বপ্নাবস্থায় রথ নাই, পথ নাই, অশ্ব নাই, অথচ রথ পথ অশ্ব সৃষ্টি করে। এই সৃষ্টির কর্তা কি জীব, না ব্রহ্ম ? এইরূপ সংশয়ে পরবর্তী সূত্রে উক্ত—

সূত্র— সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি।। ৩/২/১

স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট বস্তুসমূহের সৃষ্টি কে করে এই বিষয় আলোচনা করিতেছেন সূত্রকার। কেহ কেহ বলেন, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর স্রষ্টা জীবই। এই জন্য পূর্বপক্ষ সূত্রে—

সূত্র— নির্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ।। ৩/২/২

পুত্রাদি কাম্যবস্তু আছে সেই জন্য স্বপ্নাবস্থায় পুত্রাদিকে না পাইয়া মন দ্বারা সৃষ্টি করিয়া লয়। স্বপ্নভোগ্য যোষিদালিঙ্গনে চিত্তচাঞ্চল্য অনেক মানুষেরই পরিজ্ঞাত। যাহা নাই তাহার সৃষ্টি জীব তাহার মনঃকল্পনা দ্বারাই করে। এইটি পূর্বপক্ষ। পরবর্তী সূত্রে উত্তর দিতেছেন—

সূত্র— মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ।। ৩/২/৩

পূর্বপক্ষকে খণ্ডন করিয়া এই সূত্রে বলিতেছেন যে, স্বপ্নদৃষ্ট সকল

বস্তুই মায়ামাত্র। এই মায়ার সৃষ্টি অজ্ঞানান্ধ জীবের পক্ষে সম্ভব নহে। উহা মায়াতীত ব্রহ্মেরই সৃষ্টি। এই সৃষ্টবস্তুর ভোক্তা মাত্র জীব।

জীবও মূলতঃ ব্রহ্মেরই অংশ বা ব্রহ্মস্বরূপ তবে সে উহা সৃষ্টি করিতে পারিবে না কেন ? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তর সূত্রেই দিয়াছেন—'অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ'...মায়াচ্ছন্ন জীবের প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপতা অনভিব্যক্ত। জীবে ব্রহ্মে অভিন্নতা থাকিলেও যতক্ষণ জীব মায়াভিভূত ততক্ষণ ব্রহ্মস্বরূপতা অনভিব্যক্ত। এই জন্য স্বপ্নদৃষ্ট মায়াময় বস্তু জীবের সৃষ্ট হইতে পারে না। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যে জীবের নহে এই জন্য আর একটি কারণ দিতেছেন—

সূত্র— **সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্‌বিদঃ ॥** ৩/২/৪

স্বপ্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, স্বপ্ন শুভাশুভের সূচক নয়। যেমন, ভাগবত গ্রন্থে দেখা যায় কংসরাজা মৃত্যুর পূর্বে স্বপ্ন দেখিতেছেন—

"স্বপ্নে প্রেত-পরিষ্বঙ্গঃ খরযানং বিষাদনম্।
যায়ান্নলদমাল্যেকস্তৈলাভ্যক্তো দিগম্বরঃ ॥"

(ভাগবত, ১০/৪২/৩০)

কংস স্বপ্নে দেখিলেন, যেন মৃতলোকের সহিত তাহার আলিঙ্গন হইল, কখনও যেন গর্দভবাহিত যানে গমন, কখনও মৃণাল ভক্ষণ হইল, কখনও যেন এক ব্যক্তি দিগম্বর ও তৈলসিক্ত হইয়া জবাকুসুমের মাল্যধারণ করিয়া তাহার নিকট দিয়া গেল। এই সবগুলি অশুভ সূচক।

জীব যদি স্বপ্নের সৃষ্টিকর্তা হইত তাহা হইলে নিজের অনিষ্টসূচক স্বপ্ন সৃষ্টি করিবে কেন ? কোন বুদ্ধিমান লোক তাহা করে না। সুতরাং জীব স্বপ্নকর্তা নহে।

সংশয় হইতে পারে, ব্রহ্মাংশ জীবে ব্রহ্মধর্ম থাকিবে না কেন ? জীব কেন বা স্বপ্ন বিষয়ের স্রষ্টা হইবে না ? এই সংশয় নিরসনার্থ পরবর্তী সূত্র—

সূত্র— **পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধ-বিপর্যয়ৌ ॥** ৩/২/৫

জীব ব্রহ্মাংশ হইলেও পরমেশ্বরের সঙ্কল্পবশতঃ বদ্ধজীবের স্বাভাবিক রূপ আবৃত থাকে। তাঁহার ইচ্ছানুসারেই জীবের বন্ধন মোক্ষ ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ ব্রহ্মাংশ জীব অনাদি অবিদ্যা দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে। অনাদি বিদ্যা লাভ করিলেই তাহার মুক্তি। জীবের স্বরূপের আবরণটা ঘটে কি প্রকারে তাহা বলিতেছেন পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— দেহযোগাদ্বা সোঽপি।। ৩/২/৬

সৃষ্টির সময় স্থূল, সূক্ষ্ম বা কারণ-দেহের সহিত যোগবশতঃই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ স্বাভাবিক শক্তির তিরোভাব ঘটিয়া থাকে। জীবের শরীরের আবরক দেহ— স্থূল, সূক্ষ্ম বা কারণ-দেহ— ইহলোক পরলোক গমনাগমন কালে জীবের বেষ্টনীস্বরূপ হইয়া শ্রীভগবানে লীন থাকে। আবার সৃষ্টির প্রাক্কালে ভগবদিচ্ছায় উহারা উদ্বোধিত হইয়া কার্যশীল হইয়া থাকে।

২। তদভাবাধিকরণ—

যখন স্বপ্নেরও অভাব হয় তদ্বিষয় বিচার—

সূত্র— তদভাবো নাড়ীষু তৎ-শ্রুতেরাত্মনি চ।। ৩/২/৭

স্বপ্নের অভাব অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থান হয় ব্রহ্মতেই। জীব হৃদয়স্থ হিতা নামক নাড়ীতে প্রবেশ করিয়া 'পুরীততে'র মধ্য দিয়া আত্মাতে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে অবস্থান করে।

ভাগবত বলেন, জীব জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় সাক্ষীরূপে বর্তমান থাকে। সকল অবস্থাতেই ভগবান্ অন্তরে অন্তর্যামীরূপে বর্তমান রহিয়া জীবকে নিয়ন্ত্রণ করেন। জাগ্রৎ অবস্থায় সঙ্কর্ষণ রূপে, স্বপ্নাবস্থায় প্রদ্যুম্নরূপে, সুষুপ্তি অবস্থায় অনিরুদ্ধ রূপে এবং তুরীয় অবস্থায় বাসুদেব রূপে জীবের অন্তরে থাকিয়া তাহাকে পরিচালনা করেন। সকল অবস্থাতেই জীব ভগবানে অবস্থান করে। জগৎ ও স্বপ্ন অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও মন সজাগ থাকায় ভগবানের অনুভব হয় না। সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও মনের ক্রিয়া না থাকায় ভগবানের অবস্থিতি অনুভব হয়। সুষুপ্তির পর জাগরণে সুখনিদ্রার অনুভব হয়। সুষুপ্তির পর জাগরণে সুখনিদ্রার অনুভব, আনন্দের অনুভব, ক্লান্তিহীনতা ও নূতন শক্তির উদ্বোধন— এই অনুভূতির সাক্ষ্য বহন করে।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলিয়াছেন, "এবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্" (বৃহ, ৪/৩/২১)— সুষুপ্তিকালে পুরুষ প্রাজ্ঞের সহিত মিলিত হয় ও এই জন্য বাহ্য ও অন্তর কিছুই জানে না।

সূত্র— অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ।। ৩/২/৮

যেহেতু ব্রহ্মই সুষুপ্তিস্থান সে-কারণ জাগরণও ব্রহ্ম হইতেই হয়।

৩। কর্মানুস্মৃতি-শব্দবিধ্যধিকরণ—

সূত্র— **স এব তু কর্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ।।** ৩/২/৯

প্রবোধ সময় সুষুপ্ত পুরুষই পুনঃ উত্থিত হয়। তাহার মুক্তি হয় না। সুষুপ্তি অবস্থায় ব্রহ্মলীন হইলেও পুনর্জাগরণে উহাতে ব্রহ্মভাব পরিলক্ষিত হয় না। 'অনুস্মৃতি' অর্থ বুদ্ধির বৃত্তি। সুষুপ্তি অবস্থায় বুদ্ধির বৃত্তি লোপ হয় না। স্থগিত থাকে মাত্র। অতএব যে মানুষটি সুষুপ্ত হইয়াছিল সেই মানুষটিই জাগ্রত হয়।

৪। মুগ্ধাধিকরণ—

সূত্র— **মুগ্ধেঽর্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ।।** ৩/২/১০

মূর্চ্ছা দশা, সুষুপ্তি অবস্থার অর্ধাবস্থা মনে করিবে। অতএব সিদ্ধান্ত, কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, কি সুষুপ্তি, কি মূর্চ্ছাবস্থা, সকল অবস্থাই পরমেশ্বর হইতে সংঘটিত। সুতরাং পরব্রহ্মেরই সর্বকর্তৃত্ব।

৫। উভয়লিঙ্গাধিকরণ—

সূত্র— **ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি।।** ৩/২/১১

তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে মোট একচল্লিশটি সূত্র। তন্মধ্যে ৩/২/১ সূত্র হইতে ৩/২/১১ পর্যন্ত এগারটি সূত্রে জীবের স্বপ্নাবস্থার ও মূর্চ্ছাবস্থার কথা বলা হইয়াছে। আলোচ্য প্রসঙ্গ এই যে, সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মের সহিত জীবের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটে তখন জীবের দোষও ব্রহ্মে স্পর্শ হয় কিনা। উপরোক্ত 'ন স্থানতোঽপি' সূত্রে তাহাই আলোচিত হইতেছে—

ন = না,
স্থানতঃ = আশ্রয়ানুসারে,
অপি = ও,
পরস্য = পরব্রহ্মণঃ,
উভয়লিঙ্গং = উভয় ভাব,
সর্বত্র হি = সকল স্থানেই।

জাগরণাদি অবস্থার সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় জীবের ন্যায় পরব্রহ্মেরও কোন দোষ স্পর্শ হয় না। কেননা— সর্বত্র সকল শ্রুতিতে পরব্রহ্মের উভয়লিঙ্গ- — নির্দোষ রূপে অপ্রাকৃত গুণে ও হেয় গুণে অর্থাৎ প্রাকৃত গুণাভাবে নিগুর্ণতার— এই উভয় লিঙ্গ দৃষ্ট হয়। অতএব বুঝিতে

হইবে তিনি সগুণ হইলেও নিত্য নির্দোষগুণ সম্পন্ন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে দোষস্পর্শের আশঙ্কা থাকিতে পারে না।

ভক্তিবাদী আচার্যগণের সকলেরই এই সূত্রের ইহাই ব্যাখ্যা গৃহীত হইয়াছে। আচার্য শঙ্কর এই সূত্রের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রের অন্বয়-পদচ্ছেদই অন্যরূপ।

এই সূত্রের অন্বয়-পদচ্ছেদ আচার্য শঙ্কর নিম্নরূপ করিয়াছেন——

স্থানতোঽপি = উপাধি সংযুক্ত অবস্থায় উভয় লিঙ্গ,

উভয়লিঙ্গ = সবিশেষ ও নির্বিশেষ এই উভয় রূপ,

ন = নহেন, সবিশেষ নির্বিশেষ এই উভয়াত্মক নহেন,

হি = যেহেতু সর্বত্র সকল শ্রুতিতে নির্বিশেষ ব্রহ্মরই উপদেশ হইয়াছে।

সূত্রটির তাৎপর্য শঙ্কর মতে এই দাঁড়ায়——

শ্রুতিতে ব্রহ্মের সবিশেযত্ববোধক ও নির্বিশেষত্ববোধক এই উভয় রূপ বাক্যই আছে, কিন্তু উপাধি সংযোগেও ব্রহ্ম উভয়রূপী নহেন। যেহেতু সমস্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য হইতেছে ব্রহ্মের একরূপত্ব, নির্বিশেষ রূপত্ব।

এই সূত্রে শঙ্কর ভক্তিবাদীর সঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করিতেছেন।

শ্রুতিতে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব জ্ঞাপক ও নির্বিশেষত্ব জ্ঞাপক উভয় প্রকার বাক্যই আছে। ইহা ভক্তিবাদীদের মত। ইহা সকলের মত হওয়া উচিত, কারণ, দ্বিবিধ ভাবের বোধক মন্ত্র শ্রুতিতে স্পষ্টই দেখা যায়।

'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম সবিশেষ। সবিশেষ না হইলে তাহা হইতে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইতে পারে না। আবার 'অশব্দমরূপমব্যয়ং অপাণিপাদঃ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি সব বাক্যে নির্বিশেষত্ব দ্যোতক। কিন্তু আচার্য শঙ্কর বলিলেন, সর্বত্রই শ্রুতির সকল মন্ত্রেই ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলা হইয়াছে।

বেদব্যাস বেদান্তসূত্রের প্রথম দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্ম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে প্রায় প্রত্যেকটি সূত্রেই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব স্থাপিত হইয়াছে। এখন তৃতীয় অধ্যায়ে আসিয়া সেই বেদব্যাস কেমনে বলিবেন, শ্রুতিতে সর্বত্রই ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলা হইয়াছে? সর্বত্রই ব্রহ্ম নির্বিশেষ হইলে সবিশেষত্ব বোধক শ্রুতিগুলির কি গতি হইবে? বেদান্ত-সূত্রকার কি পরস্পর বিরুদ্ধ কথা বলিতে পারেন?

ব্রহ্ম সর্বত্রই নির্বিশেষ এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য আচার্য শঙ্কর 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ভক্তিবাদীদের মতে এই সকল শ্রুতিতেও ব্রহ্ম নির্বিশেষ ইহা বুঝায় না। ইহাই বুঝায় যে, ব্রহ্ম প্রাকৃত শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধের অতীত। তিনি অপ্রাকৃত শব্দস্পর্শাদিযুক্ত।

অধিকন্তু, তৃতীয় অধ্যায় ব্রহ্মবস্তুর স্বরূপ নির্ধারক নহে। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ই ব্রহ্মস্বরূপ নির্ধারক। তৃতীয় অধ্যায়ে এখানে ব্রহ্মতে জীবের কোন দোষ স্পর্শ করে কিনা এই প্রসঙ্গ। ব্রহ্ম যে সর্বত্র নির্বিশেষ এই প্রসঙ্গ আসে না।

সুতরাং আচার্যের ব্যাখ্যায় ক্রমভঙ্গ দোষ হয়, ইহাও ভক্তিবাদীরা বলেন।

সূত্র— ন ভেদাদিতি চেন্ন, প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ।। ৩/২/১২

জীব স্বরূপত নির্দোষ, কিন্তু ভেদসম্বন্ধবশতঃ তাহাতে যেরূপ স্পষ্ট হয় সেইরূপ ব্রহ্ম সম্বন্ধেও হইতে পারে নাকি? এই সূত্রে উত্তর দিয়াছেন, না, তাহা হয় না। বৃহদারণ্যকে ব্রহ্মকে অন্তর্যামী বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম পৃথিবীতে জলে আকাশে অন্তরীক্ষে সর্বত্র অবস্থান করতঃ উহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করেন। করিয়াও তিনি অমৃতময়ই থাকেন।

অনন্ত-প্রকাশে ব্রহ্মের একই ভাব বিদ্যমান থাকে। সুতরাং দৃশ্যমান ভেদ হইতে উৎপন্ন কোন দোষগুণ ব্রহ্মকে স্পর্শকে করে না।

সূত্র— অপি চৈবমেকে।। ৩/২/১৩

মুণ্ডকোপনিষদে ৩/১/১ মন্ত্রে এই জগদ্বৃক্ষে পরমাত্মা জীবাত্মা দুইটি পাখীর কথা বলা হইয়াছে। তাহাদের পার্থক্য এই যে, জীবাত্মা-পাখী কর্মফল ভোগ করে, আর পরমাত্মা-পাখী সাক্ষীরূপে দর্শন করেন মাত্র। মন্ত্রটি এই—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।।"

সুতরাং জীবের দোষ ব্রহ্মতে স্পর্শ হইতে পারে না।

সূত্র— অরূপদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ।। ৩/২/১৪

ছান্দোগ্য-শ্রুতির ৮/১৪/১ মন্ত্রে— "আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম"— ব্রহ্ম নাম ও রূপের নির্বাহক। নামরূপ তাহা হইতে জাত, তাহাতেই স্থিত এবং উহার পরিণতিও তাহাতেই। নাম রূপ কিছু দ্বারাই তিনি সংস্পৃষ্ট নহেন।

তিনি সর্বপ্রাণীর অন্তরে অন্তর্যামীরূপে বর্তমান থাকিলেও সর্বপ্রকার দোষবিবর্জিত ও নিজ অমৃতময় স্বরূপ চিরবিরাজমান।

সূত্র— প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ।। ৩/২/১৫

শ্রুতিতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বহু বিরোধী বাক্য দৃষ্ট হয়, যেমন, "তদেজতি তন্নৈজতি, তদ্দূরে তদ্বন্তিকো", "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ।" (কঠোপনিষৎ, ১/২/২১)। মন্ত্রে যে বহু বিরোধ ও অসঙ্গতি দৃষ্ট হয় তাহা কিরূপে সম্ভব ? উত্তর দিতেছেন এই সূত্রে— প্রকাশ স্বরূপ সূর্যের ন্যায় কোন উক্তিরই ব্যর্থতা হয় না, সবই সার্থক হয়। সূর্যের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

সূর্য পৃথিবী হইতে অতিদূরে থাকিলেও আলো-তাপ-কিরণ দানে জগৎ পালন-পোষণ করেন। এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর রক্ষণাদিতে তাঁহার অত্যল্প শক্তিই ব্যয় হয়। অধিকাংশ থাকে প্রত্যক্ষের বাহিরে। সেইরূপ পরব্রহ্মেরও।

পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি— ব্রহ্ম একপাদ বিভূতি দ্বারাই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন আর ত্রিপাদ অমৃত-লোকে বিরাজমান আছে। পরব্রহ্মে সব মন্ত্রই সার্থক, কেহই পরস্পর বিরোধী নহে। ভাগবত বলিয়াছেন, "অপৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদৃশাম্"— উপনিষদও তাঁহার সমগ্র মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারে না। "পক্ষী যেমন আকাশের অন্ত নাহি পায়। যতদূর সাধ্য ততদূর উড়িয়া যায়।"

সূত্র— আহ চ তন্মাত্রম্।। ৩/২/১৬

শ্রুতিবাক্যসকল ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে উক্তি করেন, সেই উক্তিই একমাত্র গ্রহণীয়। ইহা অন্যের প্রতিষেধক এইরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। সবিশেষ শ্রুতি নির্বিশেষ উক্তির প্রতিষেধক নহে। তদ্রূপ নির্বিশেষ শ্রুতি সবিশেষ শ্রুতির প্রতিষেধক এইরূপ বুঝিতে হইবে না। তাহার একাধারে সর্বভাব-বিরুদ্ধ শ্রুতির সার্থকতা থাকিতে পারে।

সূত্র— দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্যাতে।। ৩/২/১৭

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন, আমি একাংশে এই সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া আছি। সুতরাং শাস্ত্রের মন্ত্রসকল ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব-সবিশেষত্ব-নির্গুণত্ব-সগুণত্ব একই সময় উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা বিচার দ্বারা জানা কঠিন। ব্রহ্মবস্তুর স্বরূপই এই প্রকার। সকল বিরোধিতার সমন্বয় রহিয়াছে তাঁহাতে। তিনি প্রাকৃতিক গুণাতীত হইয়াও অপ্রাকৃত গুণসম্পন্ন। সুতরাং শ্রীভগবানে শাস্ত্রের সমুদয় উক্তিই সার্থক।

সূত্র— অতএব চোপমা সূর্যকাদিবৎ।। ৩/২/১৮

এই জন্য জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য-চন্দ্রাদি ব্রহ্মের উপমারূপে শাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। নানা পাত্রে নানা বর্ণের জল থাকিতে পারে। সূর্য যেখানে প্রতিবিম্বিত হইয়াও তত্তৎ দোষে-বর্ণে দূষিত বা বর্ণিত হয় না। তদ্রূপ পর ব্রহ্মেরও উপাধি হেতু কোন দোষ স্পর্শে না।

সূত্র— অম্বুবদ্‌গ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্‌।। ৩/২/১৯

এইটি পূর্বপক্ষ সূত্র। আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ মত। তাঁহাদের মতে এই সূত্রের অর্থ জলের দোষ সূর্যে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু পরমাত্মায় সেইরূপ ভাব সম্ভব নহে। কারণ সূর্যের জলে কোন অবস্থান নাই। কিন্তু পরমাত্মার সর্বত্র অবস্থান আছে। সুতরাং দৃষ্টান্ত চলিতে পারে না। শ্রীমধ্বাচার্য ও বলদেব বিদ্যাভূষণ এই সূত্রকে পূর্বপক্ষ মনে করেন না।

তাঁহাদের মতে এই সূত্রের অর্থ, জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব নহে কারণ, জীব ব্রহ্মের অংশ। ইহা ২/৩/৪৩ সূত্রে স্থাপিত হইয়াছে। এই সূত্রে জীবের ব্রহ্মপ্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন করা হইয়াছে।

সূত্র— বৃদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্‌।। ৩/২/২০

জলে প্রতিবিম্বিত সূর্যের দৃষ্টান্ত শ্রুতিই দিয়াছেন। আমরা কল্পনা করিয়া দেই নাই। যদি জল ও প্রতিবিম্বের সঙ্গে কি সাদৃশ্য আছে তাহা এই সূত্রে বলিতেছেন। বৃদ্ধি-হ্রাস অর্থাৎ জল বাড়িলে, কমিলে, বিস্তৃত হইলে সূর্যবিম্বও বড়, ছোট ও বিস্তৃত দেখা যায়। জলের কম্পনে প্রতিবিম্বও কম্পিত হয়। এইরূপ সূর্য-প্রতিবিম্ব জলধর্মানুযায়ী। কিন্তু আকাশস্থ সূর্যে জলের ধর্ম স্পর্শ করে না। সেইমত ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে উপহিত হইলেও পাধির ধর্ম তাঁহাকে স্পর্শ করে না। ব্রহ্মের অংশ জীব উপাধির ধর্মে অভিমানবশত উপাধির দোষ-গুণ ভোগ করে। ইহা প্রতিপাদন করা শ্রুতির দৃষ্টান্তের তাৎপর্য।

সূত্র— দর্শনাচ্চ।। ৩/২/২১

দর্শনাৎ— লৌকিক ব্যবহার দর্শন-হেতু।

সর্বাংশে না মিলিলেও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সিংহমানবকঃ— এই বালক সিংহের মত। ইহাতে বালকের বলের ও সাহসের উৎকর্ষ দর্শন করিয়া সিংহের মত বলা হইয়াছে। এই রূপ জল ও সূর্যের দৃষ্টান্তে দোষ নাই।

সূত্র— প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ।।

৩/২/২২

ব্রহ্মের উভয় লিঙ্গত্বের প্রসঙ্গ তুলিতেছেন। ব্রহ্ম সবিশেষ নির্বিশেষ উভয় লিঙ্গ হইতে পারে না কারণ বৃহদারণ্যক শ্রুতির ২/৩/৬ মন্ত্রে— পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে সবই 'নেতি নেতি' বলিয়া পূর্ব কথিত সমস্ত বিশেষের প্রতিষেধ করিয়া নির্বিশেষত্ব স্থাপন করিয়াছেন। —এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তর দিতেছেন এই সূত্র। শ্রুতিমন্ত্র— স এষ নেতি (বৃহঃ, ২/৩/৬)।

প্রকৃত = প্রস্তাবিত। এতাবত্ত্ব = এতৎ পরিমাণত্ব মাত্র। প্রতিষেধিত = প্রতিষেধ করিয়াছেন নিষেধ দ্বারা। যাবৎ কথিত বিশেষণের নিষেধ করা হয় নাই। 'নেতি নেতি' শ্রুতি ব্রহ্মের বিষয় নির্দেশে ভাষার অক্ষমতার কথা বলা হইয়াছে। 'নেতি নেতি' বলার উদ্দেশ্য, ভাষায় ব্রহ্মের কথা যতই বলা হউক না কেন তাহা দ্বারা তাঁহার সামান্য একদেশ মাত্র বলা হইল, অধিকাংশই অবর্ণিত থাকিল। যদি সবই নিষেধ বুঝাইত তাহা হইলে একই শ্রুতি সবিশেষ নির্বিশেষ উভয় উক্তি কি প্রকারে করিতে পারেন ?

"যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন ॥"

(তৈত্তিরীয়, ২/৯)

প্রথমে নির্বিশেষ বুঝাইয়া আবার আনন্দং বলিলেন কি প্রকার ? তিনি একই সময় উভয় লিঙ্গ, সবিশেষ ও নির্বিশেষ।

সূত্র— তদব্যক্তমাহ হি॥ ৩/২/২৩

অব্যক্ত অর্থ প্রমাণের অগোচর। প্রত্যক্ষ-অনুমান-ঐতিহ্য— সব প্রমাণের তিনি অতীত। তাই তিনি অব্যক্ত।

সূত্র— অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্॥ ৩/২/২৪

ব্রহ্ম যদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর হন তাহা হইলে তাঁহাকে জানিবার উপায় কি ? ব্রহ্মদর্শন কি তাহা হইলে জীবের পক্ষে অসম্ভব ? ইহার উত্তর দিতেছেন এই সূত্রে।

সমারাধন দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। এই কথা প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা জানা যায়। শ্রুতি ও স্মৃতি দ্বারা জানা যায়। গোপালতাপনী শ্রুতি বলেন "ভক্তিরস্য ভজনম্"।

গীতা বলেন— "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ", "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ" — আমি একমাত্র ভক্তি দ্বারাই লভ্য হইয়া থাকি। বিশেষ

বিশেষ শ্রুতি ও স্মৃতির একই সিদ্ধান্ত। আরাধনা দ্বারা চিত্তের মল দূরীভূত হয়। চিত্ত মলই জীবের ভগবৎপ্রাপ্তির বাধা। প্রবল চেষ্টা দ্বারা ঐ মালিন্য দূর হয়।

শ্রীহরিকে প্রত্যক্ষ দেখা যায়— একথা শ্রুতি স্মৃতি সকলেই বলেন। অর্জুনকে গীতাতে নিজ শ্রীমুখেই বলিয়াছেন।

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপঃ ॥"

শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন— বেদাধ্যয়ন দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, দান দ্বারা, অথবা যজ্ঞ দ্বারা— এই যে নরাকৃতি চতুর্ভুজ তোমার সখা দেবকীপুত্র আমি, দর্শনের অযোগ্য— যেমন তুমি আমাকে দর্শন করিতেছ। তবে জানিবার উপায় কি ?

একমাত্র একনিষ্ঠা অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারাই আমি প্রত্যক্ষপ্রাপ্তির যোগ্য হই। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, সংরাধনা বা সম্যক্ভক্তি দ্বারাই শ্রীহরিকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যদি ভক্তি দ্বারা ভাবিত হয় তাহা হইলে তাহা দ্বারাই তিনি দৃষ্ট হন।

সূত্র— প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্মণ্যভ্যাসাৎ ॥ ৩/২/২৫

সংরাধনে ভগবদ্দর্শন হয় এই কথা বলা হইয়াছে পূর্বসূত্রে। সংশয় এই যে, এমন দেখা যায় একজন সমস্ত জীবন ভরিয়া ঈশ্বরারাধনায় যাপন করিয়াও ভগবদ্দর্শন লাভ করিতে পারেন না— এইরূপ সংশয়ে উত্তর দিতেছেন — 'প্রকাশাদিবৎ' এই সূত্রে। সূর্য, অগ্নি, আলোক ইত্যাদির ন্যায়। মৃন্ময় প্রস্তরময় পাত্রের মধ্যে একটি দীপ রাখিলে তাহার আলো বাহির প্রকাশিত হয় না। কিন্তু কাঁচপাত্রের মধ্যে রাখিলে প্রকাশিত হয়। তদ্রূপ শ্রীহরিও স্বপ্রকাশ। কিন্তু জীবের উপাধির মলিনতা ও স্বচ্ছতার উপর তাঁহার প্রকাশ বা উপলব্ধি নির্ভর করে। জীবের উপাধি আনন্দময়কোষ স্বরূপতঃ স্বচ্ছ। উহার মলিনত্ব কর্মজনিত আগন্তুক। ঐ আগন্তুক মলিনতা সংরাধনরূপ কর্ম দ্বারা দূর হয়। মলিনতা দূর না হওয়া পর্যন্ত ভগবদ্দর্শন হইতে পারে না।

সূর্য কোন নূতন পদার্থ সৃষ্টি করে না। লোকের চক্ষুর আবরক অন্ধকার দূর করিয়া বস্তুকে প্রকাশ করে মাত্র। সংরাধনও বুদ্ধির অন্ধকার নষ্ট করিয়া ব্রহ্মস্বরূপকে দর্শন করায়।

সূত্র— অতোঽনন্তেন তথা হি লিঙ্গম্‌।। ৩/২/২৬

বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন, "ইদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব" (২/৪/১২)— তাঁহার অনন্ত গুণ অনন্তভাব অনন্তরূপ অনন্ত- শক্তি। তিনি সবিশেষ, তিনি নির্বিশেষ। তিনি নির্বিশেষ হইলেও সাধকের সাধনানুসারে সবিশেষরূপে তাঁহার নিকট অভিব্যক্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্‌ মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্‌।।"
(১০/১৪/২৯)

শ্রীহরির পাদপদ্মের প্রসাদকণা প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি অনুগৃহীত হয় সেই অনন্তদেবের মহিমার তত্ত্ব কথঞ্চিত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।

৬। অহিকুণ্ডলাধিকরণ—

সূত্র— উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ।। ৩/২/২৭

কঠ শ্রুতির "ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য" (২/৩/৯) মন্ত্রে এবং মুণ্ডক শ্রুতির "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা" (৩/১/৮) মন্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপকে বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিবার পর আবার স্পষ্ট বলা হইয়াছে, সাধকের হৃদয়ে তাঁহার দর্শন লাভ হয়। ইহাতে মনে হয়, তিনি নির্বিশেষ-সবিশেষ নিরাকার-সাকার মূর্ত-অমূর্ত এক-কালেই। ইহা কিরূপে সম্ভব তাহা এই সূত্রে অহিকুণ্ডলাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন।

একটি সর্প কখনও দীর্ঘাকার হইয়া চলিয়া যাইতেছে আবার সে-ই কুণ্ডলাকার হইয়া অবস্থান করিতেছে। দুই-ই সর্পের রূপ স্বরূপগত কোন পার্থক্য নাই। সেইরূপ ব্রহ্মের সবিশেষ-নির্বিশেষ ভাব সাকার-নিরাকার ভাব। মূর্ত-অমূর্ত ভাব হইতে স্বরূপগত বিন্দুমাত্র পার্থক্য হয় না।

সূত্র— প্রকাশাশ্রয়বদ্‌বা তেজস্ত্বাৎ।। ৩/২/২৮

শ্রুতি শাস্ত্রে, স্মৃতি শাস্ত্রে ব্রহ্মবিষয়ে সবিশেষ ও নির্বিশেষ এই উভয়বিধ বাক্যই আছে। সূর্য যেমন প্রকাশের আশ্রয় ও প্রকাশস্বরূপ— দুই-ই সত্য, তদ্রূপ তিনি আনন্দময় ও আনন্দস্বরূপ।

চৈতন্যবিশিষ্ট জীব কি ব্রহ্ম হইতে একান্ত অভেদ? না, তাহা নহে। সূর্য ও তাহার কিরণকণা, অগ্নিরাশি ও একটি স্ফুলিঙ্গ অভেদ

হইবে কেন? জীব ও জড়জগৎ উভয় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মে স্থির বলিয়া অভেদভাবে কথিত হইলেও— ভেদ বর্তমান আছে। ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই থাকিতে পারে না— ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই অথচ জীব ও জড়জগৎ কেহই ব্রহ্ম নহে। গীতায় বলিয়াছেন—

"ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥" (গীতা, ৯/৪-৫)

এই বাহ্যতঃ বিরোধ ও তাহার সমাধান ইহাই ভগবদ্ রহস্য।

সূত্র— **পূর্ববদ্বা** ॥ ৩/২/২৯

এই সূত্রটিতে সূত্রকার পূর্বের অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা ২/৩/৪৩ সূত্রটির প্রতি পুনরায় মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। উক্ত সূত্রটির প্রতিপাদ্য বিষয় জীবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ ভেদ ও অভেদ তত্ত্বের।

সূত্র— **প্রতিষেধাচ্চ** ॥ ৩/২/৩০

শাস্ত্রের যত কিছু নিষেধ তাহার পরিসমাপ্তি ব্রহ্মেই। যাহা কিছু সমুদয় তাঁহাতে সার্থকতা লাভ করে। এই কারণে ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব সিদ্ধ হয়। তিনি সবিশেষ ও নির্বিশেষ দুই-ই।

৭। পরাধিকরণ—

সূত্র— **পরমতঃ সেতুন্মান-সম্বন্ধ-ভেদব্যপদেশেভ্যঃ** ॥ ৩/২/৩১

এইটি একটি পূর্বপক্ষ সূত্র। ব্রহ্মবস্তুই যে পরাৎপর সর্বশ্রেষ্ঠ এই কথা বুঝায় না কয়েকটি শ্রুতির মন্ত্রে তাহা দেখাইতেছেন। সেতুব্যপদেশ, উন্মান-ব্যপদেশ, সম্বন্ধ-ব্যপদেশ ও ভেদ-ব্যপদেশ। মুণ্ডক শ্রুতিতে আছে— তিনি "অমৃতস্যৈষ সেতুঃ"। (২/২/৫) সেতু আর সেতু পার হইয়া যেখানে যাইতে হইবে তাহা এক হইতে পারে না। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ব্রহ্মকে 'চতুষ্পাদ' 'ষোড়শকল' বলা হইয়াছে। যাহার পরিমাণ আছে তাহা অনন্ত হইতে পারে না। ইহা উন্মান ব্যপদেশ।

শ্বেতাশ্বতরশ্রুতির "অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্" (৬/১৯) মন্ত্রে প্রাপ্য-প্রাপক সম্বন্ধ নির্দেশ করা হইয়াছে। প্রাপ্য প্রাপক হইতে পৃথক্ বস্তু ইহা সহজেই মনে হয়। ইহা সম্বন্ধ-ব্যপদেশ।

মুণ্ডকে ৩/২/৮ মন্ত্রে 'পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি'— শ্রেষ্ঠ হইতে অতিশ্রেষ্ঠ পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়ার কথা আছে— ইহা ভেদ-ব্যপদেশ। সুতরাং ঐ সকল মন্ত্র দ্বারা তুমি যে ব্রহ্মতে পরমতত্ত্ব স্থাপন করিয়াছ তাহা গ্রহণীয় নয়।

পরবর্তী কয়েকটি সূত্রে উক্ত পূর্বপক্ষের উত্তর দিতেছেন—

সূত্র— **সামান্যাত্তু** ॥ ৩/২/৩২

সূত্র— **বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ** ॥ ৩/২/৩৩

সূত্র— **স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ** ॥ ৩/২/৩৪

সূত্র— **উপপত্তেশ্চ** ॥ ৩/২/৩৫

সূত্র— **তথাঽন্যপ্রতিষেধাৎ** ॥ ৩/২/৩৬

সূত্র— **অনেন সর্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ** ॥ ৩/২/৩৭

উপরোক্ত ছয়টি সূত্র দ্বারা পূর্বপক্ষকে খণ্ডন করিয়া মূল সিদ্ধান্ত সংরাধন দ্বারা তিনি লভ্য, ইহা স্থাপন করিয়াছেন। যে কোনও প্রকারে হউক উপাসনা কর্তব্য। সংরাধন যে কোনও স্থানে, যে কোনও কালে, যে কোনও অবস্থায় করা কর্তব্য, ইহাই স্থাপিত হইয়াছে।

পূর্বপক্ষের আপত্তি নিরসনকল্পে কথিত-উত্তরগুলি সংক্ষেপে বলা যাইতেছে—

ব্রহ্মে সেতু প্রভৃতির ব্যপদেশ (উল্লেখ) সাদৃশ্যহেতু। পারাপারের উপায়ভূত সেতু অর্থে বলা হয় নাই।

'সি' ধাতুর উত্তর 'তুন' প্রত্যয় করিয়া সেতু। 'সি' ধাতুর অর্থ বন্ধন। সেই দুই তীরের বন্ধন। ব্রহ্ম জড় ও চৈতন্যের পার্থক্য রক্ষা করিয়া বন্ধন করিয়া থাকেন বলিয়া সেতু।

শ্রুতিতে চতুষ্পাদ, ষোড়শকল প্রভৃতি নির্দেশ দ্বারা ব্রহ্মের সীমাবদ্ধতা বুঝায় না। উহা কেবল উপাসনার সৌকর্যার্থে। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে আছে 'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি' তাঁহার একপাদে পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মাণ্ড। ইহা দ্বারা তাঁহার পরিচ্ছিন্নত্ব বুঝায় নাই। বিরাটত্বই ব্যাপকত্বই বুঝাইতেছে। ইহা উপাসনার সুবিধার জন্য বলা হইয়াছে। এই ভাবনায় সাধকগণ ধারণার অতীত বস্তুকে কিঞ্চিৎ ধারণায় আনিতে পারিবেন এই জন্য ষোড়শকল বলা হইয়াছে— তাঁহাকে আবার নিষ্কলও বলা হইয়াছে। আলোক স্বভাবতঃ ব্যাপক হইলেও কোন রন্ধ্রপথে পরিচ্ছিন্নের মত প্রতীত হয়। তদ্রূপ সাধকের বুদ্ধি অনুসারে তাঁহার সীমাবদ্ধতা ঘটে। তাই স্থান বিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ (৩/২/৩৪)

বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম উভরলিঙ্গক ও অনন্ত এই জন্য সব বিরোধের সমাধান তাঁহাতেই ঘটে।

জগৎসৃষ্টি-কার্যে যেমন তাঁহার শক্তির প্রকাশ তদ্রূপ ভক্তের ভাবনানুসারে রূপধারণেও তাঁহার শক্তি অভিব্যক্ত হয়। তিনি প্রাপ্য ও প্রাপক একথায় কোন দোষ হয় না। কারণ তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায় তাঁহার কৃপা। তাঁহার কৃপা ও তিনি বস্তুতঃ একই বস্তু। হঠাৎ দুই বস্তু মনে হয় কিন্তু বাস্তবে তাহা একই। ব্রহ্মকে যে পরাৎপর বলা হইয়াছে তাহা ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বান্তর প্রতিষ্ঠার জন্য নহে। ব্রহ্মই পর হইতে পর, মহৎ হইতে মহত্তর। সর্বকারণের কারণ ইহা প্রতিষ্ঠা করাই শ্রুতির উদ্দেশ্য।

অতএব সিদ্ধান্ত, ব্রহ্মই পরমতত্ত্ব। তত্ত্বান্তর নাই। সুতরাং পূর্বপক্ষের আপত্তির কোন ভিত্তি নাই। ব্রহ্ম পূর্ণ অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন হইলেও তিনি যোগমায়ার আবরণে যে দেহ ধারণ করেন তাহাতে স্বরূপের হানি হয় না। যে যে ভাবে তাঁহার উপাসনা করে, তিনি তাহাই গ্রহণ করেন। সুতরাং যে কোন প্রকারে হউক তাঁহার উপাসনা করা কর্তব্য। গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

৮। ফলাধিকরণ—

সূত্র— **ফলমত উপপত্তেঃ** ॥ ৩/২/৩৮

কর্ম-মীমাংসকেরা বলেন, কর্ম 'অপূর্ব' উৎপাদন করে সেই 'অপূর্ব' ফলপ্রদান করে। এই পূর্বপক্ষকে খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন, ঈশ্বরই কর্মফলদাতা। কর্ম জড়বস্তু। তাহা ফলদাতা হইতে পারে না। চৈতন্যময় ব্রহ্মই জীবের কর্মানুসারে ফলদান করিয়া থাকেন।

পরমার্থপ্রাপ্তি ভগবদ্ কৃপাভিন্ন হয় না। সুতরাং কর্ম মুখ্য নহে, ব্রহ্মই একমাত্র উপাস্য।

সূত্র— শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ৩/২/৩৯

একমাত্র ব্রহ্মই যে অন্ন, ধন ও মোক্ষদাতা ইহা শ্রুতি হইতেই জানা যায়।

"স বা এষ মহানজ আত্মাহন্নাদঃ বসুদানঃ"। (বৃহ: ৪/৪/২৪)

"এষ হ্যেবানন্দয়াতি" ভক্তকে তিনিই আনন্দ দান করেন। (তৈত্তিরীয়, ২/৭)

সুতরাং কর্ম মুখ্য নহে। ব্রহ্মই মুখ্য। তিনিই উপাস্য।

পূর্বপক্ষ সূত্র— ধর্মং জৈমিনিরতএব।। ৩/২/৪০

পূর্ব-মীমাংসক জৈমিনি বলেন— যজ্ঞের কর্মই ফলপ্রদান করিয়া থাকে। ঈশ্বর ফলদাতা নহেন। যজুর্বেদে ২/৫/৫ মন্ত্রে বলা হইয়াছে, "যজেত স্বর্গকামঃ"।

সূত্রকর্তা বাদরায়ণি স্বয়ং পূর্বপক্ষের জবাব দিতেছেন পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— পূর্বন্তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ।। ৩/২/৪১

পূর্ববর্তী জৈমিনির সিদ্ধান্ত ঠিক নহে কারণ, শ্রুতিমন্ত্র ঈশ্বরের কারণত্ব নির্দেশ করিয়াছেন। গীতায় শ্রীমুখের উক্তি— "অহং হি সর্ব যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" (গীতা, ৯/২৪) আমিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। প্রভু অর্থ ফলদাতা। ভাগবত বলিয়াছেন—

"দ্রব্যং কর্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যোঽথোঽস্তি তত্ত্বতঃ।।"
(ভাগবত, ২/৫/১৪)

তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত।

ব্রহ্মসূত্র

তৃতীয় অধ্যায় : তৃতীয় পাদ

তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ শেষ হইল। সমগ্র বেদের তাৎপর্য ব্রহ্ম। সমষ্টিভাবে যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখন এই তৃতীয় পাদে ব্যষ্টিভাবে সাধকগণের সাধনমার্গের বিভিন্নতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার সমন্বয় করা হইবে।

১। সর্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণ—

সূত্র— **সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ**॥ ৩/৩/১

বেদের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন প্রকারে উপদেশ আছে। বৈশ্বানরকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিবে, দহরকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিবে, উদ্‌গীথ- রূপ ওঙ্কার-অক্ষরকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিবে, আত্মারূপে উপাসনা করিবে, অমৃতস্বরূপকে উপাসনা করিবে। গায়ত্রীমন্ত্র বলিয়াই ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিবে। এই সকল বাক্যেই চোদনা অর্থাৎ উপাসনাকর্মে প্রেরণা। ব্রহ্ম উপাসনাতেই পর্যবসান। সকলই ব্রহ্মোপাসনা। একমেবাদ্বিতীয়ম্ এই পরতত্ত্বেই সকলের পর্যবসান। সুতরাং উপাস্য এক বস্তুই। যিনি সবিশেষ-নির্বিশেষ, সগুণ-নির্গুণ, পরমাত্মা-ভগবান্ সেই পরব্রহ্মই শ্রুতিতে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'। 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ', 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম', 'যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ', ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে একই ব্রহ্মতত্ত্ব বলা হইয়াছে। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রতিপাদনই শ্রুতির উদ্দেশ্য।

এই কথাই পরবর্তী সূত্রে জানাইতেছেন—

সূত্র— **ভেদান্নেতি চেদেকস্যামপি**॥ ৩/৩/২

'ভেদাৎ'— ভেদহেতু বিভিন্ন প্রকার বুঝিতে হইবে না। 'একস্যামপি'— একই বাস্তব কথা বলা হইয়াছে।

ভাগবতশাস্ত্রও বলিয়াছেন—

"যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্বতঃ সিন্ধুঃ তদ্বৎ ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ ।।" ১০/৪০/১০

নদীসকল পর্বতে জন্মে, বৃষ্টিজলে পূর্ণ হইয়া বহুদিকে ধাবমান হয়— অবশেষে নানাদিক্ হইতে আসিয়া সাগরে প্রবেশ করে। সেইরূপ, হে প্রভো! সকল পথ অন্তে আপনাকে পাইয়াই কৃতকৃতার্থ। সুতরাং পূর্বপক্ষীয় সকল আপত্তি অসঙ্গত।

যদি সমুদয় বেদের তাৎপর্য ব্রহ্মতেই, তবে এত শাখাভেদের উদ্দেশ্য কি? উত্তর দিতেছেন—

সূত্র— স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ সববচ্চ তন্নিয়মঃ ।। ৩/৩/৩

মধ্বাচার্য 'সববৎ'-কে 'সলিলবৎ' পাঠ করিয়াছেন।

শ্রুতিতে বিধান আছে— 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ'— অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন করিবে। সমগ্র বেদাধ্যয়ন করাই বিধি। ইহা দ্বিজ জাতির অধিকার। সমগ্র বেদপাঠে বেদোক্ত কর্মানুষ্ঠানে সামর্থ্য-বিশিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যা অতি অল্প। সেই জন্য বেদব্যাস শাখাভেদ ও কর্মভেদ প্রদান করিয়াছেন। যে-শাখাতে লাভের যে-উপায় বলা হইয়াছে সে-শাখাতে সাধকের তাহা দ্বারাই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে। 'সববৎ' অর্থ অথর্ববেদোক্ত 'মত্তৌদন' হোমের প্রসঙ্গ।

'সলিলবৎ' অর্থাৎ যেমন নদীর জল কোন বাধা না পাইলে নিম্নগামিত্ব শক্তিতে সাগরে চলিয়া যায়, বাধা পাইলে যাইতে পারে না। বেদপাঠে শারীরিক শক্তিহীনতাই একটি বাধা। এই বাধা থাকিলে শাখা-বর্ণিত অংশপাঠ ফললাভহীন।

সূত্র— দর্শয়তি চ ।। ৩/৩/৪

"সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্বানি চ যদ্বদন্তি।" (কঠ, ১/২/১৫)

এই মন্ত্রে ব্রহ্মের সর্ববেদবেদ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

"বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণমুখ্য সম্বন্ধ।
তাঁর জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ ।।" (মধ্য, ২০/১৪২)

শাখাভেদ ও বিদ্যাভেদ দ্বারা বস্তুগত ভেদ হয় না। বস্তু তত্ত্বত অভিন্ন। শ্রুতিতে দহরবিদ্যা, বৈশ্বানরবিদ্যা, প্রাণব্রহ্মরূপে উপাসনা,

ইত্যাদি বহু উপাসনার ভেদ দৃষ্ট হয়। ইহাতে চিত্তে সংশয় জাগিতে পারে। এই হেতু পরবর্তী সূত্রে বলিতেছেন—

২। উপসংহারাধিকরণ—

সূত্র— উপসংহারার্থাভেদাদ্বিধি-শেষবৎ সমানে চ।। ৩/৩/৫

উপসংহারঃ + অর্থাভেদাৎ + বিধিশেষবৎ + সমানে + চ।।

ব্রহ্মরূপ উপাস্যের সর্বত্র ঐক্যবশতঃ উপসংহার অর্থাৎ গুণগুলির সমন্বয় করণীয়। তাৎপর্য এই পরব্রহ্মের উপাসনায় এই কথা স্থির হইল যে, এক শাখায় বর্ণিত ব্রহ্মের গুণগুলি আর এক শাখায় গ্রহণ করা কর্তব্য। কারণ কি ? 'অর্থাভেদাৎ'— অর্থের অভেদত্বহেতু ব্রহ্মেই উপাস্যের সর্বত্রই ঐক্য দৃষ্ট হয়।

উপাস্য পরব্রহ্ম সর্বত্রই আছেন। অতএব তাঁহার বিভিন্ন উপাসনায় অনুল্লিখিত গুণসমূহ গ্রহণ করা কর্তব্য।

সূত্র— অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ।। ৩/৩/৬

বৃহদারণ্যক উপনিষদে—

'আত্মেত্যেবোপাসীত' (বৃহঃ, ১/৪/৭) অর্থাৎ এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে, আত্মাকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে। প্রশ্ন— আত্মার উপাসনা ও ব্রহ্মরূপের উপাসনার ফল কি এক হইবে ?

উত্তর হইল— তাহাই হইবে। তাহাই হইবে না এইরূপ কোন বাধক-বিশেষণ নাই— 'ন অবিশেষাৎ' পরব্রহ্মের বহু রূপ বহু গুণ আছে। কোন অবতারে সমগ্র গুণ প্রকটিত করেন, কোথাও বা কতিপয় রূপ প্রকটিত করেন। যে কোন স্থানে ব্যক্ত যে কোন গুণরাশি অনুষ্ঠান করিলেই ব্রহ্মের অনুষ্ঠান করা হইবে।

তত্ত্বভেদে ব্যক্তিব্রহ্মের যে কোন প্রকাশে যে কোন গুণ চিন্তা করিবেন।

৩। প্রকরণভেদাধিকরণ—

সূত্র— ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ।। ৩/৩/৭

পূর্বসূত্রোক্ত সিদ্ধান্তে আপত্তি হইতেছে। ঠিক নহে। 'ন বা'— নিশ্চয়ই নহে। পূর্বসূত্রে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইবে না। যে-ভক্ত যেই রূপে নিষ্ঠ তাঁহারা তদ্ভিন্নরূপে প্রকাশিত গুণাবলীর উপাসনা করিবেন না। যেমন— কৃষ্ণ-নিষ্ঠ ভক্তগণ নৃসিংহ-রূপের ধ্যান করেন

না। নৃসিংহ রূপের একনিষ্ঠ উপাসকগণ কৃষ্ণনিষ্ঠ বাঁশী ময়ূরপুচ্ছ ধ্যান করেন না। ইহাই ভক্তির প্রক্রিয়া।

কথাটি এই যে সনিষ্ঠ ভক্তি হইতে একান্তী ভক্তি শ্রেষ্ঠ। প্রশ্ন হইল, একান্ত ভক্তগণের উপাসনায় সমস্ত গুণের উপসংহার কর্তব্য কিনা? পূর্বপক্ষের মত সামর্থ্য থাকিলে শ্লাঘনীয় বলিয়া উপসংহার করা কর্তব্য। আর বর্তমান সূত্রে সূত্রকারের মত— না, তাহা হইতে পারে না। আমাদের শাস্ত্রের মত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই—

"চতুর্ভূজ মূর্তি করি আছেন বসিয়া।
কৃষ্ণ দেখি গোপী কহে নিকটে আসিয়া॥
ইঁহো কৃষ্ণ নহে, ইঁহো নারায়ণ মূর্তি।
এত বলি সর্বে তারে করে নতি স্তুতি॥
নমো-নারায়ণ, দেহ করহ প্রসাদ।
কৃষ্ণসঙ্গ দেহ মোরে ঘুচাহ বিষাদ॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি)

সমাধান: প্রত্যেক বস্তুর লক্ষ্যস্থান দুইটি— একটি তত্ত্বের দিক্ হইতে, আর একটি ব্যবহারিক বা জাগতিক দিক্ হইতে। তত্ত্বের দিক্ হইতে চিন্তা করিতে গেলে উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা-এর মধ্যে ভেদ নাই। এক ব্রহ্মই কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান ও অধিকরণ। সুতরাং তত্ত্বের দিক্ হইতে যেখানে দ্বৈত নাই তখন সকল গুণের সমাহার এক অদ্বয়-তত্ত্বে। রাম-উপাসনা, নৃসিংহ-উপাসনা ও কৃষ্ণ-উপাসনায় কোন ভেদ নাই তখন।

জাগতিক দিক্ হইতে দেখিলে উপাসকগণ নিজ নিজ অভীষ্ট উপাস্যকে ব্রহ্মস্বরূপে ভাবনা করিবেন। উপাসক তাঁহার ইষ্টকে বলেন, প্রভো! তুমিই বিশ্বেশ্বর। তোমার অনেক উপাসক আছে। তুমি আমাকে তোমার ভক্তগণের মধ্যে একজন করিয়া লও। ইঁহাদের মধ্যে শান্ত দাস্য ভেদ আছে। ইঁহারা আপন ইষ্টদেবে সমুদয় গুণ উপাসনা করিয়া থাকেন। এই ভজনে ঐশ্বর্যজ্ঞান আছে। ইহাকে তদীয়তাময় ভক্তি বলা যায়।

সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের যে ভজন আছে— তাহাতে আমি তাঁহার নই, তিনি আমার— ইহাকে বলে মদীয়তাময়-সম্বন্ধ। তিনি আমার একার। আমি তাঁহাকে ইচ্ছামত সাজে সাজাইব। এখানে ঐশ্বর্যজ্ঞান বিন্দুমাত্র নাই। পূর্ণ মাধুর্য। এই অবস্থায় ভক্ত তাঁহার আরাধ্য

বস্তুর আরাধনা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারেন না। সিদ্ধান্ত হইল— 'গুণোপসংহার' সকল স্তরের ভক্তের পক্ষে প্রয়োজনীয়। ইঁহারা নিজ নিজ ইষ্টতে অসাধারণ সকল-গুণ দর্শন করিবেন। যাঁহারা ঐকান্তিক একনিষ্ঠ সাধক তাঁহারা তাঁহাদের ইষ্টকেই সর্বতোভাবে জানেন। তাঁহাদের গুণোপসংহার— প্রয়োজনীয়তা নাই।

সনিষ্ঠ সাধকের গুণোপসংহার প্রয়োজন। ঐকান্তিক বা (একান্তী) সাধকের প্রয়োজন নাই।

৪। সংজ্ঞাতোঽধিকরণ—

সূত্র— **সংজ্ঞাতশ্চেৎ তদুক্তম্, অস্তি তু তদপি**।। ৩/৩/৮

প্রশ্ন হইতেছে, সনিষ্ঠ ও ঐকান্তিক, দুইই যদি ব্রহ্মোপাসনা হয় তবে দুই প্রকার নিয়ম কেন? এই সূত্রে উত্তর দিতেছেন—

সনিষ্ঠ ভক্ত ও একান্তীদের একই বিধান হইলে একান্তদের বৈশিষ্ট্যে শ্রেষ্ঠত্বের হানি করা হয়। একান্তীদের বৈশিষ্ট্য যে, তাঁহারা ভগবানের কোন একটি রূপে একান্তভাবে আসক্ত। তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বও এই জন্যই।

বলা হইয়াছে যে, একান্ত ভক্তরা একরূপেই সর্বদা আসক্তচিত্ত। বস্তুত সেইরূপ দেখা যায় না; শ্রীকৃষ্ণকে কেহ যশোদার শিশুরূপে, শ্রীদামাদির সখারূপে, কেহ নবকিশোর রূপে, কেহ পার্থসারথিরূপে সেবা করেন, বিভিন্নরূপে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম স্বরূপতা বা পূর্ণতা কিরূপে উপপন্ন হয় তাহার উত্তর দিতেছেন পরবর্তী সূত্রে—

সূত্র— **ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্**।। ৩/৩/৯

পরব্রহ্মে বিভুত্ব সর্বদাযুক্তহেতু ঐ সকল রূপে বা ভাবে সকলই সঙ্গত হয়। লীলায় বহুমূর্তি ধারণ করিয়া সীমাবদ্ধ দেহধারীরূপে প্রতীয়মান হইলেও তাঁহার সকলমূর্তিই সমকালে অনন্ত বটে। শ্রুতিতে তাঁহার অনন্ত মূর্তির প্রত্যেক অবয়বের বিভুত্ব কথিত হইয়াছে। "সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্"। (শ্বেতাশ্বতর ৩/১৬) অতএব সমস্তই সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে।

৫। সর্বাভেদাধিকরণ—

সূত্র— **সর্বাভেদাদন্যত্রেমে**।। ৩/৩/১০

আপত্তি— লীলা যদি নিত্য হয় তাহলে একই যশোদা অনন্তকাল ধরিয়া শিশুকৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইবেন। একই সপ্তমবর্ষীয় শিশুকৃষ্ণ

গোবর্ধন ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন। একই কিশোর- কৃষ্ণ অনন্তকাল রাসলীলা করিবেন। এইসব কিরূপে সঙ্গত হয় ? এই সকল আপত্তির উত্তর সূত্রকার বলিতেছেন উপরোক্ত সূত্রে।

"সর্বাভেদাদ্"— সমুদয় অনন্ত শ্রীভগবানে সম্ভব। অনন্তের পক্ষে ভিন্নকালে বা এককালে অনন্তমূর্তি ধারণে পূর্ণতার হানি হয় না। পূর্ণ হইতে পূর্ণ চলিয়া গেলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।

ভগবানের এইসব তত্ত্ব তিনি অনুগ্রহ করিয়া না জানাইলে জ্ঞান-বিচার দ্বারা কেহ জানিতে সমর্থ হয় না। মুণ্ডকোপনিষদে বলিয়াছেন—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।।"
(মুণ্ডক, ৩/২/৩)

শ্রীভগবানের ধাম, ভূষণাদি, অস্ত্রাদি, পরিকরাদি, সকলই স্বরূপ হইতে অভিন্ন। এইজন্য অন্যত্র অর্থাৎ অন্য স্থানে, অন্য কালে, অন্য লীলায় এরা একরূপই থাকে।

৬। আনন্দাদ্যধিকরণ—

সূত্র— আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য।। ৩/৩/১১

শ্রুতিতে ব্রহ্মের বহুগুণের কথা আছে, 'রসো বৈ সঃ', (তৈত্তিঃ, ২/৭) 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ', (তৈত্তিঃ, ৩/৬) 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছান্দোগ্য, ৩/১৪/১) 'সর্বমিদমভ্যাত্তঃ', (ছান্দোগ্য, ৩/১৪/৪), 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং', (ছান্দোগ্য, ৬/৯/৪) 'বিজ্ঞানময়ঃ', (বৃহঃ, ৪/৪/২২) 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম', (বৃহঃ, ৩/৯/২৮) 'বিজ্ঞানমানন্দং' (বৃহঃ, ২/৪/১২) ইত্যাদি—

এই গুণসমূহ সমুদয় উপাসনায় উপসংহার করিতে হইবে ? ইহার উত্তর এই সূত্রে দিয়াছেন। সকলই ব্রহ্ম উপসনায় উপসংহরণীয় কারণ, প্রধানীভূত গুণী উক্ত গুণসমূহ হইতে অপৃথক্ হওয়ায় উপসংহার কর্তব্য। মূলকথা তিনি আনন্দ-প্রচুর।

সূত্র— প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে।। ৩/৩/১২

তৈত্তিঃ, ২/৫ মন্ত্রে "তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।"

এই বাক্যে প্রিয় শিরস্তাদি গুণের উপসংহার ব্রহ্মে হইবে কিনা প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন— হইবে না। ওগুলি গুণ নহে, রূপক মাত্র।

পক্ষ-পুচ্ছাদি ভেদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মে বৃদ্ধিহ্রাসের সম্ভাবনা উদয় হইতে পারে। ব্রহ্ম পক্ষীর মত নহে। তিনি পুরুষবিধ।

সূত্র— ইতরে ত্বর্থ-সামান্যাৎ ॥ ৩/৩/১৩

ব্রহ্মের ঐশ্বর্য, গাম্ভীর্য, কারুণ্য, ভক্তবাৎসল্য সর্বত্র সমদৃষ্টি প্রভৃতি অসংখ্য গুণ। তাহাদের উপসংহার হইবে কিরূপে? এই সূত্রে উত্তর দিতেছেন— সকল গুণই ব্রহ্মবস্তুর সমানার্থক, কারণ, ঐ সকল গুণ সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্বাবস্থায়, সর্বপ্রকার সাধকসত্তার মোক্ষ প্রাপ্তিরূপ একই ফল প্রদায়ক বলিয়া।

সূত্র— আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥ ৩/৩/১৪

তৈত্তিরীয়-শ্রুতিতে উপাসনার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মের পক্ষীরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। "প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ"— এইসব কল্পনা। অন্য কোন প্রয়োজন নাই।

সাধকের ধ্যান-ধারণার সৌকর্যার্থে তৈত্তিরীয়-শ্রুতিতে তাঁহার পক্ষীরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। তিনি নানারূপে, নানাগুণ পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হন বলিয়া সাধক যে কোনও প্রকারে সাধনা করেন তাহা তাঁহারই উপাসনা।

সূত্র— আত্ম-শব্দাচ্চ ॥ ৩/৩/১৫

তৈত্তিরীয় শ্রুতি ২/৫ মন্ত্রে তাঁহাকে "আত্মানন্দময়ং" বলিয়াছেন, আত্মার শির-পক্ষাদি থাকা অসম্ভব। সুতরাং তাঁহার মস্তক পুচ্ছ ইত্যাদি কথা রূপকভাবে বলা হইয়াছে ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তির সুবিধার জন্য। অথবা, এই সূত্রের অন্য প্রকার অর্থ। আত্মাশব্দ প্রয়োগ দ্বারা তিনি যে সর্বব্যাপী ব্রহ্মবস্তু ইহা জানানো হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত (১০/১৩/২৭) শ্রীকৃষ্ণকে আত্মা বলিয়াছেন।

"ইত্থমাত্মাত্মনাত্মানং বৎসপালমিষেণ সঃ।
পালয়ন্ বৎসপো বর্ষং চিক্রীড়ে বনগোষ্ঠয়োঃ ॥"

এইরূপ স্বয়ং আত্মা শ্রীকৃষ্ণ বৎসপালকছলে আপনদ্বারা আপনাকেই পালন করতঃ এক বৎসর যাবৎ বনে ও গোষ্ঠে ক্রীড়া করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ তাহা জানাইবার জন্য তাঁহাকে 'আত্মা' বলা হইয়াছে।

সূত্র— আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ ॥ ৩/৩/১৬

শ্রুতিতে আত্ম শব্দ পরমাত্মাকেই নির্দেশ করে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮৫/২৪)—

"আত্মা হ্যেকঃ স্বয়ংজ্যোতির্নিত্যোঽন্যো নির্গুণো গুণৈঃ॥"
এখানে আত্মা পদে যে পরমাত্মা তাহা সুস্পষ্ট।

সূত্র— অন্বয়াদিতি চেৎ, স্যাদবধারণাৎ॥ ৩/৩/১৭

শ্রুতিতে আত্মা পদে পরমাত্মা আনুষ্ঠানিক বুঝাইয়াছে। সংশয় এই যে তৈত্তিরীয় উপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়ে, দুই, তিন ও চার মন্ত্রে আত্মাকে প্রাণময় মনোময়, বিজ্ঞানময় এইসব বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। প্রাণময় মনোময় এই সকল বস্তুতঃ জড়। বিজ্ঞানময় চিদ্ঘন। তবে আত্মা যে পরমাত্মা হইবে ইহার কি প্রমাণ ?

পূর্বপক্ষের উত্তর দিতেছেন উপরোক্ত সূত্রে। প্রাণময় মনোময় ইত্যাদি অনাত্মপদার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ হেতু যদি বল আত্মা পরমাত্মাই তাহা হইলে উত্তর 'অবধারণাৎ'। অন্নময় কোষ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অন্তর, অন্তরতর, অন্তরতম অন্নময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময় কোষের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারই অন্তরে আর অন্য কোষ না থাকায় তাহাতেই পরিসমাপ্তি। ইহাতে স্পষ্ট উক্তি করিয়াছেন— 'অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ'। (তৈত্তিঃ, ২/৫)। সুতরাং সুন্দররূপে প্রতিপাদিত হইল যে, আনন্দময় কোষ সম্পর্কে উল্লেখিত আত্মা পরমাত্মাই। জীবাত্মা নহে।

৭। কার্যাখ্যানাধিকরণ—

সূত্র— কার্যাখ্যানাদপূর্বম্॥ ৩/৩/১৮

গীতায় উপাস্য পরব্রহ্মকে গতি, ভর্তা, সখা, সুহৃদ্ বলা হইয়াছে। এই সকল কথা ভাগবতেও আছে। এই সকল শব্দ শ্রুতিতে নাই। তাই বলিয়াছেন 'অপূর্ব'। "আখ্যানাদ্ অপূর্বম্"! ঐ সকল প্রকার উপাসনার ফল মুখ্যই। অতএব উহাতে উপসংহার করণীয়। সুতরাং পিতা, মাতা, সুহৃদ্, প্রভু, ইত্যাদি রূপে ভগবানের ধ্যান-ধারণায় পরম পুরুষার্থ লাভ হয়। শ্রুতিতে আত্মবৎ উপাসনা করিবার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া উপাসনা করা কর্তব্য। উপাস্যকে উপাসনা করিবার জন্য খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে না। তিনি আত্মার আত্মারূপে হৃদয়গুহায় অবস্থিত। শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে যে ইহাকে পিতা, মাতা, পতি এইরূপে উপাসনা করাতে নিষেধ করা। যদি ভগবান্কে এইসকল ভাবে প্রিয়তম ভাবে উপাসনা করিতে পারা যায় তবে দোষ তো নাই-ই,

এইসব উপাসকের অনুভূতি হইতে জাত বলিয়া বিশেষ উজ্জ্বল ও জীবন্ত।

"সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্।"
(ভাগ:, ১১/৮/৩৪)

ইনিই দেহধারীগণের প্রিয়তম আত্মা, নাথ ও সুহৃৎ।

৮। সমানাধিকরণ—

সূত্র— সমান এবং চাভেদাৎ।। ৩/৩/১৯

সংশয় হইতে পারে যে যজুর্বেদে কথিত শাণ্ডিল্যবিদ্যা ও বৃহদারণ্যকে কথিত ৫/৬/১ মন্ত্রের শাণ্ডিল্যবিদ্যা এক, না অভিন্ন? উপাস্যের ভেদ-বশতঃ বিদ্যার ভেদ হইতে পারে। এই সূত্রে উত্তর দিতেছেন। এই সংশয়ের উত্তর—

সমানঃ + এবং + চ + অভেদাৎ।।

উভয় শাণ্ডিল্য বিদ্যার উপাস্য বস্তু এক ও অভিন্ন। উভয় বিদ্যারই ঐক্য আছে। ভেদ নাই। এই সূত্রে এই ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য সম্মত। কিন্তু বলদেব বিদ্যাভূষণ অন্যরূপ অর্থও করিয়াছেন। বলদেবের মত— সংশয় জাগিতেছে শ্রুতি বিরোধবশতঃ। প্রশ্ন— ভগবদ্ উপাসনা কিরূপে করিব? বিশুদ্ধ আত্মারূপে, না বিগ্রহরূপে? ব্রহ্ম হইবে "একরসম্"। বিগ্রহে হস্তপদাদি থাকায় এক রসের বিরুদ্ধভাব দেখা যায়। হস্তপদাদি থাকায় স্বগতভেদ স্পষ্ট। অতএব বিগ্রহ উপাস্য নহে, বিশুদ্ধ আত্মাই উপাস্য। এইরূপ সংশয়ের উত্তর দিয়াছেন উপরোক্ত সূত্র—

"সমান এবং চাভেদাৎ।"

মাটির বিগ্রহে যেরূপ অন্তর বাহির সবই মৃন্ময় সেই রূপ ভগবদ্ বিগ্রহে হস্তপদাদি দেখা গেলেও সবই সচ্চিদানন্দময়। বিগ্রহের হস্তপদাদি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে।

৯। সম্বন্ধাধিকরণ—

সূত্র— সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি।। ৩/৩/২০

বিগ্রহাদি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ব্রহ্মজ্ঞ গুরু সম্বন্ধেও তাহা খাটিবে না কি? উত্তর দিয়াছেন— গুরু ও শিষ্য যখন উত্তরাধিকারী, যখন

ব্রহ্মভাবে বিভাবিত হইতে সমর্থ হইয়াছেন তখন ব্রহ্মভাবাবিষ্ট গুরুতে ব্রহ্মগুণের উপসংহার কর্তব্য। শ্বেতাশ্বতর (৬/২৩) উপনিষদে তাহাই বলিয়াছেন—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

—যে ব্যক্তির ভগবানে পরাভক্তি আছে, এবং ভগবানে যেইরূপ, নিজ গুরুতেও সেইরূপ, তাঁহারই নিকট এই উপদেশ সকল প্রকাশিত হয়। তিনি মহাত্মা।

সূত্র— **ন বা বিশেষাৎ॥ ৩/৩/২১**

যাঁহারা আবেশ-অবতার, পূর্ণ ব্রহ্ম নহেন, সাময়িকভাবে ব্রহ্মভাব উপস্থিত, তাঁহাদিগকে কি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করা যাইবে? উত্তর দিয়াছেন, না। সাময়িক আবেশ-অবতারে ব্রহ্মরূপে উপাসনা কর্তব্য নহে। সূত্র মধ্যে বা শব্দের দ্বারা বলিতেছেন যে, ভগবদ্ ভাবাবিষ্ট ব্যক্তির উপাসনা ব্রহ্ম উপাসনা না হইলেও যাঁহারা ভগবানের প্রিয়, ভগবানের চিহ্নিত ব্যক্তি মনে করিয়া তাঁহাদের ভক্তি শ্রদ্ধা করা সকলেরই কর্তব্য। তাঁহাদের সঙ্গফলে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।

সূত্র— **দর্শয়তি চ॥ ৩/৩/২২**

ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায়, দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য ভগবান্ সনৎকুমারের প্রার্থী হইয়া ছিলেন। গুরু উপদেশে নারদের ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইয়াছিল। সুতরাং সূত্রে দেখা গেল ব্রহ্মবিৎ গুরুর করুণা ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। এইরূপ ব্রহ্মবিৎ গুরুকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা যাইতে পারে, যদি শিষ্যের তাদৃশ অনুভূতি জাগে।

সূত্র— **সংভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ॥ ৩/৩/২৩**

'সংভৃতিদ্যুব্যাপ্তি' অর্থ হইল সম্যক্ স্থিতি ও দ্যুলোকে ব্যাপকতা। আবেশ-অবতারে পরব্রহ্মের উক্ত দুইটি গুণ উপসংহার-কর্তব্য নহে। এই দুইটি গুণ আবেশ-অবতারের নাই। সুতরাং আবিষ্ট পুরুষের ব্রহ্মের গুণ উপসংহার না করাই কর্তব্য। বিষ্ণু, ত্রিবিক্রম অবতার ধারণ করিলে তাঁহার পাদোদকে মূল প্রকৃতির আবরণ অবধি লোকসকল কম্পমান হইয়াছিল। ইহা পরমাত্মার বিশেষ গুণ। আবিষ্ট পুরুষের কখনও তাহা থাকিতে পারে না।

সূত্র— **পুরুষবিদ্যায়ামিব চেতরেষামনাম্নানাৎ॥ ৩/৩/২৪**

বেদের পুরুষসূক্তে— 'পুরুষ এবেদং সর্বং' ইত্যাদি মন্ত্রে সে সকল কথা বর্ণিত আছে। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে সনৎকুমারের ঐ সকল গুণ বর্ণিত হয়নি। ঐজন্য সনৎকুমারের ব্রহ্মর গুণ এইরূপ উপসংহার হইবে না। ভগবানের চিহ্নিত অতি প্রিয় মনে করিয়া সনৎকুমারাদিকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতে হইবে।

ভাগবতে অক্রূর মানবশিশুরূপী শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্মজ্ঞানে স্তব করিয়াছিলেন। সেই স্তবে পুরুষোক্ত কথিত গুণসকলের সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মাত্মকতা সন্দেহাতীত। সনৎকুমারাদি ভক্তগণ এইরূপ নহেন।

১০। বেধাদ্যধিকরণ—

সূত্র— বেধাদ্যর্থভেদাৎ।। ৩/৩/২৫

অথর্ববেদে অগ্নি দেবতাকে রাক্ষসশক্তিগণের প্রতি হিংসাত্মক কার্য করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল ক্লেশকর গুণসকল ব্রহ্মের উপাসনায় উপসংহার করা হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে ১১/১০/৪ শ্লোকে—

"নিবৃত্তং কর্ম সেবেত প্রবৃত্তং মৎপরস্ত্যাজেৎ।"

মৎপরায়ণ ব্যক্তি প্রবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিমার্গই আশ্রয় করিবে। নিবৃত্তিমার্গে জীবহিংসা নিষিদ্ধ।

১১। হান্যধিকরণ—

সূত্র— হানৌ তূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দঃস্তুত্যুপগানবৎ তদুক্তম্।। ৩/৩/২৬

ব্রহ্মজ্ঞানীর শাস্ত্রপথের প্রয়োজন আছে কিনা। যিনি ব্রহ্মসান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহার প্রয়োজন নাই। তবে 'ছন্দতঃ' ইচ্ছানুসারে আনন্দময়ের স্মারকগ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন।

যিনি প্রজ্ঞা লাভ করিয়াছেন— বৃহদারণ্যক-শ্রুতি তাঁহাকে বহুশাস্ত্র আলোচনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্ বহুঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ।।"

(বৃহদারণ্যক, ৪/৪/২১)

বহুতর শব্দচিন্তা করিবে না, কেননা তাহাতে কেবল বাগিন্দ্রিয়ের

গ্লানি বা অবসাদ জন্মিয়া থাকে মাত্র। মহাপ্রভুও সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন——

"বহুশাস্ত্র কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জিবে।"

সূত্র—— সাম্পরায়ে তর্তব্যাভাবাৎ তথা হ্যন্যে।। ৩/৩/২৭

সাম্পরায়ে শব্দের অর্থ সম্যক্ প্রাপ্তি। অর্থবৎ ভগবৎ প্রেমপ্রাপ্তি হইলে শাস্ত্রানুশীলন বিধি পূর্বক করণীয় নহে। ইহা করা না করা সাধকের ইচ্ছামাত্র।

১২। ছন্দতোঽধিকরণ——

সূত্র—— ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ।। ৩/৩/২৮

মাধুর্য ও ঐশ্বর্য জ্ঞানের পার্থক্যবশত ভক্তি দ্বিবিধা কথিত হইয়াছে। এই দুই প্রকার ভক্তির মধ্যে কোন্‌টি ভগবৎ প্রেমে প্রবেশ করিবার উপায় তাহা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। দুই প্রকার উপাসনারই পোষক প্রমাণ আছে। উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। যাঁহার যেমন অধিকার তেমনি ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিয়া ভগবদ্ লাভ করিতে পারে। ভক্তের ত্রিবিধ ভেদ কথিত হইয়াছে—— উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। ইহার মধ্যে মধ্যম ভক্ত ঐশ্বর্য জ্ঞানের উপাসক। মধ্যম ভক্তের ভেদ জ্ঞান আছে।

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু বা।
প্রেম মৈত্রী কৃপাপেক্ষ যঃ করোতি স মধ্যমঃ।।"

(ভাগবত ১১/২/৪৬)

যাঁহার ঈশ্বরে প্রেম ঈশ্বর ভক্তের প্রতি মিত্রতা, অজ্ঞজনের প্রতি কৃপা ও বিদ্বেষীগণকে উপেক্ষা করেন তিনি মধ্যম। ভেদদৃষ্টি বিদ্যমান থাকায় তাঁহারা ঐশ্বর্য জ্ঞানের উপাসক। উত্তমভক্ত সর্বদা ভগবদ্‌ভাবেই বিভোর। তাঁহার ভেদ দৃষ্টি নাই। তিনিই মাধুর্য ভাবের উপাসক। উত্তম ভক্তের লক্ষণ ভাগবত বলিয়াছেন——

"ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্রঃ।।"

(ভাগঃ, ১১/২/৫৩)

যিনি আপনার ভগবদ্ভাব সর্বভূতে অবলোকন করেন, এবং আত্মস্বরূপ ভগবান্‌কে সর্বভূতে দেখেন, তিনি বিধি নিষেধের অন্তর্বর্তী নহেন। তাঁহার ভেদ দৃষ্টি নাই। তিনিই উত্তম ভক্ত।

সূত্র—— গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থাঽন্যথা হি বিরোধঃ।। ৩/৩/২৯

জ্ঞানের পথ এবং ভক্তির পথ। উভয় পথের লক্ষ্য একই। সুতরাং উভয়পথের বিরোধিতার কোন সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানপথে সাধক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে— ভগবৎতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব। ভক্তিপথে ভগবৎতত্ত্ব আপনা হইতে আসিয়া যায়। ঔষধের গুণ না জানিয়া গলাধঃকরণ করিলে ঔষধ যেমন নিজগুণে রোগমুক্ত করে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করিয়াও, শ্রদ্ধাভক্তির দ্বারা সে তত্ত্বজ্ঞান পাইয়া যায়।

১৩। উপপন্নাধিকরণ—

সূত্র— **উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ** ।। ৩/৩/৩০

বিধিমার্গ ও রাগমার্গের পার্থক্য বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। সংসারবদ্ধজীব সর্বদাই ত্রিতাপে তপ্ত। মুক্তি সংসার-তাপের নাশক, তাই তাহারা সর্বদা মুক্তি কামনা করে। সকল সাধকই মুক্তির জন্য আরাধনা করে। তাঁহাবা উহা নিজেদের জন্যই করিয়া থাকে। রাগমার্গের ভক্ত নিজের কথা ভাবেন না। ভগবানের সুখবিধানই তাঁহার উদ্দেশ্য। এইজন্য ভগবান্‌ও ভক্তির গভীরতা অনুসারে নিজের সাধন কথা ভুলিয়া যান। ভক্তের অধীন হইয়া পড়েন। পতি-পরায়ণা পত্নী সর্ববিধ সেবার দ্বারা যেমন পতিকে বশীভূত করে সেই প্রকার।

"বশেকুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিযঃ সৎপতিং যথা।"

১৪। অনিয়মাধিকরণ—

সূত্র— **অনিয়মঃ সর্বাসামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্‌** ।। ৩/৩/৩১

ধ্যান, জপ, ভজন, কীর্তন, এইসব সাধুদের করণীয় নববিধা ভক্তির ভজনের উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে কোনটি বিশেষভাবে করণীয় কিংবা সবগুলি করণীয় ? এইরূপ সংশয়ের উত্তর দিতেছেন। শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা ভক্তির সবগুলি একসঙ্গে কারিবার শাস্ত্রে বেশী দৃষ্টান্ত নাই। শ্রুতি ও স্মৃতির কোন একটির সাধন সম্পর্কে কোন বিরোধ নাই। ভজনাঙ্গের যে কোন একটিকে একাগ্রভাবে সাধন করিলে বাঞ্ছিত ফললাভ হয়।

"এক অঙ্গ সাধে কিংবা সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা থাকিলেই উঠে প্রেমের তরঙ্গ।।" (চৈতন্যচরিতামৃত)

সূত্র— **যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্‌** ।। ৩/৩/৩২

তত্ত্বজ্ঞান হইলেই যে মুক্তি হয় এই বিষয় সংশয়। ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদির

কি তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই? তত্ত্বজ্ঞান ছিল না? তাঁহারা কৃষ্ণের প্রতিকূল আচরণ করিয়াছেন কেন ঝড়বৃষ্টি ও গোবৎসহরণ দ্বারা? ইহার উত্তর দিতেছেন : ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের প্রতিকূল আচরণ লীলার বৈশিষ্ট্য মাত্র। ভগবানের ইচ্ছানুসারেই হইয়াছে। লীলায় মাধুর্য দেখাইবার জন্য তাঁহাদের দ্বারা প্রতিকূল আচরণ করাইয়া থাকেন। ইহার দ্বারা জীবেরও শিক্ষা হয়। ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি যে সৃষ্টিক্রিয়াদিতে ব্যাপৃত তাহাও তাঁহার ইচ্ছায়।

এই শ্লোকের আর এক প্রকার অর্থও হয়। শ্রীভগবানের বিধানে যিনি যে অধিকার পাইয়াছেন সেই অধিকারপদে বর্তমান থাকিলে ততদিন সেই সমাজগত নিয়মাদি তাঁহাকে পালন করিতে হইবে।

১৫। অক্ষরধ্যধিকরণ——

সূত্র—— অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্য-তদ্ভাবাভ্যামৌপসদবৎ, তদুক্তম্।। ৩/৩/৩৩

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময়। সুতরাং অক্ষর ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতি কথিত সমুদয় ধর্মই ব্রহ্মোপসনার অন্তর্গত। সুতরাং সকল উপাসনাতেই ব্রহ্ম ভজনীয়। বৃহদারণ্যক (৩/৮/৮ মন্ত্রে) 'অস্থূলমনহ্রস্বমদীর্ঘম্'... বলা হইয়াছে তিনি অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অদৃশ্য, অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষু, অশ্রোত্র—— এই সমুদয় গুণই উপাসনার ক্ষেত্রে গ্রহণীয়।

সূত্র—— ইয়দামননাৎ।। ৩/৩/৩৪

যাহার অভাবে ব্রহ্মচিন্তা হইতে পারে না, সেই শরীরগত অস্থূল ইত্যাদি গুণসমুহ সকল ব্রহ্মোপাসনায় গ্রহণীয়। কিন্তু সর্বকর্মা, সর্বগন্ধ, সর্বরস ইত্যাদি ধর্মে সর্বত্র উপাসনা প্রয়োজনীয় নহে।

১৬। অন্তরত্বাধিকরণ——

সূত্র—— অন্তরাভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ।। ৩/৩/৩৫

'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'। পরব্রহ্ম যাঁহাকে বরণ করেন অর্থাৎ স্বজন বলিয়া অঙ্গীকার করেন তিনি তাঁহাকে লাভ করেন। সেই ভক্তচক্ষে পরমপদ পঞ্চভূতের নির্মিত বলিয়া মনে হয়। ভক্তের সুখোদয়ের জন্য তাঁহার বক্ষে তাঁহার পরমপদ ঐরূপ মনে হয়। বস্তুতঃ তাহা সবই ব্রহ্মময়। ভূতময় নহে। তিনি স্বরূপে অবস্থান করিয়াও ধামে স্বরূপশক্তির বিকাশে বৈচিত্র্যময় বলিয়া প্রকাশ করেন।

স্বরূপশক্তির বিকাশে ভগবান্ তাঁহার বৈচিত্র্যময় ধাম ও পরিকর প্রকাশ করেন। ভগবদ্ ধামে যত বৈচিত্র্য সকলই ভগবৎতুল্য চিন্ময়।

সূত্র— অন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশান্তরবৎ।। ৩/৩/৩৬

যেমন সূর্যমণ্ডল, সূর্যের তেজোরাশি, সূর্যের কিরণ, ইহারা সূর্য ব্যতীত অন্য কোন পৃথক্ বস্তু নহে, সেইরূপ শ্রীভগবদ্ ধাম এবং ধামের যত কিছু সমুদয়, ভগবান্ হইতে পৃথক্ বস্তু নহে। তিনি নিজেই নিজের ধাম এবং সেইখানে তিনি স্বরূপে থাকিয়াও তিনি আনন্দ অনুভবকারী, আনন্দ অনুভবশীল। ধাম, পরিকর, সখা, সখী, প্রভৃতি বিচিত্ররূপে তিনি নিজেই নিজেকে পরিণত করেন। ইহা দ্বারা তিনি আনন্দ অনুভব করেন এবং ভক্তগণের আনন্দ উপভোগ চরিতার্থতা সম্পাদন করেন। এই সূত্রে পূর্বাংশের পূর্বপক্ষের শেষাংশের উত্তর। তিনি এবং তাঁহার ধাম যদি একই হয় তাহা হইলে অধিষ্ঠান এবং অধিষ্ঠাতার অভেদ সম্ভাবনা হয়। ইহা কি অসঙ্গত নহে ?

তিনিই ধাম এবং তিনিই ধামের রমমাণ ঈশ্বর।

সূত্র— ব্যতীহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ।। ৩/৩/৩৭

ব্যতিহার অর্থ বিনিময়। একের বিনিময়ে অন্যের গ্রহণ। ব্রহ্ম, ভগবান্ ও তাঁহার ধাম একই বস্তু।

ভাগবত (১২/৫/১২) বলিয়াছেন—

"অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্।।"

১৭। সত্যাধিকরণ—

সূত্র— সৈব হি সত্যাদয়ঃ। ৩/৩/৩৮

পরব্রহ্ম সর্বকৃত্যাদি গুণ সম্পন্ন। পরমব্রহ্ম এবং তাঁহার ধাম অভিন্ন। ইহা শুনিলে বৃহদারণ্যকে "নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন" এই মন্ত্রের সঙ্গে কিছুটা সামঞ্জস্য হয়।

উত্তর "নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন"— ইহার অর্থ ব্রহ্মের বিজাতীয় কিছুই নাই। ইহার দ্বারা ব্রহ্মের সজাতীয় বা স্বগত স্বরূপানুবন্ধী ধর্মসকলের প্রত্যাখ্যান করা শ্রুতির অভিপ্রায় নহে। "পরাস্য শক্তিঃ বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।।" (শ্বেতাশ্বতর, ৬/৮) ব্রহ্মের স্বভাবসিদ্ধ পরাশক্তি আছে। এইরূপ পরাশক্তি তৎস্বরূপ হইতে অভিন্ন। সর্বত্র সর্বজ্ঞত্ব এই সকল পরাশক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে অভিন্ন।

১৮। কামাদ্যধিকরণ—

সূত্র— কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ।। ৩/৩/৩৯

শুক্ল যজুঃ ৩১/২২ মন্ত্রে আছে— "শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে পার্শ্বে"— অর্থাৎ শ্রী এবং লক্ষ্মী দুই পত্নী অহোরাত্র উভয় পার্শ্বে বিরাজিত। ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন ও আত্মানন্দ।

দিবারাত্র শ্রী ও লক্ষ্মী পত্নীদের মধ্যে বিদ্যমান থাকায় উক্ত ব্রহ্মাত্মক ক্রিয়ার আত্মক্রীড়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয় কি করিয়া? এই সূত্রে পূর্বসূত্র হইতে 'সৈব' অনুবর্তন করিতে হইবে। সেই লক্ষ্মী প্রভৃতি পরব্রহ্মের 'সৈব' পরাশক্তি। ব্রহ্মের ন্যায় সর্বব্যপকত্ব শক্তি। তাঁহার শক্তি তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন। একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্তের দ্বারা বলা যায়, কোনও সুকণ্ঠ গায়ক যদি তাঁহার কণ্ঠসঙ্গীত গ্রামাফোনের রেকর্ড করিয়া নিজেই নিজের গান শ্রবণ করেন তাহাতে কি তাঁহার আত্মানন্দের সুখের হানি হয়? গোপীগণ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি। ব্রজধামে রাধা যে নারীরূপে প্রকট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত বিহার করিয়াছিলেন তাহাতে আত্মক্রীড়স্বরূপের ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

সূত্র— আদরাদলোপঃ।। ৩/৩/৪০

শ্রীশক্তি ও লক্ষ্মীশক্তি ইহারা যদি অভিন্না হন তাহা হইলে ইহাতে ভক্তি থাকিতে পারে না। ভক্তি থাকিতে হইলে ভেদ থাকিতে হইবে। এই সংশয়ের উত্তর দিতেছেন পূর্বোক্ত সূত্রে—

'আদরাদলোপঃ।' তাঁহাদের ভগবানে অত্যন্ত প্রেম হেতু ভক্তির লোপ হয় না। ভগবানের আনন্দানুভূতি প্রকাশের জন্যই শ্রী প্রভৃতি আনন্দশক্তির অভিব্যক্তি। এই কারণ অভেদ হইল ভগবানের একান্ত ইচ্ছায় তাঁহার ভগবানের অত্যন্ত প্রেমহেতু ভক্তি অপ্রকট হয় না। বৃক্ষের শাখা বৃক্ষের কাছ থেকেই জীবিত থাকে। শাখা-পত্র বৃক্ষেরই শোভা করে, অথচ তাহারা অভিন্ন।

সূত্র— উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ।। ৩/৩/৪১

উপরোক্ত সংশয়ের আরও একটি উত্তর দিতেছেন। পরাশক্তি ব্রহ্ম হইতে "ভিন্নাভিন্নরূপা"। অর্থাৎ স্বরূপতঃ অভেদ হইলেও আনন্দানুভূতির জন্যই ভগবানের ইচ্ছাতেই ভিন্নরূপে প্রতীয়মান। এই শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া ভগবান্ হন পুরুষোত্তম। আর ভিন্নরূপে প্রতীয়মান পরাশক্তি হন পত্নী। সুতরাং যজুর্বেদের মন্ত্র ৩১/২২ 'শ্রীশ্চ

তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে পার্শ্বে'— ইত্যাদি মন্ত্রোক্ত পত্নী শব্দে কোন সিদ্ধান্ত ভাঙ্গিবে না। যেখানে লক্ষ্মী শব্দে সৌন্দর্য শ্রী শব্দে মাধুর্য বুঝাইয়া দিয়াছেন।

১৯। তন্নির্ধারণানিয়মাধিকরণ—

সূত্র— **তন্নির্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্ হ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্।।** ৩/৩/৪২

শ্রুতিমন্ত্রে রাম, নৃসিংহ, দুর্গা, প্রভৃতি উপাসনার কোন বিশেষ নিয়ম নাই। ব্রহ্মবুদ্ধিতে যাহা উপাসনা করা হউক না কেন ফল সর্বত্র সমান। পরমপদ লাভ। কিন্তু পৃথক্ বুদ্ধি থাকিলে হইবে না। গীতা বলিয়াছেন—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্।।" (৯/২৩)

অন্য দেবতার বুদ্ধি থাকিলে পৃথক্ ফল। একই দেবতার বুদ্ধি থাকিলে পৃথক্ ফল নহে। অন্য মনে করিলেই অবিধিপূর্বক হইবে। এক মনে করিলে এক ব্রহ্মের উপাসনা হইবে। নৃসিংহ-উপনিষদে নৃসিংহকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। 'রামতাপনি-উপনিষদ্'— রামকেই ব্রহ্ম বলিযাছেন। শ্বেতাশ্বতর ৩/২ মন্ত্রে রুদ্রকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। 'দেব্যুপনিষদ্' দেবী দুর্গাকেই ব্রহ্ম বলিযাছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ব্রহ্মকে 'একমেবদ্বিতীয়ম্' বলিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম কে? রাম, নারায়ণ, না দুর্গা, ইহা স্থির হওয়া প্রয়োজন। এইরূপ সংশয়ে উপরোক্ত সূত্রে উত্তর দিয়াছেন 'তন্নির্ধারণানিয়ম্'। পরমব্রহ্মকে নির্ধারণ করিবার কোন নিয়ম নাই। ব্রহ্মবুদ্ধিতে যাঁহাকে উপাসনা করা যাউক না কেন ফল সমান। ব্রহ্মবুদ্ধির অভাব থাকিলে ফল পৃথক্ হইবে সুতরাং সকল আরাধ্যবস্তুতে ব্রহ্মভাবনাই উৎকৃষ্ট। সকল উপাস্যে ব্রহ্মোপলব্ধি না করা একটি অপরাধ। এই অপরাধ উপাসকের পক্ষে মঙ্গল নহে। প্রশ্ন হইতে পারে, সকলেই যদি ব্রহ্ম তাহা হইলে ভাগবত 'এতে চাংশ- কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'— এই কথা বলিলেন কেন? এই কথা বলার তাৎপর্য, শ্রীকৃষ্ণে ভগবানের সমগ্র শক্তির প্রকাশ। অন্য অবতারে অংশের প্রকাশ। বস্তুতঃ পূর্ণের অংশ হয় না। যদি অংশ হয় মনে করি তবে পূর্ণত্বের হানি হয়।

২০। প্রদানাধিকরণ—

সূত্র— প্রদানবদেব তদুক্তম্।। ৩/৩/৪৩

শ্বেতাশ্বতর (৬/২৩) মন্ত্রে উল্লেখ আছে—

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।"

—যাঁহার গুরুপদে ভক্তি পরমদেবতাতে ভক্তির তুল্য, এই সমস্ত কথিত পরামার্থতত্ত্ব তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়।

ইহাতে বুঝা যায় গুরুকৃপায় পরমতত্ত্ব অধিগত হয়। সংশয় জাগে গুরুকৃপা বলবান্, না সাধকের সাধনা বলবান্? এই সূত্রে উত্তর দিয়াছেন 'প্রদানবৎ'। শিশুর জননী যেমন শিশু বালককে শিশুর মত সাহায্য করেন, যুবক স্বামীকে তাঁহার মত খাদ্য দেন, স্বামীর বৃদ্ধ পিতাকে তাঁহার মত খাদ্য দেন। ইহার তাৎপর্য শিশু, যুবা, বৃদ্ধ একই প্রকার যোগ্যতা বিশিষ্ট নহে। যোগ্যতানুসারে খাদ্যগ্রহণ হয়। তদ্রূপ গুরুকৃপা বলবৎ, কিন্তু তাহার গ্রহণ নির্ভর করে শিষ্যের গ্রহণযোগ্যতার উপরে। শিষ্য যতই শ্রবণ, মনন, ভজন দ্বারা যোগ্য হইবে ততই অধিকতর গুরুকৃপালাভে সমর্থ হইবে।

সূত্র— লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ তদ্ধি বলীয়স্তদপি।। ৩/৩/৪৪

গুরুকৃপাই বলবত্তর, আবার শ্রুতিতে "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এর আদেশ আছে। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিতে গুরুকে পরমদেবতার ন্যায় ভক্তি করিবার উপদেশ আছে। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, গুরুকৃপা বলবত্তর হইলেও আপনার প্রযত্ন দ্বারা শ্রবণ মনন ইত্যাদি করণীয়। কৃপা ও প্রচেষ্টা দুইই প্রয়োজন।

২১। পূর্ববিকল্পাধিকরণ—

সূত্র— পূর্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়া মানসবৎ।। ৩/৩/৪৫

সূত্র— অতিদেশাচ্চ।। ৩/৩/৪৬

'সোঽহং', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি ভাবে অভেদ ভাবনা ভক্তিমার্গের ভজনের একটি অঙ্গ মাত্র। ইহাতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব বুঝিতে হইবে না। গোপালতাপনী-শ্রুতিতে ৮/৯ মন্ত্রে বলা হইয়াছে, "ভক্তো মম প্রিয়ঃ"। যদি উপাস্য-উপাসক অভেদ হইত তাহা হইলে ভক্ত-প্রিয় এইরূপ বলা যাইত না। অভেদচিন্তা ভক্তিমানের উপাসনার প্রকারভেদ মাত্র। স্বরূপতঃ একত্ব বিষয়ক নহে।

২২। বিদ্যাধিকরণ—

সূত্র— **বিদ্যৈব তু তন্নির্দ্ধারণাৎ** ।। ৩/৩/৪৭

মুক্তির হেতু কি কর্ম, নাকি বিদ্যা? অথবা কর্ম ও বিদ্যা উভয়ে? এই সংশয়ে উত্তর দিতেছেন—

মুক্তির হেতু বিদ্যাই— এইরূপ অবধারণহেতু বিদ্যাই মুক্তির উপায়। বিদ্যা অর্থ জ্ঞানপূর্বিকা ভক্তি।

'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি'— যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হন। জানা অর্থ ভক্তিপূর্বক সাধন ভজন উপাসনা দ্বারা জ্ঞান লাভ। 'ব্রহ্মৈব ভবতি' অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন।

সূত্র— **দর্শনাচ্চ** ।। ৩/৩/৪৮

বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। মুণ্ডক, ২/২/৮—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।।"

বিদ্যা দ্বারা সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

সূত্র— **শ্রুত্যাদি-বলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ** ।। ৩/৩/৪৯

'কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতাঃ জনকাদয়ঃ।' এইরূপ উক্তি গীতায় থাকা সত্ত্বেও কি করিয়া বলা যায় যে, বিদ্যাই মুক্তির হেতু? উত্তরে বলিতেছেন—

শ্রুতি, দৃষ্টান্ত, যুক্তি, প্রভৃতি প্রমাণহেতু পূর্বসিদ্ধান্তের বাধা হয় না।

যদি গুরুকৃপা ও ভগবদারাধনা দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়, তাহা হইলে পিতৃ-মাতৃসেবা বা সাধু-সজ্জনের সেবার কি প্রয়োজন? এই সূত্র উত্তর দিতেছেন—

২৩। অনুবন্ধাধিকরণ—

সূত্র— **অনুবন্ধাদিভ্যঃ** ।। ৩/৩/৫০

গুরুকৃপা ও ভগবদারাধনা মুক্তির উপায় হইলেও ভক্তসেবাদি কার্য আনুষ্ঠানিকভাবে করণীয়। শ্রুতিবাক্যেই আছে "মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব।" (তৈত্তিঃ ১/১১/২) ইহাদিগকে দেবতুল্য ভক্তি করা, সেবা করা শ্রুতির বিধান। ইহাতে সাধনার আনুকূল্য হয়। না করিলে সাধনার হানি হয়।

২৪। প্রজ্ঞান্তরাধিকরণ—

সূত্র— প্রজ্ঞান্তর-পৃথকত্ববদ্ দৃষ্টশ্চ, তদুক্তম্।। ৩/৩/৫১

ভগবান্‌কে যিনি যে ভাবে ভজনা করেন তাঁহারা তাঁহাকে সেই ভাবেই লাভ করেন। যাঁহার ভজন যেইরূপ তিনি সেইরূপ লাভ করেন। সকলেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভগবান্ এমনই অচিন্ত্যশক্তি, তিনি যে উপাসক কর্তৃক যেইভাবে যাচিত, সে সেইভাবেই দর্শন করে।

যেইরূপ এক একটি ইন্দ্রিয় দ্বারা দ্রব্যের রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ গৃহীত হয়— চিত্ত দ্বারা সবই গৃহীত হয়, সেইরূপ নানা উপাসনায় নানা ভাব গৃহীত হয়— ভক্তিরূপ চিত্ত দ্বারা সর্বভাব পূর্ণভাবে গৃহীত হইয়া থাকে।

সূত্র— ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবন্ন হি লোকাপত্তিঃ।। ৩/৩/৫২

মৃত্যু হইলেই মৃত্যু হয় না। মৃত্যু সকলেরই হয়। মৃত্যুর পূর্বেই যে জীবন্মুক্ত হয়, মৃত্যুর পর তাহার মুক্তি হয়। ভগবান্ অবতার গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার দর্শন লাভ করিলেই মুক্তি হয় না। এমনকি চন্দ্রলোকপ্রাপ্ত হইলেও আবার ফিরিয়া আসিতে হয়। ভগবদ্দর্শন দুই প্রকার— মায়াবৃত দর্শন ও মায়ারহিত দর্শন। প্রথমবারের দর্শনে স্বর্গাদি প্রাপ্তি হয়। দ্বিতীয় দর্শনে দর্শক তাঁহাকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ উপলব্ধি করিলে তাহার মুক্তি লাভ হয়। গীতায় বলিয়াছেন, যাহারা মূঢ়লোক, তাহারা ভগবান্‌কে মানুষবুদ্ধিতে দেখিয়া অবজ্ঞা করে, তাহাদের সদ্গতি লাভ হয় না। "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।" (গীতা, ৯/১১)। শ্রদ্ধাভক্তি দ্বারা স্থূল কারণদেহ নাশপ্রাপ্ত হইলে মুক্তি হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন, ভগবানের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিলে মুক্তি লাভ হয়। তদ্বিষয়ে সমাধান এই যে, ভগবান্ ও তাঁহার অস্ত্র অভিন্ন। তাঁহার সংস্পর্শেই ব্যক্তির প্রারব্ধ নষ্ট হইয়া যায়। কখনও কখনও ভগবদ্ভক্ত ভগবৎ ইচ্ছায় শত্রু হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। যেমন বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয়-বিজয়, রাবণ-কুম্ভকর্ণরূপে শত্রুভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহারা শ্রীরামচন্দ্রের অস্ত্রাঘাতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ইহা লীলার অঙ্গ মাত্র। সাধারণ নিয়ম এই যে, স্থূলদৃষ্টি দ্বারা ব্রহ্মদর্শনে মুক্তি হয় না। অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি হইলে মুক্তি হয়।

২৫। পরত্বাধিকরণ—

সূত্র— পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং, ভূয়স্ত্বাৎ ত্বনুবন্ধঃ।। ৩/৩/৫৩

কঠ উপনিষদ্ বলিয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয় বটে, কিন্তু কেবল বেদ অধ্যয়ন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হয় না। ব্রহ্ম যাহাকে বরণ করেন, 'যমেবৈষ বৃণুতে', তিনি যাহাকে অঙ্গীকার করেন, তাহার-ই মুক্তিলাভ হয়। ভগবানের বরণ বা অঙ্গীকার অহেতুকী বা আকস্মিক হয় না। সাধক নিজ চেষ্টায় শাস্ত্র অনুশীলন করিলে, গুরু-উপদেশের দ্বারা নিজেকে অধিকারী করিলে তবে উনি বরণ করেন। সাধকের চেষ্টা ও ভগবদনুগ্রহ এই দুইযের মধ্যে আপাত অসঙ্গতি মনে হইতে পারে কিন্তু উভয়ই সত্য। সাধক সাধনা করিতে করিতে ঠিক বুঝিতে পারেন যে, সাধনা দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না। তখনই কৃপা করিয়া তিনি বরণ করেন। সাধন দ্বারা পাওয়া যাইবে না, ইহা কাহারও মুখ হইতে শুনিয়া বা বই পড়িয়া জানা যাইবে না। সাধনা করিলেই জানিতে পারিবে। "আমার সাধনার ফল তুচ্ছ"— ইহা সাধনা দ্বারা জানিতে হইবে। ঐ অবস্থায় আত্মসমর্পণের ভাব হইলে ভগবান্ তাহাকে সরল মনে করিয়া বরণ করেন। সুতরাং সাধনা ও ভগবদনুগ্রহের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। গীতায় বলিয়াছেন, অনন্যাভক্তি দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায়। এই অনন্যাভক্তি সাধনা ব্যতিরেকে হয় না।

সাধনাও কৃপার ফলে হয়। ভক্তিমার্গে আরাধনা আরম্ভ হয় কর্তৃত্ব-জ্ঞান দ্বারা। কিন্তু ক্রমেই কর্তৃত্ববুদ্ধি বিলোপ হয় ও নির্ভরতা আসে এবং তখনই কৃপা প্রাপ্ত হয় এবং ভক্তি লাভ হয়।

২৬। শরীরে ভাবাধিকরণ—

সূত্র— এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ।। ৩/৩/৫৪

পূর্বে বলা হইয়াছে ব্রহ্ম পরম ব্যোমে নিজ ধামে বিরাজমান। কিন্তু কোনও কোনও সাধক শরীরের মধ্যে হৃদয়ে, শিরোদেশে ব্রহ্ম উপাসনা করেন। তাহাতে কি উপাসনা হয় ? উত্তর— হয়। গীতা বলিয়াছেন, "অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।" (গীতা, ১৫/১৪) বৈশ্বানর অগ্নিরূপে প্রত্যেক দেহেই অবস্থিত। সুতরাং দেহের অভ্যন্তরে হৃদয়ে শিরোপদেশে ব্রহ্ম অবস্থান আছেন। শরীরে অবস্থান হেতু শরীরগত কোনও দোষ ব্রহ্মে স্পর্শ করে না, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

২৭। তদ্‌ভাবভাবিত্বাদধিকরণ—

সূত্র— ব্যতিরেকস্তদ্‌ভাবভাবিত্বাৎ, ন তূপলব্ধিবৎ।। ৩/৩/৫৫

ভগবানের অনন্তভাব। যে যে ভাবে ভজন করে সে সেইভাবেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "যে যথা মাং প্রপদ্যান্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।" ইহার একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়। যখন শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলদেবের সহিত রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন, তখন মল্লগণ তাঁহাকে অশনিতুল্য, সাধারণ মানবগণ নরশ্রেষ্ঠ, স্ত্রীগণ মূর্তিমান কামদেব, গোপগণ তাঁহাদের স্বজন, অসৎ রাজগণ তাহাদের দণ্ডদাতা শাসন কর্তা, তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে স্নেহের দুলাল, কংস নিজের মৃত্যু স্বরূপ, অজ্ঞানীগণ বিরাট, যোগীগণ পরম তত্ত্ব এবং বৃষ্ণিগণ পরমদেবতারূপে দর্শন করিলেন। (ভাগবত, ১০/৪৩/১৭)

সূত্র— **অঙ্গাববন্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্।।** ৩/৩/৫৬

ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে ত্রিভুবন তাহার নিজকৃত কর্মফলে ধীরে ধীরে উপাসনা মার্গে অবস্থান করে— তাহারা নিজ নিজ মার্গে উপাসনা করে। ভগবান্‌ও উপাসকের উপাসনা কালে বিশেষ বিশেষ ভাবে তাহার পরিতৃপ্তি বিধান করেন।

সূত্র— **মন্ত্রাদিবদবাঽবিরোধঃ।।** ৩/৪/৫৭

একই মন্ত্রের একাধিক কর্মে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সেইরূপ ভগবানের ইচ্ছাবশতঃ কেহ ঐশ্বর্যমাধুর্য মিশ্রিতভাবে উপাসনা করেন। ব্রজ ভাবের ভক্তের ভাব মাধুর্যের, দ্বারকার ভাব ঐশ্বর্যের— উদ্ধবের উভয় মিশ্রিত ভাবের উপাসনা। সেই জন্যেই ভগবান্ উদ্ধবকে দ্বারকা হইতে বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। ঐরূপ মিশ্র ভজনে কোনওরূপ বিরোধিতা হয় না। ভগবানের ভক্তবাৎসল্য এত ব্যাপক ও গভীর যে, ভগবান্ ভক্তের ভাবনার অনুরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

২৮। ভূমজ্যায়স্ত্বাধিকরণ—

সূত্র— **ভূম্নঃ ক্রতুবৎ জ্যায়স্ত্বৎ, তথাহি দর্শয়তি।।** ৩/৩/৫৮

শ্রুতি বলিয়াছেন "একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি" অর্থাৎ তিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকটিত হন। সংশয় হয় এক উপাসনা ও বহুর উপাসনার মধ্যে বিরোধ আছে। উত্তর বলিতেছেন— বিরোধ নাই। শ্রুতি তাঁহাকে ভূমা বলিয়াছেন। ভূমার মধ্যে একত্ব বহুত্ব সমভাবে পর্যবসিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় কেহ এক শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা করেন— কেহ শ্রীরামসীতার উপাসনা করেন— কেহ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতার উপাসনা করেন। কেহ বা হনুমান সহ শ্রীরাম-

লক্ষ্মণ-সীতার উপাসনা করেন। একের উপাসনা ও বহুত্বের উপাসনায় কোনও বিরোধ নাই। তাহাতে এক ও বহু সমকালে প্রযুক্ত হইতে পারে। মানুষের বুদ্ধি ক্ষুদ্র বলিয়া তাঁহাতে বিরোধ দেখে। বস্তুতঃ ভগবানে কোনও বিরোধ নাই। যে কোনও ভাবেই উপাসনা করা হউক না কেন, তাঁহার ভূমাত্ব সর্বত্র সমান। তিনি এক অদ্বিতীয় হইয়াও একই কালে সর্বাত্মক। ইহা ভুলিলে ভজনে সংকীর্ণতা আসিবে। সঙ্কীর্ণতা ভজনে আসিলে ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি হয় না।

২৯। শব্দাদিভেদাধিকরণ—

সূত্র— **নানাশব্দাদিভেদাৎ।।** ৩/৩/৫৯

মানবপ্রকৃতি পরস্পর বিভিন্ন। সুতরাং উপাসনা যে ভিন্ন হইবে ইহাতে আশ্চর্যের কি ? ভাগবত বলিযাছেন।

"কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেযু কেশবঃ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে।।" ১১/৫/২০

বেদান্তের মত, অন্য মতকে শ্রদ্ধা করিবে— tolerance নয়, appreciation করিবে। শাস্ত্রোক্ত বিভিন্ন মত ও পথ একই বস্তুতে পাইবার জন্য বিভিন্ন উপায় মাত্র। একত্বে নিষ্ঠা ও বহুত্বে শ্রদ্ধা একই কালে থাকিতে কোনও বিরোধিতা নাই।

৩০। বিকল্পাধিকরণ—

সূত্র— **বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ।।** ৩/৩/৬০

উপাসক কি নিজ উপাসনাতেই নিবিষ্ট থাকিবেন, না অন্য কিছু করিবেন, এই আশঙ্কার উত্তবে এই সূত্র। উত্তরে বলিতেছেন যে, উপাসকের যাহা উপাস্য, তিনি সেই ইষ্টকেই আশ্রয় করিয়া থাকিবেন। তাঁহার পূজোপসনায বিহিত মন্ত্রবীজাদিব অনুগমন করাই একমাত্র কর্তব্য।

৩১। কাম্যাধিকরণ—

সূত্র— **কাম্যাস্তু যথাকামং সমচ্চিয়েরন ন বা পূর্বহেত্বভাবাৎ।।** ৩/৩/৬১

এই সকল কথা মুক্তিকামীর পক্ষে প্রযোজ্য।

যাহারা মুক্তিকামী নহে, ভোগকামী, তাহারা ঐহিক ধন, সম্পদ্, যশ কামনা করেন। ঐ কামনা পূরণেব জন্যে নানা দেবদেবীর উপাসনা

করেন। মুক্তিকামী সাধক অন্য কামনা চিত্তে রাখিবে না। যদি অন্য কামনা জাগে তাহা হইলে অন্য দেবতার পূজা করিবে না---- নিজ ইষ্টের কাছেই কামনা করিবে।

কামনা পূরণ করিতে যদি মুক্তির বাধক হয় তাহা হইলে ইষ্ট সেই কামনা পূরণ করিবেন না,

"কৃষ্ণ বলে আমায় ভজে, মাগে বিষয়সুখ।
অমৃত ছাড়িয়া বিষ মাগে এত বড়ো মূখ॥
আমি বিজ্ঞ সেই মুখে বিষয় কেন দেব।
স্ব চরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥"

৩২। যথাশ্রয়-ভাবাধিকরণ----

সূত্র---- অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ॥ ৩/৩/৬২

গোপালতাপনী-উপনিষদে সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের রূপের বর্ণনা আছে।

"নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে।
নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ॥"

জিজ্ঞাস্য এই---- শ্রীঅঙ্গের রূপের বর্ণনা শ্রুতি করিয়াছেন কেন? অঙ্গীর ধ্যান বা উপাসনা করিলেই যখন সর্বার্থসিদ্ধি তখন অঙ্গের ধ্যানের প্রয়োজনীয়তা আছে কি? তদুত্তরে এই সূত্রে বলিতেছেন---- যে-অঙ্গে যে-ভাব উপযোগী তাহার ভাবনা প্রযোজন। অঙ্গী ও অঙ্গে অভেদ মনের স্থিরতা উপাসনার প্রধান অঙ্গ। অঙ্গ-ভাবনায় মন স্থির হয়। যে-অঙ্গে যে-গুণ সেই অঙ্গে তাহাই চিন্তনীয়। মুখে হাস্য, চরণে নৃত্য, চক্ষে প্রসন্নদৃষ্টি, ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবনায় মনের স্থিরতা আসে। ভাগবত শাস্ত্র নানা স্থানে শ্রীগোবিন্দের রূপের বর্ণনা দিয়াছেন এবং উহাতে চিত্তের একাগ্রতা আসে একথা বলিয়াছেন।

সূত্র---- শিষ্টেশ্চ॥ ৩/৩/৬৩

গোপালতাপনী-শ্রুতিতে কথিত আছে---- ব্রহ্মা বলিতেছেন, আমি এই প্রকার স্তুতিদ্বারা উপাসনা করি। তোমরাও মন্ত্র-জপ ও ধ্যান দ্বারা সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবে। ব্রহ্মার অনুগতজনকে এইরূপ শিক্ষা দেওয়ায় ধ্যান করা যে বিধি, শিষ্টমনের শিক্ষা হইতেও পাওয়া গেল।

"অহং হৈবং স্তুতিভিরারাধয়ামি। তে যূয়ং তথা পঞ্চপদং জপন্তঃ ধ্যায়ন্তঃ সংসৃতিং তরিষ্যথ।"

সূত্র— সমাহারাৎ ।। ৩/৩/৬৪

সমাহার হেতু। ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে ১/৬/৬ উক্ত আছে "আপ্রণখাৎ সর্ব এব সুবর্ণঃ", নখ হইতে কেশ পর্যন্ত সমুদয় সুবর্ণ। চক্ষের কথা বিশেষভাবে উক্ত হইলেও সমুদয় অঙ্গের কথা বলাই শ্রুতির অভিপ্রায়।

ভাগবত বলিয়াছেন ৩/২৮/২০ মন্ত্রে—

"তস্মিন্ লব্ধপদং চিত্তং সর্বাবয়বসংস্থিতম্।
বিলক্ষ্যৈকত্র সংযুঞ্জ্যাদঙ্গে ভগবতো মুনিঃ ।।"

শ্রীভগবানের সর্বাবয়বে চিত্ত স্থান-প্রাপ্ত হইলে এক এক অঙ্গে চিত্ত অর্পণ করিয়া ধ্যান করিবে।

সূত্র— গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ।। ৩/৩/৬৫

শ্রুতিতে ও ভগবদ্গীতায় বলা হইয়াছে ব্রহ্মের অষ্ট পদ মুখ চক্ষু সর্বত্র বিদ্যমান। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হইয়াছে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের যোগ্যতা আছে, "অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি"। এখন প্রশ্ন এই যে, জনসাধারণ যখন যে ইষ্ট-মূর্তি ধ্যান করিবে, তখন তিনি সকল ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য অঙ্গেরও বৃত্তি বর্তমান আছে তাহা ভাবিবে? এই সূত্রে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। ইহা পূর্বপক্ষ। উত্তর দিয়াছেন—

সূত্র— ন বা তৎসহভাবাশ্রুতেঃ ।। ৩/৩/৬৬

এই সূত্রে বলিয়াছেন, না, তাহা হইবে না। আরাধ্য দেবতার মূর্তি চিন্তাকালে যে যে ইন্দ্রিয়ের যে যে স্থানে অবস্থান তাহাই ভাবিতে হইবে। এক অঙ্গের বৃত্তি বা গুণ অন্য অঙ্গে ভাবিবে না।

সূত্র— দর্শনাচ্চ ।। ৩/৩/৬৭

শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ যে ভাবে ভাগবৎ মূর্তির দর্শন যেভাবে ভাবিত হইতে হইবে বলিয়াছেন সেই ভাবেই ভাবিতে হইবে। নয়নে করুণার দৃষ্টি। মুখে মধুর হাসি। হস্ত অভযদানে প্রসারিত— এই রূপেই শ্রেষ্ঠ ভক্তগণের দর্শন। সকল সাধুগণেরই এই মত।

তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

ব্রহ্মসূত্র

তৃতীয় অধ্যায় : চতুর্থ পাদ

১। পুরুষার্থাধিকরণ—

সূত্র— পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ॥ ৩/৪/১

সূত্রের ভিত্তি—

১। 'তরতি শোকমাত্মবিৎ'। (ছান্দোগ্য, ৭/১/৩)

আত্মজ্ঞ শোক হইতে উত্তীর্ণ হন।

২। 'ব্রহ্মবিদ্যাপ্নোতি পরম্'। (তৈত্তিরীয়, ২/১/১)

ব্রহ্মবিৎ পরম পুরুষার্থ লাভ করেন।

৩। 'তমেবং বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি।' (শ্বেতাশ্বতর, ৩/৪)

তাঁহাকে জানিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।

এই সকল বাক্যে বুঝা যায় বিদ্যাদ্বারাই ভগবৎ প্রাপ্তি হয়। কিন্তু গীতা বলিয়াছেন,

"স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।"

(গীতা, ১৮/৪৫)

আপনাপন অধিকারবিহিত কর্মনিরত ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করে।

ইহা দ্বারা বুঝা যায়, শুধু কর্মদ্বারা আরাধ্য ইষ্ট লাভ হয়। আবার যোগবাশিষ্ঠ বলিয়াছেন,

"উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্মভ্যাং পরমং পদম্॥"

পক্ষীরা যেমন দুইটি পাখা দ্বারা ওড়ে তেমনি বিদ্যা ও কর্ম দুয়ের সমন্বয়ে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। আবার ঈশোপনিষদ্ বলিযাছেন,

"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।"

'অবিদ্যয়া কর্মণা' (শঙ্কর)। কর্মদ্বারা মর্ত্যভাব অতিক্রম করিয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃত লাভ হয়।

এই সকল বাক্যে বিরোধিতা দৃষ্ট হয়। পরম পদ পাইবার উপায় কি? উহা কি বিদ্যাই না, উহা কি কর্মই? অথবা দুই এর সমুচ্চয়? অথবা কর্ম অর্ধেক পদ আগাইয়া দিবেন, পরে বিদ্যাদ্বারা তাহা প্রাপ্তি হইবে? ইহা সংশয়। এই সংশয় সমাধান কল্পে তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ

পাদ আরম্ভ।

যাঁহারা বলেন, বিদ্যা দ্বারাই পরম পদ প্রাপ্তি হইবে, তাঁহারা মনে করেন, কর্মের কোনও অপেক্ষাই নাই। সকল শাস্ত্রেই কর্ম অধিষ্ঠানের বিধি আছে। যদি কর্ম অপেক্ষা না থাকে, তাহা হইলে বিধিগুলি নিরর্থক হইয়া যাইবে।

৩/৪/১ হইতে ব্যাখ্যা— 'পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ'—

বাদরায়ণ মত বলিতেছেন, বিদ্যা হইতে পরম পুরুষার্থ লাভ হইবে। কারণ বলিয়াছেন, "শব্দাৎ"। অর্থাৎ শ্রুতি প্রমাণ পর্যালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্ত স্থির হয় যে, একমাত্র বিদ্যা হইতেই পরম পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে।

সূত্র— শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথাঽন্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ।। ৩/৪/২

এই সূত্রে জৈমিনী বলেন যে, কর্ম দ্বারাই বিদ্যার উৎপত্তি হয়। অতএব বিদ্যা কোনও স্বতন্ত্রবস্তু নহে। উহা কর্মেরই শেষ অঙ্গ বা ফল। সুতরাং বিদ্যা হইতে যে ফল কথিত হয় উহা মূলতঃ কর্মেরই ফল। শুধু বিদ্যার মহিমা যেখানে কথিত আছে তাহা প্রশংসার্থক বাক্য মাত্র। অতএব কর্মই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়—ইহাই সৎ সিদ্ধান্ত। জীব উপাসক, ভগবান্ উপাস্য। এই উপাসক-উপাস্য সম্বন্ধে স্থিত হইযা শাস্ত্রোচিত আরাধনা কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ইহাতেই পাপ নাশ। ইহাতেই ভগবৎ প্রাপ্তি। ইহাই মীমাংসক জৈমিনী ঋষির মত। ভাগবতে বলিয়াছেন (১/২/১৩), "স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধি হরিতোষণম্।"

অনুষ্ঠিত কর্মের সিদ্ধি হরিতোষণ। বিদ্যার লক্ষ্যও হরিতোষণ। যদি কর্মের দ্বারা তাহা লাভ হয় তবেই বিদ্যা একমাত্র কারণ এই কথা কেন বলিতেছেন?

সূত্র— আচার-দর্শনাৎ।। ৩/৪/৩

গীতা বলিয়াছেন,

"কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতাঃ জনকাদয়ঃ।" (গীতা, ৩/২০)

জনক প্রভৃতি কর্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। পুরাকালে জ্ঞানী পুরুষগণ শাস্ত্রবিহিত কর্ম অনুষ্ঠান করিতেন। যদি বিদ্যাই পরমপদ লাভের কারণ হইত, তাহা হইলে জ্ঞানীদিগের কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি কেন হইবে? ভাগবত বলিয়াছেন,

"দান-ব্রত-তপো-হোম-জপ-স্বাধ্যায-সংযমৈঃ।

শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে।।" (১০/৪৭/২৪)

দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদাধ্যয়ন, সংযম এবং অন্যান্য শ্রেয়স্কর সাধন দ্বারা কৃষ্ণভক্তি সাধিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্তি কি তোমার মতে বিদ্যালাভ? ভাগবত বলিলেন যে, দান-ব্রতাদি কর্ম কৃষ্ণে ভক্তি প্রাপ্তির সাধন। অতএব বিদ্যা যে কর্মের ফল, তাহা প্রতিপাদিত হইল।

সূত্র— **তচ্ছ্রুতেঃ** ।। ৩/৪/৪

বিদ্যা যে কর্মের অঙ্গ ইহা উপনিষদেও বলা হইয়াছে,

"যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্যবত্তরং ভবতি"।

(ছান্দোগ্য, ১/১/১০) ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্নের শ্রদ্ধাপূর্বক যোগযুক্ত হইয়া যে কর্ম করা হয়, তাহাই বলবত্তর। অতএব বিদ্যার কর্মশেষত্ব শ্রুত হইয়াছে এই পর্যন্ত আচার্য জৈমিনীর পূর্বপক্ষ। তৎপর আরেকজন পূর্বপক্ষীর কথা বলা হইতেছে।

সূত্র— **সমন্বারম্ভণাৎ** ।। ৩/৪/৫

পরম পদ লাভের বিদ্যা ও কর্ম দ্বিবিধভাবে কারণ। কেবল বিদ্যাকে মুক্তির কারণ বলা যায় না। যেমন দুই পাখা ছাড়া পাখী উড়িতে পারে না, দুই পা ছাড়া মানুষ হাঁটিতে পারে না, সেইরূপ বিদ্যা ও কর্ম দুইয়ের সমন্বয় ছাড়া সাধনপ্রাপ্তি হয় না।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও পাওয়া যায়—

"তং বিদ্যাকর্মণী সমন্বারভেতে পূর্বপ্রজ্ঞা চ"। (বৃহদারণ্যক, ৪/৪/২)

সূত্র— **তদ্‌বতো বিধানাৎ** ।। ৩/৪/৬

"ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্মা দর্শপৌর্ণমাসয়োস্তং বৃণীত"। (তৈত্তিরীয়-সংহিতা)

শব্দব্রহ্ম জ্ঞান-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞে ব্রহ্মারূপে বরণ করিবে।

ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইল যে, বিদ্যাবান্ ব্যক্তিরই কর্মে অধিকার। সুতরাং বিদ্যা কর্মের অঙ্গ। ইহাও পূর্বপক্ষ।

সূত্র— **নিয়মাচ্চ** ।। ৩/৪/৭

ঈশোপনিষদে দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে, শতবর্ষ জীবিত থাকিয়া কর্মাচরণ করিবে। ইহাতে বুঝা যায় যে, বিদ্যা দ্বারা পরমপদ লাভ হয় না। যাহা কিছু ফললাভ কর্ম হইতেই হইবে। অতএব বিদ্যা কর্মের

অঙ্গ মাত্র— ইহাই সিদ্ধান্ত। কৃষ্ণ যজুর্বেদ ১/২ মন্ত্রে কর্ম ত্যাগের নিন্দা করিয়াছে। কর্ম না করিলে অনেক সময় স্বয়ং ঈশ্বরও কোনও ফল দান করিতে পারেন না। এই পর্যন্ত পূর্বপক্ষ। এই অধ্যাযের চতুর্থ পাদে প্রথম মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, পুরুষার্থ লাভ একমাত্র বিদ্যাদ্বারাই হয়। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৩/৪/২ হইতে ৩/৪/৭ এই ছয়টি সূত্র পূর্বপক্ষরূপে বিদ্যার প্রাধান্য খণ্ডন করিয়াছেন। কর্মই প্রধান। বিদ্যা কর্মের অঙ্গ মাত্র। উক্ত পূর্বপক্ষের, ৩/৪/৮ হইতে ৩/৪/১৪ পর্যন্ত এই সাত সূত্রে উত্তব দিতেছেন। এই সাতটি মন্ত্রে পূর্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া প্রথম সূত্রের সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন।

সূত্র— **অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ**।। ৩/৪/৮

সূত্র— **তুল্যন্তু দর্শনম্**।। ৩/৪/৯

সূত্র— **অসার্বত্রিকী**।। ৩/৪/১০

সূত্র— **বিভাগঃ শতবৎ**।। ৩/৪/১১

সূত্র— **অধ্যয়নমাত্রবতঃ**।। ৩/৪/১২

সূত্র— **নাবিশেষাৎ**।। ৩/৪/১৩

সূত্র— **স্তুতয়েঽনুমতির্বা**। ৩/৪/১৪

পূর্বপক্ষের কথাগুলি প্রধানতঃ পূর্বমীমাংসাকার জৈমিনীর। সিদ্ধান্ত-পক্ষ বেদান্তের সূত্রকার বাদরাযণীয মত। কর্মফল নশ্বর। ব্রহ্মবস্তু শাশ্বত। নশ্বর কর্ম দ্বারা উপশম লাভ না করিতে। কখনোই শাশ্বত বস্তু লাভ হইতে পারিলে ব্রহ্মবিদ্যা স্ফুরিত হয় না। ব্রাহ্মণগণ বেদ পাঠ, যজ্ঞ ও দানাদি কর্মের দ্বারা বিদ্যালাভ করে এবং বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের চেষ্টা করে। বৃহদারণ্যক-শ্রুতি ৪/২২ মন্ত্রে ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। অতএব বিদ্যা যে কর্ম হইতে অধিক ইহা বুঝা গেল। যে বিদ্যাদ্বারা ব্রহ্ম লাভ হয় তাহা কর্মলব্ধ নহে। কর্মের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। কর্মমাত্রই নশ্বর জগতের অন্তর্গত। সুতরাং দ্বৈতাপেক্ষক। অদ্বৈত তত্ত্বে কর্মসম্পর্ক থাকিবে কি প্রকারে? ভাগবত বলিয়াছেন (১১/৫/১৬-১৭) যে, যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই অথচ পশুর মতন অজ্ঞও নয়, তাহারাই ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গে ব্যস্ত থাকে এবং জন্ম-মরণ পরম্পরারূপ সংস্কারে যাতায়াত করেন। তাহারা কর্মকেই জ্ঞান মনে করিয়া অবসন্ন হন। ভাগবত একাদশ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন, পিতারা যেমন সন্দেশ, মিছরি প্রভৃতি প্রলোভন দেখাইয়া রুগ্ন সন্তানকে ঔষধ সেবন করান, সেইরূপ বেদ

অজ্ঞ লোকদিগকে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির জন্যে কর্মেব উপদেশ দেন। নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধির অর্থ কর্মফলের আকাঙ্ক্ষাশূন্যতা। সুতরাং কর্মফলের উল্লেখ করিয়া যে সব কথা বলিযাছ, ভাগবতের কাছে তাহা হেয়। ভাগবত তাহা পরিত্যাগ করার উপদেশ দিয়াছেন। বেদান্তের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন যে, আমরা কর্মের প্রয়োজনীতা অস্বীকার করি না। উহার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু গৌরব উহার প্রাপ্য। কর্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় সত্য ; এই জন্যই ভাগবত কর্ম অনুষ্ঠান প্রয়োজন বলিয়াছেন। কর্তৃত্ববুদ্ধি না গেলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। যতক্ষণ সাধকের কর্তৃত্ববুদ্ধি প্রবল ততক্ষণ কর্মের প্রয়োজন আছে। কিন্তু কর্ম দ্বারা ব্রহ্ম লাভ হয় না। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"যং ন যোগেন সাঙ্খ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি।।" ১১/১২/৯

সাংখ্য, যোগ, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, গুণকীর্তন, বেদাধ্যয়ন ও সন্ন্যাস দ্বারা অতি যত্নবান ব্যক্তিও আমাকে প্রাপ্ত হন না। ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় একমাত্র উর্জিতা (দৃঢ় নিষ্ঠাময়) ভক্তি দ্বারা। একনিষ্ঠময় ভক্তিকে একভক্তি বলা হয়। একভক্তি ও জ্ঞান বা বিদ্যা অভিন্ন। ইহা গীতার উক্তি। সে ভক্তি কিরূপে লাভ হয়, একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবকে বলিয়াছেন। শ্রুতির বিধান স্মৃতির বিধান সকল পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে আমার শরণাগত হইলে ভক্তিলাভ হয়। সুতরাং কর্ম একান্ত করণীয় নহে। চিত্ত-মালিন্য ক্ষালনেব উহা এক উপায় মাত্র। যে ভক্ত ভগবানে একান্ত শরণাগত, তাহার ঐ উপায় প্রয়োজন হয় না। কৃপাশক্তি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া যায়।

পূর্বপক্ষ গীতার প্রমাণ দিয়া বলিযাছেন, জনকাদি ঋষিগণ কর্মের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তদুত্তরে বলিতেছি, জনকাদি ঋষিগণ তত্ত্ববিদ্ ছিলেন। তাঁহারা লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম করিয়াছেন। লোকসংগ্রহ অর্থ সাধারণ মানবগণকে স্বধর্মে প্রবৃত্ত রাখা। ঐ জন্য তাঁহারা বিদ্যালাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের কর্ম বিদ্যালাভের জন্য নহে। তাঁহারা বিদ্যালাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের কর্ম, বন্ধনের হেতু হয় না। গীতাতে বলিয়াছেন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা করেন— সাধারণ ব্যক্তি তাহা অনুকরণ করে। ইহা সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য। ব্রহ্মপদ লাভের জন্য নহে। ৩/৪/৬ সূত্রে পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মিষ্ঠ ব্যক্তিকে যজ্ঞে ব্রাহ্মণরূপে বরণ করিবে। সুতরাং বিদ্যা কর্মের অঙ্গ।

ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মিষ্ঠ এক কথা নয়। ব্রহ্মিষ্ঠ অর্থ শব্দব্রহ্ম জ্ঞানবিশিষ্ট। প্রাচীনকালে এখনকার মতন মুদ্রণালয় ছিল না। বেদপাঠ উচ্চারণ গুরুমুখ হইতে শুনিতে হইত। বেদপাঠে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই স্বর প্রয়োজন হয়। আচার্য পদবাচ্য গুরুদের যথাযথ উচ্চারণ সহিত বেদ কণ্ঠোৎসারিত হইত। ছাত্র স্থানীয় শিষ্যগণ গুরুমুখে শুনিয়া শিক্ষালাভ করিত। তাঁহাদের ব্রহ্মিষ্ঠ বেদবিৎ বা ব্রহ্মজ্ঞ বলা হইত। বৈদিক যজ্ঞাদি কর্মে তাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল। তাঁহাদের বেদের উচ্চারণ শুদ্ধ না হইলে ফল লাভ হইত না। শাস্ত্রবিদ্ ও তত্ত্ববিদ্ এক কথা নয়। তাঁহারা শাস্ত্রবিদ্ ছিলেন কিন্তু তত্ত্ববিদ ছিলেন না। আত্মবিদ্ না হইলে তত্ত্ববিদ্ হয় না।

দেবর্ষি নারদ সনৎকুমারের কাছে জ্ঞানলাভের জন্য গিয়াছিলেন। সনৎকুমার বলিলেন, তোমার কি জ্ঞান আছে বল? তাহার পরে আমি বলিব।

নারদ বলিলেন, চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, উপনিষদ্, পুরাণাদি, তন্ত্রাদি, ইত্যাদি সকলই পাঠ করিয়াছি।

সনৎকুমার বলিলেন, তুমি তো সবই জান, তাহা হইলে আমার কাছে আসিয়াছ কেন?

নারদ বলিলেন, শাস্ত্রবিদ্ হইয়াছি, তত্ত্ববিদ্ হই নাই। এই জন্যেই আসিয়াছি।

সনৎকুমার তখন নারদকে আত্মতত্ত্ব বলিয়া দিলেন। সুতরাং ব্রহ্মিষ্ঠ ব্যক্তিকে যজ্ঞাদি কর্মে বরণ করিলে জ্ঞান কর্মের অঙ্গ বোঝা যায় না। আবার বলি, ব্রহ্মিষ্ঠ অর্থ বেদার্থ পাঠের যোগ্যতাবিশিষ্ট। পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞ বুঝা যায় না। তত্ত্ববিদ্ হইলে তাহার কোনও কর্ম থাকে না। আচার্য-উপদেশ বা শাস্ত্র-পাঠে যেইরূপ মধুর-আস্বাদন মিষ্টি ইহা বুঝা যায় না, আস্বাদন করিতে হয়। তদ্রূপ শাস্ত্র পড়িয়া বা গুরুর উপদেশ শুনিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি হয় না। পরাবিদ্যা দ্বারা যাঁহার ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতি হয়—তিনি প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যাবিদ্। কোনও কর্মকাণ্ডে তাঁহার প্রবৃত্তি থাকে না।

পূর্বে বলা হইয়াছে, শ্রবণ, কীর্তন, মনন, স্মরণ, অর্চন, প্রভৃতি কর্ম করণীয়। ইহাদেরকে আরাধনা অঙ্গ বলা হইয়াছে। তবে তো কর্ম করণীয়ই হইল। উত্তরে বলিতেছি—কাম্যকর্ম অনুষ্ঠান আপত্তিজনক। উহা দ্বারা জন্মমৃত্যু প্রবাহ অক্ষুন্ন থাকে। উহা বন্ধনের

কারণ হয়— ভগবানে অর্পিত কর্মে বন্ধনত্ব থাকে না। উহা পরম প্রাপ্তির উপায় বলা হইয়াছে। কর্ম ভগবানে অর্পিত হইলে উহা নিষ্কাম কর্মে পরিণত হয়। ভাগবত বলিয়াছেন, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি যদি হরিভক্তিঃ-বর্জিত হয় তাহা হইলে তাহার কোনও শোভা থাকে না। "নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।" (ভাগবত, ১/৫/১২)

সর্বোপরি নিবর্তক নির্মল ব্রহ্মজ্ঞানও হরিভক্তি বর্জিত হইলে শোভা পায় না, অর্থাৎ পরমতত্ত্বের অপরোক্ষ অনুভূতির নিমিত্ত কল্পিত হয় না। (ভাগবত, ১/৫/১২)

ঈশোপনিষদের দ্বিতীয় মন্ত্র উল্লেখ দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, বিদ্যা কর্মের অঙ্গ, কারণ, উপনিষদ্ যাবজ্জীবন কর্ম করিতে বলিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা ভুল। যাবজ্জীবন কর্ম করার উপদেশ আসলে বিদ্যারই স্তুতি। উপনিষদের প্রথম মন্ত্রে বলিয়াছেন 'ঈশাবাস্যং ইদং সর্বং' সমস্ত জগৎই ঈশ্বর কর্তৃক ব্যাপ্ত। তারপর বলিয়াছেন, যদি সর্ব জীবন কর্ম কর তাহা হইলেও কর্মে লিপ্ত হইবে না। ইহাতে তো বিদ্যারই স্তুতি করা হইল। কেননা, তুমি যদি সর্ব জগৎ ঈশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত এই জ্ঞান লইয়া যাবজ্জীবন কর্ম কর, তাহা হইলেই কর্মে তোমার বন্ধন হইবে না। মূল কথাটি হইল, ঈশ্বর সর্বজগৎ ব্যাপ্ত— এই জ্ঞানটা যাহার আছে তাহার কর্মে বন্ধন হয় না। তাহা হইলে বিদ্যারই পূর্ণ সামর্থ্য ইহা বলা হইল। সকলই ব্রহ্মময়। এই জ্ঞান যাহার সম্বল আছে সে, যে কর্ম করুক না করুক তাহাতে কিছু আসে যায় না। কর্ম বা কর্মফলের শক্তি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। উহার কর্ম কাম্যকর্মের মধ্যে পড়িবে না— কোনও রূপ বন্ধন হইবে না। ইহা দ্বারা বিদ্যার মহিমাই কীর্তিত হইল।

ভাগবত বলিয়াছেন, তাবৎকাল কর্ম করিবে যাবৎকাল সর্বভূতে ঈশ্বর ভাবনা না আসিবে। যখন আমার কথা শ্রবণ করিতে আসক্তি জন্মিবে তখন আর কর্মে প্রয়োজন হইবে না।

২। কামকারাধিকরণ—

সূত্র— কামকারেণ চৈকে।। ৩/৪/১৫

বিদ্বান্ ব্যক্তি যদি যথেচ্ছাচারী হইয়া শাস্ত্রবিহিত কর্ম ত্যাগ করে তাহা হইলে প্রত্যবায় হইবে কি না ? এই সূত্রে উত্তর দিয়াছেন, বিদ্বান্

ব্যক্তির কর্ম করা শাস্ত্রবিহিত নহে। তবে সে ইচ্ছা করিয়া লোক-কল্যাণের জন্য কর্ম করিতে পারে—তাহাতে নিষেধ নাই। যাহার ফলাকাঙ্ক্ষা নাই, কর্ম দ্বারা তাহার কোনও মহিমা বৃদ্ধি হয় না। না করিলেও মহিমা হ্রাস হয় না।

ভাগবতে ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন, অগ্নিতে যেমন তুলা ভস্ম হইয়া যায়, আমার প্রতি ভক্তিতে ঐরূপ পাপরাশি ধ্বংস হইয়া যায়। অতএব সিদ্ধান্ত হইল, ভগবৎতত্ত্বজ্ঞানী ভক্ত কোনও কর্ম আচরণ করুক বা না করুক তাহাতে কোনও লাভ-ক্ষতি হয় না।

সূত্র— **উপমর্দঞ্চ** ।। ৩/৪/১৬

বিদ্যা কর্মের অঙ্গ তো নয়ই—উহা কর্মের উপমর্দক বা উচ্ছেদক। জ্ঞানে শক্তি আছে—সকল কর্মকে ধ্বংস করিতে পারে—এইজন্যে প্রশ্ন জাগে—প্রারব্ধ কর্ম কি থাকে না? প্রারব্ধ কর্ম কি ঐ সমুদয়ের মধ্যে পড়ে না? তাহার উত্তর এই যে, প্রারব্ধ ধ্বংস হয় কিন্তু দগ্ধ বস্ত্রের ন্যায় থাকে। উহা সুখ-দুঃখের কারণ হয় না।

সূত্র— **ঊর্ধ্বরেতঃসু চ শব্দে হি**।। ৩/৪/১৭

গীতা বলিয়াছেন, জ্ঞানাগ্নি সর্ব কর্মকে ধ্বংস করে। আবার জ্ঞানী ব্যক্তিকে অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিতে বলিয়াছেন। ইহাতে কি বিরোধিতা হয় না? না, হয় না। কর্ম করিবার উপদেশ শুধু ঊর্ধ্বরেতা ব্রহ্মচারীদের জন্য। তাঁহাদের অনুকরণ করা সংসারী ব্যক্তিদের কর্তব্য নহে।

সূত্র— **পরামর্শং জৈমিনিরচোদনাচ্চাপবদতি হি**।। ৩/৪/১৮ (রামানুজ)

সূত্র— **পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চাপবদতি হি**।। ৩/৪/১৮ (শঙ্কর, মধ্ব, বল্লভ, বলদেব)

জৈমিনি বলেন, তোমাদের সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। কারণ কর্ম পরিত্যাগ করার কথা শ্রুতিতে কোথাও নাই। বরং কর্মত্যাগীর নিন্দা আছে। উত্তরে সূত্রকার বাদরায়ণ বলেন যে, আমরা কাহাকেও কর্ম ত্যাগ করিতে বলি নাই। আমরা বলিয়াছি ব্রহ্মবিদ্ যিনি, তিনি ইচ্ছানুসারে কর্ম করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন। এই কথাই পরবর্তী সূত্রে বলিয়াছেন।

সূত্র— **অনুষ্ঠেয়ং বাদয়রায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ** ।। ৩/৪/১৯

আত্মতত্ত্ববিদের কর্তৃত্বাভিমান থাকে না। কর্তৃত্ব-অভিমান না থাকায় কোনও কর্মও থাকে না ইহা যুক্তিদ্বারা বুঝা যায়। তাহা ছাড়া গীতাতে

স্পষ্টোক্তি আছে

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।

আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে।।" (গীতা, ৩/১৭)

জৈমিনি বলিয়াছেন, শ্রুতিতে কোনও কর্মের নিষেধ নাই। তাহা ঠিক নহে। যাহার কোনও কর্ম নাই আর কর্মে নিষেধ নাই—ইহাতে পার্থক্য কতটুকু? আত্মজ্ঞ ব্যক্তি সকল কর্মই ভগবদ্ ইচ্ছায় করেন। তিনি কোনও গর্হিত কর্ম করিলেও তাহা ভগবদ্ ইচ্ছায়। ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে, তত্ত্বজ্ঞ সনৎকুমার ভগবানের পারিষদ জয়-বিজয়কে অভিশাপ দিয়াছিলেন। ইহাও ভগবানের ইচ্ছাতেই হইয়াছিল।

"যো বঃ শাপো ময়ৈব নিমিতস্তদবেত বিপ্রাঃ।।"

(ভাগবত, ৩/১৬/২৬)

হে ব্রাহ্মণগণ! তোমাদের প্রদত্ত ঐ শাপ আমার দ্বারাই নির্মিত জানিবে।

সুতরাং জৈমিনির কথা সমীচীন নহে।

সূত্র— বিধির্বা ধারণবৎ।। ৩/৪/২০

অদ্বৈতজ্ঞানী-ভক্তের দ্বৈত বর্তমান না থাকায় কোনও বিধি-নিষেধ তাহাকে স্পর্শ করে না। যাঁহাদের হৃদয়ে প্রকৃত ভগবদ্‌ভক্তি উদিত হইয়াছে, তাঁহাদের কর্মের বাসনাই থাকে না। তাঁহাদের কর্মাশয়ই ধ্বংস হইয়া যায়।

সূত্র— স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেৎ, নাপূর্বত্বাৎ।। ৩/৪/২১

পূর্বপক্ষ আবার আপত্তি তুলিয়াছেন—বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ৩/৫/১ মন্ত্র—স্তুতিবাদ বা অর্থবাদ মাত্র। উহা বিধি নহে। —উপরোক্ত সূত্রে 'স্তুতিমাত্রং' ইত্যাদি অংশে আপত্তি তুলিয়াছেন। পরবর্তী উত্তর দিয়াছেন। উত্তরে বলিয়াছেন—না, উহা স্তুতিমাত্র নহে—অপূর্ববিধি। বিধি তিন প্রকার— অপূর্ববিধি, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি। ইহার মধ্যে অপূর্ববিধি বলবান, অবশ্য-করণীয়। 'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত'— ইহা অপূর্ববিধি। 'ঋতৌ ভার্যামুপয়াৎ' ইহা নিয়ম বিধি। প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধি।

'পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা' অর্থাৎ পঞ্চনখবিশিষ্ট পঞ্চপ্রাণী ভক্ষণ যোগ্য। অন্য প্রাণী নহে। ইহা সকলের করণীয় নহে। যথেচ্ছ জীবহিংসা হইতে নিবৃত্ত করার জন্য এই উপদেশ। কর্মের অনুষ্ঠানেই সাধারণ লোকের

প্রবৃত্তি, অনুষ্ঠানে অপ্রবৃত্তি স্বাভাবিক নহে। তাই বিধি বিধান করিতেছেন। সুতরাং ইহা অপূর্ববিধি। প্রশংসাবাদ নহে। তাহাই সূত্রে বলিয়াছেন—'অপূর্বত্বাৎ'।

সূত্র— ভাবশব্দাচ্চ।। ৩/৪/২২

ভাব-রতি-স্নেহ-প্রণয়-প্রেম ইত্যাদি এক পর্যায়ভুক্ত। জ্ঞানী ভক্তগণ ভাব-ভক্তিতে বিভোর থাকেন। তাহা কোন কর্মপরতন্ত্র হইতে পাবে না। ভাগবত বলিয়াছেন, সুবর্ণ অগ্নিতে দগ্ধ হইলে মলশূন্য হয় এবং স্বকীয় উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ ভক্তিযোগ দ্বারা আত্মার কর্মবাসনা দূর হয়। তিনি কেবল ভজনই করেন। সুতরাং ভগবদ্ভাবাবিষ্ট জ্ঞানীভক্তের কর্ম থাকিতে পারে না।

৩। পারিপ্লবাধিকরণ—

সূত্র— পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন, বিশেষিতত্বাৎ।। ৩/৪/২৩

কর্মকাণ্ডের মধ্যবর্তী উপাখ্যানগুলিকে পরিপ্লব বলে। যদি পূর্বপক্ষ বলেন যে, উপনিষদের ঐ সকল কথা উপাখ্যান-তুল্য তাহার উত্তরে বলিতেছেন—না, উপাখ্যানের প্রয়োজন কর্মকাণ্ডেই বিশেষভাবে বলা হইয়াছে, শ্রুতিতে উহা নাই। সুতরাং শ্রুতির উপাখ্যানসকল উপাখ্যান মাত্র নহে, উহা তত্ত্বগর্ভ। উপনিষদের উপাখ্যানসকল ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশক। কর্মকাণ্ডে বলা আছে, অশ্বমেধাদি বহুকালব্যাপী যজ্ঞের অবসরকালে সময় ক্ষেপের জন্য উপাখ্যান করণীয়। উপনিষদে এইরূপ বিধান নাই।

সূত্র— তথা চৈকবাক্যোপবন্ধাৎ।। ৩/৪/২৪

উপনিষদের উপাখ্যান সমূহের ব্রহ্মবিদ্যার তত্ত্বের সঙ্গে একবাক্যতা আছে। অতএব ঐসব কর্মকাণ্ডের উপপ্লব নহে। ব্রহ্মবিদ্যার সৌকর্য বিধানে উপাখ্যানের উপযোগিতা। উপনিষদের আখ্যায়িকা সকল ব্রহ্মবিদ্যা উৎপাদক। সময় ক্ষেপের জন্য গল্প নহে।

৪। কামকারাধিকরণ–

সূত্র— অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা।। ৩/৪/২৫

আত্মতত্ত্বজ্ঞ ভক্তের যজ্ঞের অগ্নি, ইন্ধন (সমিধ্), হবিঃ ইত্যাদির প্রয়োজন নাই। বিদ্যা কদাপি কর্মাঙ্গ নহে। বিদ্যা ও কর্মের বাদবিচার শেষ হইল।

৫। সর্বাপেক্ষাধিকরণ—

সূত্র— **সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ।।** ৩/৪/২৬

যজ্ঞাদির প্রয়োজন শ্রুতিতে আছে। নিশ্চয়ই তাহার প্রয়োজনও আছে বিদ্যালাভের জন্য। বিদ্যালাভ হইলে যজ্ঞাদির আর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। কোনখানে যাইতে অশ্বের প্রয়োজন হইতে পারে কিন্তু যথা স্থানে পৌঁছিলে আর অশ্বের প্রযোজন থাকে না। সেইরূপ যজ্ঞাদির প্রয়োজন বিদ্যালাভার্থ। বিদ্যালাভান্তে যজ্ঞাদি অপ্রয়োজন।

সূত্র— **শমদমাদ্যুপেতস্ত স্যাৎ তথাপি তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামপ্যবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ।।** ৩/৪/২৭

যদি যজ্ঞাদি কর্ম দ্বারা বিদ্যার উৎপত্তি হয় তাহা হইলে শমদমাদির প্রয়োজন কি? উত্তর— যজ্ঞাদি বহিরঙ্গ সাধন। শমদমাদি অন্তরঙ্গ সাধন। উহারা বিধিসম্মত বলিয়া দুইই অনুষ্ঠেয়। উভয়ই বিদ্যার অঙ্গ।

৬। সর্বান্নানুমত্যধিকরণ—

সূত্র— **সর্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ।।** ৩/৪/২৮

সকল সময় সকলের অন্ন গ্রহণ কর্তব্য নহে। আপৎকালে—প্রাণ যায় যায়—এই অবস্থায় সকলের অন্নগ্রহণ শ্রুতিতে অনুমোদিত। ইহা বিধি নহে। অনুমোদন মাত্র।

সূত্র— **অবাধাচ্চ।।** ৩/৪/২৯

ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলিয়াছেন ৭/২৬/২

"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ"— আহার শুদ্ধিতেই চিত্তশুদ্ধি। চিত্ত শুদ্ধ হইলে উপাসনার সহায়ক ধ্রুবাস্মৃতি জাগ্রত হয়। এই শ্রুতিবাক্যের সহিত পূর্বসূত্রের সিদ্ধান্তের বিরোধ হইবে না কারণ, একমাত্র প্রাণ যায় যায় এমতাবস্থায় সর্বান্ন গ্রহণের অনুমতি। অন্য সময়ে নহে।

সূত্র— **অপি চ স্মর্যতে।।** ৩/৪/৩০

মনুসংহিতায় উক্ত আছে— ১০/১০৪

"জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ।
আকাশমিব পঙ্কেন ন স পাপেন লিপ্যতে।।"

মনুস্মৃতি তাহাই বলিলেন— প্রাণাত্যয়রূপ আপৎকালেই সর্বান্নগ্রহণ অনুমোদিত। ইহা অনুমতি মাত্র, বিধান নহে।

সূত্র— শব্দশ্চাতোঽকামকারে।। ৩/৪/৩১

আপৎকালের বিধি থাকিলেও— সকলের পক্ষে অকামকারের অর্থাৎ যথেচ্ছ অন্নভক্ষণের নিষেধও আছে। দুষ্ট লোকের ঘরে ভিক্ষা গ্রহণও নিষিদ্ধ।

৬। বিহিতত্বাধিকরণ—

সূত্র— বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্মাপি।। ৩/৪/৩২

যে ব্যক্তির বিদ্যা লাভ হইয়াছে তাহার বর্ণাশ্রমবিহিত কর্মাচরণ করা কর্তব্য।

সূত্র— সহকারিত্বেন চ।। ৩/৪/৩৩

বিদ্যার সহিত কর্মের বিরোধিতা নাই। বিদ্যোৎপত্তি হইলেও ক্রিয়মাণ কর্মের সঙ্গে তাহার বিরোধিতা থাকে না। বিদ্যা সমুদয় কর্মকে রক্ষা করে। বিদ্বান্ ব্যক্তি কোনও কামনা- পরিচালিত হইয়া কার্য করেন না। তাঁহার দ্বারা যে-কোন কার্য করিলে তাহা কর্ম-পর্যায়ে পরিগণিত হয় না।

৭। সর্বথাধিকরণ—

সূত্র—সর্বথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ।। ৩/৪/৩৪

ভগবৎ ধর্মানুষ্ঠানই মুখ্য কার্য। শ্রবণ-কীর্তনাদির অনুরোধে যদি আশ্রমধর্ম প্রতিপালিত নাও হয়, তাহাতে প্রত্যবায় হয় না। সকল কর্মানুষ্ঠানের আসল উদ্দেশ্য ভক্তিলাভ। ভক্তিলাভ হইলে কর্মানুষ্ঠান কর্তব্য নহে। কেবল লোক-কল্যাণের জন্য করা যায়।

সূত্র— অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি।। ৩/৪/৩৫

বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে পাই "নৈনং পাপ্মা তরতি, সর্বং পাপ্মানং তরতি। নৈনং পাপ্মা তপতি, বিপাপো বিরজোঽবিচিৎকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি।" অর্থাৎ পরিনিষ্ঠিত বিদ্বান্ ভগবদ্ভক্ত যদি ভগবদ্‌বিষয়ক শ্রবণ-কীর্তনাদির অনুরোধে আশ্রমধর্ম প্রতিফলিত না করিতে পারেন তথাপি তিনি পাপভাগী হইবেন না। বস্তুত আশ্রমধর্মাদি কর্মানুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্যই ভগবচ্চরণে ভক্তি জাগানো।

৮। বিধুরাধিকরণ—

সূত্র— অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ।। ৩/৪/৩৬

কোনও আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত না হইয়াও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী হওয়া যায়। শ্রুতিতে বাচক্নবী ও ব্রহ্মবিদ্যায় গার্গী তাহার উদাহরণস্থল। সুতরাং আশ্রমোক্ত ধর্মানুষ্ঠান করিলেও বিদ্যোৎপত্তি হইতে পাবে। এমন হইতে পারে যে, বিদ্যোৎপত্তির পূর্বে যাহা যাহা প্রয়োজন তাহা কাহারও হয়তো-বা পূর্বজন্মে হইয়া গিয়াছে। তাহাদের কোন বিশেষ কারণ মাত্র বৈরাগ্য ও বিদ্যালাভ হইয়া থাকে।

সূত্র— অপি চ স্মর্যতে॥ ৩/৪/৩৭

শ্রুতিতে যেমন আছে স্মৃতিশাস্ত্রেও দেখা যায়—সৎসঙ্গ বশত সর্ব পাপ বিধৌত হইয়া সাধক বিদ্যা লাভ করিয়াছেন।

সুতরাং নিরপেক্ষ সাধকও ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হইতে পারে

সূত্র— বিশেষানুগ্রহশ্চ॥ ৩/৪/৩৮

৯। ইতরাধিকরণ—

সূত্র— অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ॥ ৩/৪/৩৯

কোন আশ্রমভুক্ত না হইয়াও কোন সাধক যদি একান্তভাবে শ্রীহরির চরণাশ্রিত হয়েন—তাহা হইলে তাঁহার উপর শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভাগবতে শ্রীভগবানের নিজ মুখোক্তি।

"ময়িনির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥"

এই সূত্রে স্পষ্ট হইল যে, ভক্তিমান নিরাশ্রমী, আশ্রমী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সূত্র— তদ্‌ভূতস্য তু নাতদ্‌ভাবোঃ জৈমিনেরপি নিয়মা
তদ্রূপাভাবেভ্যঃ॥ ৩/৪/৪০

যাঁহারা সকল বিষয়ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরিপদাশ্রয় করেন তাঁহারা সহসা বিচ্যুত হযেন না। শ্রীহরিই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অবস্থা দর্শন করিয়া জৈমিনিও স্বীকার করেন যে, পূর্বজন্মের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম দ্বারা তাঁহারা ইহজীবনে আশ্রম-নিরপেক্ষ হইয়াও পরামুক্তি লাভ করেন। ইহা দ্বারা নিরপেক্ষ সাধনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইল।

সূত্র— ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ॥ ৩/৪/৪১

বিদ্যা দ্বারা একান্তভাবে ভগবদ্রতি (শ্রীভগবানে একান্ত রতি) যাঁহাদের হয়— তাঁহাদের আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। গীতা

বলিয়াছেন— "আব্রহ্মভুবনাল্লোঁকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।" (৮/১৬) একমাত্র শ্রীহরির চরণাশ্রয়ীর পতন ঘটে না। এইজন্য শ্রীহরির পরমপদ ভিন্ন সমুদয় লোক হইতেই পতনাশঙ্কা বিদ্যমান। নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ ভক্তগণের পতনের আশঙ্কা নাই। নিরপেক্ষ ঐকান্তিক সাধকগণ সংসারে কোন কিছুই কামনা করেন না। এইজন্য তাঁহাদের পতনের কোন সম্ভাবনাই নাই। এইরূপ অন্যাভিলাষশূন্য ভগবদ্ভক্তের স্বরূপ ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন (ভাগবত,১০/১৬/৩৭)—

"ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্বভৌমং ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা বাঞ্ছন্তি যৎ পাদরজঃপ্রপন্নাঃ।।"

আমার ঐকান্তিক ভক্তগণ— ব্রহ্মার পদ, ইন্দ্রের পদ, সার্বভৌম সম্রাটপদ, রসাতলের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি, এমনকি নির্বাণমোক্ষ (যাহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না) কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না। আমাকে ছাড়া তাহারা আর কিছুই চাহে না। এইরূপ ভক্তের পতনের আর সম্ভাবনা কোথায় ?

সূত্র— উপপূর্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবৎ, তদুক্তম্।। ৩/৪/৪২

একনিষ্ঠ ভক্তগণের কৃষ্ণ উপাসনাই একমাত্র কাম্য। ক্ষুধার্ত যেমন খাদ্য ব্যতীত আব কিছুই চাহে না— তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ ভক্তিধন ব্যতীত আর কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না। তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিয়াছেন— "সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" (২/১) — যিনি বিপশ্চিৎ তিনি একমাত্র পরব্রহ্মের সহিতই সকল বিষয় উপভোগ করেন।

সূত্র— বহিস্তূভয়থহেপি স্মৃতেরাচারাচ্চ।। ৩/৪/৪৩

শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্তগণের সহিত শ্রীহরির সংশ্লেষ অন্তরে বাহিরে বর্তমান। তাঁহাদের ভৌতিক দেহ প্রপঞ্চে থাকিলেও তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে প্রপঞ্চের ঊর্ধ্বে বিরাজিত। ভাগবত বলিয়াছেন, স্বয়ং হরি তাঁহাদের হৃদয় পরিত্যাগ কবিতে পারেন না কারণ, তিনি প্রেমরজ্জুদ্বারা বদ্ধপদ (প্রণয়রসাণায়াধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ)— তিনি ভক্তপ্রাণ।

১০। স্বাম্যধিকরণ

সূত্র— স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ।। ৩/৪/৪৪

সংশয় জাগে, যিনি সর্বদা ভগবদ্ভাবেই বিভোর তাঁহার দেহ আছে। দেহের অভাব কি করিয়া পরিপূরণ হয় ? উত্তরে বলিতেছেন,

'স্বামিনঃ'—জগৎস্বামী শ্রীহরি হইতে। শ্রীভগবান্‌ই ভক্তদের সকল অভাব পূরণ করিয়া থাকেন।

"যে ত্যক্তলোকধর্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্যহম্।"

(ভাগ:. ১০/৪৬/৪)

'শ্রীহরি আশ্রিতানাং সর্বার্থদঃ' (ভাগ:. ১১/২৯/৫)

সূত্র— আর্ত্বিজ্যমিতি ঔডুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে।। ৩/৪/৪৫

ঔডুলোমি আচার্য বলেন—'আর্ত্বিজ্যম্', অর্থাৎ ঋত্বিক্‌গণের কর্ম যে প্রকার তাঁহারা বিক্রয় করেন দক্ষিণা গ্রহণ দ্বারা, সেইরূপ শ্রীভগবান্ ভক্তের সেবা ভক্তি গ্রহণ করিয়া আপনাকে তাহাদের নিকট বিক্রয় করেন। প্রমাণ—

"তুলসীদলমাত্রেন জলস্য চুলুকেন চ।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ।।"

সূত্র— শ্রুতেশ্চ।। ৩/৪/৪৬

যেমন ঋত্বিক্ দক্ষিণা প্রপ্তিতে প্রার্থনা দ্বারা যজমানের অভাব পূরণ করেন, সেইরূপ ভগবান্‌ও ভক্তের ভক্তিপ্রাপ্তিতে ভক্তগণের সমুদয় অভাব পূরণ করিযা থাকেন।

১১। সহকার্য্যন্তরবিধ্যধিকরণ—

সূত্র— সহকার্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ।। ৩/৪/৪৭

যজ্ঞাদি এবং শমদমাদি বিদ্যার সহকারী উপায় একথা বলা হইয়াছে। কিন্তু একনিষ্ঠ ভক্তের পক্ষে উহা করণীয় নহে। কায়িক, বাচিক ও মানসিক—এই তিন প্রকার উপাসনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভক্তদের তৃতীয় অর্থাৎ মানসিক উপাসনা কর্তব্য। কঠ শ্রুতি বলিয়াছেন—

'মনসৈবেদমাপ্তব্যম্'। (কঠ, ২/১/১১)

মনের দ্বারাই ইহা প্রাপ্তব্য। মনে ঐকান্তিক ভাবেই সকল করণীয়। বাহিরে অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই।

১২। কৃৎস্নভাবাধিকরণ—

সূত্র— কৃৎস্নভাবাৎ তু গৃহিণোপসংহারঃ।। ৩/৪/৪৮

ছান্দোগ্যশ্রুতির শেষ মন্ত্রে (৮/১৫/১)

গৃহস্থাশ্রমীর প্রশংসা আছে। গৃহস্থধর্মে সকল প্রকার ধর্ম থাকাতে

উহা বর্ণনা করিয়া উপনিষদের উপসংহার করিয়াছেন। ইহাতে কোন বিরোধের কারণ নাই। গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন অন্যান্য আশ্রমের হীনত্ব খ্যাপন করার জন্য নহে। মনু বলিয়াছেন---- গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ কারণ, এই আশ্রমই অন্যান্য তিন আশ্রমকে ভরণ করিয়া থাকে।

"গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ সঃ ত্রীনেতান্ বিভর্তি হি।"

সূত্র—— **মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ** ।। ৩/৪/৪৯

ব্রহ্মবিদ্যা লাভ কোন বিশেযাশ্রমের নিজস্ব ধর্ম নহে। সমুদয় আশ্রম হইতেই উহা লাভ হইতে পারে। ব্রহ্মের ভগবানের ঐকান্তিক ভাবনা অর্থাৎ নিদিধ্যাসনই উহার উপায়। মৌনাশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রমের মত অন্যান্য আশ্রমেরও নিদিধ্যাসন যোগ্যতা হইতে পারে। হইলেই তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যালাভ হইতে পারে।

১৩। অনাবিষ্কারাধিকরণ——

সূত্র—— **অনাবিষ্কুর্বন্নন্বয়াৎ** ।। ৩/৪/৫০

বৃহদারণ্যক ৩/৫/১ মন্ত্রে বলিয়াছেন——

"বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ"। ইহার অর্থ, বাল্যভাবে অবস্থান করিবে। বালকের মত সরল, নিরভিমান, শত্রু-মিত্রে সমদর্শী ও যৌবনোচিত ইন্দ্রিয়-চেষ্টাবর্জিত হইবে। এই সব ভাবের সঙ্গেই বিদ্যার অন্বয়।

১৪। ঐহিকাধিকরণ——

সূত্র—— **ঐহিকমপ্রস্তুত-প্রতিবন্ধে, তদ্দর্শনাৎ** ।। ৩/৪/৫১

ইহাকালেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় যদি অন্তরায় উপস্থিত না থাকে। কাহারও ইহজন্মে হয়, কাহারও এক বা একাধিক জন্মের প্রয়োজন হয়। ইহজন্মেই হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। নির্ভর করে প্রতিবন্ধক থাকা না থাকার উপরে।

ব্রহ্ম বা ব্রহ্মবিদ্যা মায়াতীত বস্তু। উহা কর্মপ্রযত্নে লভ্য নহে। কর্মজনিত মলিনতার আবরণে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মবস্তু আবৃত থাকে। এই আবরণই অন্তরায়। সাধনভজনরূপ কর্ম করার উদ্দেশ্য ঐ আবরণকে স্বচ্ছ, স্বচ্ছতর, স্বচ্ছতম করা।

যত আবরণ স্বচ্ছ হইবে ততই স্বপ্রকাশ বস্তু প্রকাশ পাইবে। যদি প্রচেষ্টা প্রবল হয়, আকুলতা তীব্র হয়, অন্তরায় শক্তিশালী না হয় তাহা হইলে ইহজন্মেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে।

১৫। মুক্তিফলাধিকরণ—

সূত্র— এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতে-স্তদবস্থাবধৃতেঃ।। ৩/৪/৫২

মুক্তিলাভের দুইটি হেতু বিদ্যোৎপত্তি ও প্রারব্ধ নাশ। প্রারব্ধ ক্ষয় হইলেই লব্ধবিদ্য-ব্যক্তির দেহপাতান্তে মুক্তিলাভ হয়। লব্ধবিদ্য-ব্যক্তিরও যদি প্রারব্ধ নাশ করিতে জন্মান্তর প্রয়োজন হয়—তাহা হইলে ইহজন্মের দেহপাতে মুক্তিলাভ সম্ভব হয় না।

বিদ্যা দ্বারা প্রারব্ধ ভিন্ন অন্যান্য কর্মের ও ধ্বংস হয়। প্রারব্ধ ক্ষয়ের জন্য ভগবৎ-নির্দিষ্ট ভোগ প্রয়োজন। সেই ভোগের জন্য দেহধারণ প্রয়োজন।

লব্ধবিদ্য-ব্যক্তি জীবন্মুক্ত হয়। ঐ অবস্থায় প্রারব্ধ-ভোগ-পর্যন্ত দেহধারণ করিয়া থাকেন।

মুক্তির ফল ভক্তিরসের অনুভব। ইহা সাধনলব্ধ নহে। একমাত্র কৃষ্ণ-কৃপাতেই আনন্দরসানুভূতি হইয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্রহ্মসূত্র

চতুর্থ অধ্যায় : সিদ্ধি বা ফল

প্রথম পাদ

১। আবৃত্ত্যধিকরণ—

সূত্র— আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ।। ৪/১/১

আবৃত্তি শব্দের অর্থ বারংবার অনুষ্ঠান।

পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইবে। উপাসনা একদিন একবার মাত্র করিলেই চলিবে না। মুক্তিকামী পুনঃপুনঃ উপাসনা করিবে উপাসনাতে লাগিয়াই থাকিবে। শ্রুতি এই উপদেশই দিয়াছেন।

"আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।' (বৃহদারণ্যক, ২/৪/৬)

ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে (৬/৮/৭—৬/৮/১৫) পর্যন্ত মন্ত্রগুলিতে শ্বেতকেতুর প্রতি পিতা একটি মূল্যবান উপদেশ নয়বার দিয়াছেন একই মন্ত্র নয়বার বলার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য পুনঃপুনঃ অনুশীলন করিতে হইবে।

উপদেশ এই—"দৃশ্যমান সমুদয় আত্মস্বরূপ। ইহাই সত্য, ইহাই আত্মা, ইহাই তুমি।"

সূত্র— লিঙ্গাচ্চ।। ৪/১/২

স্মৃতিশাস্ত্র এই উপদেশ দিয়াছেন।

"অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়।।" (গীতা, ১২/৯)

২। আত্মত্বোপাসনাধিকরণ—

সূত্র— আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ।। ৪/১/৩

ব্রহ্মবস্তুকে আত্মস্বরূপে ভাবনা করিতেই শ্রুতি উপদেশ দিয়াছেন, এবং তাহাই যুক্তি-বিচার দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

"আত্মেত্যেবোপাসীত"। (বৃহদারণ্যক, ১/৪/৭)

"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত"। (বৃহদারণ্যক, ১/৪/৮)

৩। প্রতীকাধিকরণ——

সূত্র—— ন প্রতীকে ন হি সঃ ॥ ৪/১/৪

শ্রুতিতে প্রতীক উপাসনার কথা আছে ; যথা—— "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত (ছান্দোগ্য, ৩/১৮/১)। 'অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ' (তৈত্তিরীয়, ৩/২) 'স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে' (ছান্দোগ্য, ৭/১/৫)। এই সকল মন্ত্রদৃষ্টে মনে হয় প্রতীককেও আত্মভাবে উপাসনা করা যায়। কিন্তু এই সূত্রে নিষেধ করিয়াছেন। প্রতীক উপাসনায় ব্রহ্মের উপাসনা হয় না করণ, প্রতীক উপাসক তাঁহার উপাস্য প্রতীককে আপনার আত্মস্বরূপ বলিয়া ভাবনা করিতে পারেন না। এই আপাতঃ বিরোধী কথার সমাধান এই——উপাসনা মার্গে অগ্রসর হইবার প্রারম্ভে আশ্রয় রূপে যে কোন প্রতীক গ্রহণ করা যায়। কিন্তু উহা দ্বারা উপাসনার পরম ফল লাভ হয় না। কারণ বলিয়াছেন, উপাসক প্রতীককে আত্মস্বরূপ ভাবিতে পারেন না।

বৈষ্ণব-আচার্যেরা ঠিক এইভাবে সূত্রার্থ করেন না। তাঁহাদের মত হইল যে, প্রতীককে উপাস্য স্বরূপে না ভাবনা করা পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ফল লাভ হইবে না। প্রতীককে সাক্ষাৎ আরাধ্যস্বরূপ ভাবনা করিবার সামর্থ্য হইলে এই প্রতীকেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে। একটি মৃন্ময়ী বিষ্ণুমূর্তি অবলম্বনে পূজায় প্রবৃত্ত হইলাম——ক্রমে শুদ্ধচিত্তে ভাবনা করিতে করিতে ঐ "মূর্তিই সাক্ষাৎ" এই অনুভূতি জাগে। পুনঃপুনঃ জপ-ধ্যান-ধারণা দ্বারাই ইহা সম্ভবপর হয়। ঐ অনুভূতি জাগিলে মূর্তির সঙ্গে উপাসকের ভাবের আদানপ্রদান চলে।

শ্রীখণ্ড গ্রামে মহাপ্রভুর পার্ষদ নরহরি বাস করিতেন। তিনি গোপালের বিগ্রহ পূজা করিতেন। একদিন নরহরি কার্যান্তরে যাইবার সময় পুত্র রঘুনন্দনকে বলিলেন, "গোপীনাথকে উপাবাসী রাখিস্ না, খাওয়াইস।" বালক রঘুনন্দন ঠাকুরের সান্নিধানে ভোগ সাজাইয়া তাঁহাকে পুনঃপুনঃ খাইতে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। বিগ্রহ খায় না দেখিয়া বালক তাঁহাকে লাঠি দিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইলে গোপীনাথ তাহার দেওয়া সব দ্রব্য গ্রহণ করিলেন। নরহরি ফিরিয়া প্রসাদ চাহিলেন। রঘুনন্দন বলিল, "গোপীনাথ সবই খাইয়া ফেলিয়াছে। পাতে প্রসাদ অবশেষ নাই।"

পিতা পুত্রের কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন ছেলে নিজেই সব খাইয়াছে। পরদিন আবার কার্যান্তরে যাইবার কথা বলিয়া——

গেলেন না। লুকাইয়া রহিলেন—রঘুনাথের আর্তিতে যখন সত্য সত্যই গোপীনাথ খাইতেছিলেন, তখন নরহরি আড়াল হইতে বাহির হইয়া দৃশ্যটি দর্শন করিলেন। নরহরি উপস্থিত হওয়া মাত্র গোপীনাথ খাওয়া বন্ধ করিলেন। একটি নাড়ু অর্ধ-ভুক্ত হাতেই রহিল। এই বিগ্রহ শ্রীখণ্ডে অদ্যাপি বিরাজিত। এই রূপ দৃষ্টান্ত বৈষ্ণব শাস্ত্রে অগণিত। সুতরাং প্রতীকই ব্রহ্ম এই অনুভূতি সুদৃঢ় হইলে প্রতীকেই ব্রহ্মোপসনা হয়। নাম ও ব্রহ্ম অভিন্ন অনুভূত হইলে শুদ্ধ নাম-উপাসনা দ্বারা ইষ্টফল লাভ হয়। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ নামব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

কেবল মন বা অন্ন নহে—বহু প্রকার প্রতীকের বিধান আছে আর্যশাস্ত্রে। শালগ্রাম, বাণলিঙ্গ, দেববিগ্রহ, অগ্নি, জল, বায়ু, সূর্য, আকাশ, মন্ত্রাক্ষর, প্রভৃতিও প্রতীক। সাধক যদি উচ্চ অবস্থায় ঐ সকল প্রতীক অবলম্বনে ব্রহ্মাত্মভাব হৃদয়ে জাগ্রত করিতে পারে তাহা পরমাত্মার উপাসনাই হইল। ইহা বৈষ্ণবাচার্যের অভিমত।

৪। ব্রহ্মদৃষ্ট্যধিকরণ—

সূত্র—**ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ**।। ৪/১/৫

ছান্দোগ্য—"মনো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত", "আকাশো ব্রহ্ম ইতি", "স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে" প্রভৃতি স্থানে মন, আকাশ, নাম, এই সব প্রথমান্ত। প্রথমান্ত ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগে "সমানাধিকার" শ্রুতির অভিপ্রেত মনে হয়। সুতরাং প্রতীকে ব্রহ্মদৃষ্টি স্থাপন করা অনুচিত নহে। ব্রহ্মদৃষ্টি দ্বারা কোন প্রতীককে ব্রহ্মতুল্য ভাবনা করা যায়। শালগ্রাম পূজা, বাণলিঙ্গ পূজা, দেব বিগ্রহ পূজায় ইহাই বোধহয় তাৎপর্য।

৫। আদিত্যাদিমত্যধিকরণ—

সূত্র— আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ ।। ৪/১/৬

পুরুষসূক্তে আছে ব্রহ্মপুরুষের মন হইতে চন্দ্রমা, চক্ষু হইতে সূর্য, কর্ণ হইতে বায়ু ও প্রাণ এবং মুখ হইতে অগ্নি জন্মিল। পরম- পুরুষের অবিচিন্ত্যে শক্তিবশত এরূপ ভাবনা করাতে কোন অনুপপত্তি নাই। সঙ্গতি আছে।

৬। আসীনাধিকরণ—

সূত্র— **আসীনঃ সম্ভবাৎ।।** ৪/১/৭

অনেক লোক মনে করেন, ভজন মনের কর্ম, দেহটা যে কোন ভাবে থাকিলে ক্ষতি নাই। সূত্রকার তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন, আসনে সুখাসীন অবস্থায় উপাসনা ভাল হয়। আসনে উপাবিষ্ট উপাসকের চিত্ত একাগ্র। একাগ্রতা তত্ত্বজ্ঞান লাভের সহায়ক। ভাগবতও বলিয়াছেন, "তস্মিন্ স্বস্তিকমাসীন ঋজুকায়ঃ সমভ্যসেৎ।।" (ভাগবত, ৩/২৮/৮) অতএব আসনে উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করা প্রয়োজন।

সূত্র— **ধ্যানাচ্চ।।** ৪/১/৮

আসনে আসীন হওয়ার পক্ষে আর একটি যুক্তি দিতেছেন। উপাসনা একপ্রকার ধ্যান। ধ্যানের সার্থকতার জন্য আসনের অপেক্ষা রহিয়াছে। সুতরাং যেভাবে সেভাবে না বসিয়া কোনও আসনে বসাই কর্তব্য।

সূত্র— **অচলত্বঞ্চাপেক্ষ্য।।** ৪/১/৯

ধ্যানের জন্য সম্পূর্ণ চাঞ্চল্যহীনতা প্রয়োজন। আসনে স্থিরভাবে উপবিষ্ট উপাসকের পক্ষেই তাহা সম্ভব।

সূত্র—**স্মরন্তি চ।।** ৪/১/১০

ভগবদ্গীতাও আসনে উপবেশনের কথা স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন। যথা—

"তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জাদ্যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে।।
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্।।"
(গীতা, ৬/১২-১৩)

সূত্র— **যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ।।** ৪/১/১১

স্থান-কাল সম্বন্ধে বিশেষ কোনও নিয়ম নাই। যে-স্থানে মনের একাগ্রতা লাভের উপযোগী হয় সেখানেই উপাসনা করিবে। যে-স্থান, যে-কাল মনের একাগ্রতার অনুকূল হয়—তাহাই উপযুক্ত হয় উপাসনার।

মনঃ প্রসাদার্থং হি দেশকালাদিচিন্তনম্ (বরাহপুরাণ, মাধবভাষ্য)

৭। আ-প্রায়াণাধিকরণ——

সূত্র—— আ-প্রয়াণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্।। ৪/১/১২

ছান্দোগ্যশ্রুতি ৮/১৫/১ মন্ত্রে বলিয়াছেন——

"স খল্বেবং বর্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে"

উপাসক এইরূপে যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। তাৎপর্য এই যে, উপাসনার আরম্ভ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত যাবজ্জীবন পুনঃপুনঃ অনুশীলন করিতে হইবে।

৮। তদধিগমাধিকরণ——

সূত্র—— তদধিগম উত্তর-পূর্বাঘয়োরশ্লেষ-বিনাশৌ, তদ্ব্যপদেশাৎ।। ৪/১/১৩

ব্রহ্মবিদ্যালাভ হইলে 'উত্তরপূর্বাঘয়োঃ'——বিদ্যালাভের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পাপকর্মের 'অশ্লেষ-বিনাশৌ' যথাক্রমে নির্লেপ ও বিনাশ হয়।

সূত্রটির তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মবিদ্যা লাভের পর পাপকর্মের সহিত আর সম্বন্ধ থাকে না। বিদ্যালাভের পূর্ববর্তী পাপের ও পরবর্তী পাপের অশ্লেষ অর্থাৎ যুক্ততার অভাব হয়। ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যায়। শাস্ত্রজ্ঞরা বলেন, "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম", কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা এই বাক্যের প্রতিষেধক। অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইলে কোন কর্মই ফল দিতে পারে না। ব্রহ্মবিদ্যা লাভের পূর্ববর্তী কর্মগুলিকে বলে সঞ্চিত কর্ম। পরবর্তী কর্মফলকে বলা যায় ক্রিয়মাণ কর্ম। এই উভয় প্রকার কর্মফলের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানীর অশ্লেষ-সংশ্লেষের অভাব হয়, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ভাগবতও বলিয়াছেন——

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীযন্তে চাস্য কর্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি।।" ১১/২০/৩০

৯। ইতরাধিকরণ——

সূত্র—— ইতরস্যাপ্যেবম সংশ্লেষঃ পাতে তু।। ৪/১/১৪

কর্ম অর্থ কেবল পাপ কর্ম নহে। পুণ্যকর্মও কর্ম। যেইরূপ পাপ কর্মের ধ্বংস সেইরূপে পুণ্যকর্মের ধ্বংস হইয়া থাকে। সঞ্চিত পুণ্যকর্ম ধ্বংস হয়। ক্রিয়মাণ পুণ্যকর্মেরও অশ্লেষ হয়। যুক্ত থাকে না। সূত্রের ইতর শব্দের অর্থ—— পাপভিন্ন অন্য অর্থাৎ পুণ্য।

'পাতে তু' বলার তাৎপর্য——শরীরপাতে প্রারব্ধ কর্ম নাশ হয়।

অতএব পাতে অর্থ প্রারব্ধ নাশে। মৃত্যুতে প্রারব্ধ নাশ হইলে, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে মোক্ষলাভ হয়।

১০। অনারব্ধকার্যাধিকরণ—

সূত্র— অনারব্ধকার্যে এব তু পূর্বে তদবধেঃ ॥ ৪/১/১৫

পূর্ব পূর্ব সূত্রের কথাই আবার বলিতেছেন। অনারব্ধ কার্যের অর্থাৎ যাহাদের ফল আরম্ভ হয় নাই—সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম ব্রহ্মজ্ঞান হইলে নাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রারব্ধ কর্মফল তৎক্ষণাৎ বিনাশ না হইতে পারে অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহপাত নাও হইতে পারে। তাঁহারা জীবন্মুক্ত। মুক্ত হইয়াও বাঁচিয়া আছে জগতের কল্যাণের জন্য। ভগবদিচ্ছায় তাঁহারা মুক্ত হইয়াও দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। প্রারব্ধ কর্মফলে যে এই দেহ তাহা তাঁহাদের ইচ্ছা অনুসারে জগতে বিদ্যমান থাকে। প্রারব্ধ কর্মও বিদ্যা দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেও ভগবদিচ্ছায় প্রারব্ধের ভস্মীভূত-অবশেষ দৃশ্যত শরীরধারণরূপেই বিদ্যমান থাকে। ভক্তদেহে প্রারব্ধজনিত সুখ-দুঃখাদি ভোগ থাকে না। শরীরটি থাকে লোকহিতের জন্য।

১১। অগ্নিহোত্রাদ্যধিকরণ—

সূত্র— অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ ॥ ৪/১/১৬

অগ্নিহোত্র, সন্ধ্যাবন্দনা, গায়ত্রীজপ, প্রভৃতি নিত্যকর্ম। এই সব কর্ম কাম্য-কর্ম পর্যায়ভুক্ত নহে। এই সকল কর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য ব্রহ্মবিদ্যালাভ। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ ওই সকল কর্ম কোনদিনই পরিত্যাগ করিবেন না। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও বলিয়াছেন

"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রহ্মনা বিবিদষ্যন্তি।
যজ্ঞেন দানেন তপসাহনাশকেন ॥"

ইহাতে প্রতিপন্ন হইল, ব্রহ্মবিদ্যালাভের সাধনীভূত কর্ম, তাহা আজীবন করণীয়।

সূত্র— অতোহন্যাহপি হ্যেকেষামুভয়োঃ ॥ ৪/১/১৭

একেষাম্—অপর এক ব্যাখ্যার মত বলিতেছেন। ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির পুত্রাদি তাঁহার পুণ্যাংশ ও অপ্রিয় শত্রুগণ পাপাংশ গ্রহণ করে।

"তৎ সুকৃত দুষ্কৃতে ধুনুতে। তস্য প্রিয়া জ্ঞাতাঃ সুকৃতমুপজন্তি অপ্রিয়া দুষ্কৃতম্।" (কৌষিতকী শ্রুতি, ২/৪)।

সূত্র— **যদেব বিদ্যয়েতি হি**॥ ৪/১/১৮

বিদ্যাদ্বারা কৃত যে কার্য তাহা অজ্ঞানে সম্পাদিত কার্য অপেক্ষা শক্তিশালী। শ্রীভগবানে ভক্তিযোগের শক্তি অতিশয় প্রবল।

১২। ইতরক্ষপণাধিকরণ—

সূত্র— **ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাঽথ সম্পদ্যতে**॥ ৪/১/১৯

যে সকল পাপ-পুণ্য ফলপ্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ভোগের দ্বারা তাদের ক্ষয়সাধন করিয়া ব্রহ্মলাভ করিতে হয়। প্রারব্ধ ক্ষয় হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়।

চতুর্থ অধ্যায় প্রথম পাদ সমাপ্ত।

ব্রহ্মসূত্র

চতুর্থ অধ্যায় : দ্বিতীয় পাদ

১। বাগধিকরণ—

সূত্র— বাঙ্মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ।। ৪/২/১

শ্রুতি আছে 'বাক্ মনসি সম্পদ্যতে'। বাক্য মনে মিশিয়া যায়। দেহত্যাগকারী জীবের বাগ্‌বৃত্তি মনে লয় হয়। এই কথা শ্রোত্রাদিরও সম্বন্ধে জানিবে। এই পাদে মুমূর্ষু ব্যক্তির উৎক্রান্তির প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। বাগিন্দ্রিয় মৃত্যুকালে মনে লয় হয়।

সূত্র— অতএব চ সর্বাণ্যনু।। ৪/২/২

পূর্ব সূত্রে বাক্ উপলক্ষণ। সমুদয় ইন্দ্রিয়কে উপলক্ষ করিয়া বাক্‌শব্দ উক্ত হইয়াছে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ ও তাহাদের বৃত্তি প্রবর্তক দেবতাগণের সহিত মনে মিলিত হয়।

২। মনোঽধিকরণ—

সূত্র— তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ।। ৪/২/৩

সর্ব-ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত মন প্রাণে লয় হয়।

৩। অধ্যক্ষাধিকরণ—

সূত্র— সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ।। ৪/২/৪

অধ্যক্ষে—দেহাধিপতি ক্ষেত্রজ্ঞ জীবে। শ্রুতিতে "প্রাণস্তেজসি" এইরূপ বাক্য আছে। তাৎপর্য হইবে— প্রাণ আগে জীবের সহিত সংযুক্ত হইয়া পরে তেজে সংযুক্ত হয়।

৪। ভূতাধিকরণ—

সূত্র— ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ।। ৪/২/৫

প্রাণ কেবল তেজে নহে, পঞ্চভূতে সংযোগ হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ৪/৪/৫ মন্ত্রে আছে—"স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময়ঃ আপোময়ঃ বায়ুময়ঃ আকাশময়স্তেজোময়ঃ"। জীবের সর্বভূতময়ত্বই স্থির আছে।

সূত্র— **নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি॥ ৪/২/৬**

প্রাণ জীবকে আশ্রয় করিয়া জীবের সহিত তেজঃ প্রভৃতি পঞ্চভূতে সংযুক্ত হয়।

৫। আসৃত্যুপক্রমাধিকরণ—

সূত্র— **সমানা চাসৃত্যুপক্রামদমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য॥ ৪/২/৭**

নাড়ী প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্বান্ অবিদ্বানের উৎক্রান্তির প্রকার একইরূপ। ৪/২/১ হইতে ৪/২/৬ পর্যন্ত সূত্রে যে উৎক্রান্তির কথা বলা হইয়াছে তাহা কি ব্রহ্মবিদ্, কি অজ্ঞানী, সকলের পক্ষেই সমান প্রযোজ্য ?

সূত্র— **তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ॥ ৪/২/৮**

উপরোক্ত সূত্রের পক্ষে কারণ বলিতেছেন। "অপীতি অর্থ ব্রহ্মপ্রাপ্তি। 'আপীতেঃ' ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত বিদ্বান্ অবিদ্বানের একই গতি।

সূত্র— **সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ॥ ৪/২/৯**

সূত্র— **নোপমর্দেনাতঃ॥ ৪/২/১০**

সূত্র— **অস্যৈব চোপপত্তেরেষ উষ্মা॥ ৪/২/১১**

সূত্র— **প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ॥ ৪/২/১২**

এই কয়েকটি সূত্রে নানাবিধ হেতু দর্শাইয়া একটি কথাই বলা হইয়াছে যে, নাড়ী প্রবেশের পূর্বে বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের উৎক্রান্তি সমান।

সূত্র—**স্পষ্টো হ্যেকেষাম্॥ ৪/২/১৩**

সূত্র—**স্মর্যতে চ॥ ৪/২/১৪**

৬। পরসম্পত্ত্যধিকরণ—

সূত্র— **তানি পরে তথা হ্যাহ॥ ৪/২/১৫**

ছান্দোগ্য ৬/৮/৬ ও প্রশ্ন-শ্রুতি ৬/৫ বলেন, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির দেহবীজ, ভূতপঞ্চক, ইন্দ্রিয়সমূহ ও প্রাণে প্রভৃতি পরমাত্মায় লীন হইয়া যায়। এই সূত্রে তাহাই বলিলেন। গোবিন্দভাষ্যেও পাই— "তানি তেজঃ পরস্যামিত্যত্র তেজঃ-শব্দিতানি বাগাদিপ্রাণভূতানি পরে সর্বাত্মভূতে ব্রহ্মণি সম্পদ্যতে তস্যৈব সর্বোপাদানত্বাৎ।"

৭। অবিভাগাধিকরণ—

সূত্র— অবিভাগো বচনাৎ।। ৪/২/১৬

মনঃ ও ইন্দ্রিয়গণ বিদ্বান্ ব্যক্তির উৎক্রান্তির পরও অনুগমন করিয়া থাকে।

ছান্দোগ্য-শ্রুতি ও প্রশ্ন-শ্রুতি বলিয়াছেন যে, বিদ্বান্ ব্যক্তিই দেহের বীজস্বরূপ, পঞ্চভূত ইন্দ্রিয় ও প্রাণ পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মা ভিন্ন অপর কোন বস্তু নাই। বাস্তব দৃষ্টিতে মন প্রাণ প্রভৃতি সবই পরমাত্মায় লীন হয়। বিদ্বান্ ব্যক্তি পরমাত্মায় লীন হইয়া ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করেন।

৮। তদোকোঽধিকরণ—

সূত্র— তদোকোঽগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো
বিদ্যাসামর্থ্যাৎ তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ
হার্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া।। ৪/২/১৭

বিদ্বান্ পুরুষ শতাধিক একমাত্র মূর্ধন্য নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ করেন। মৃত্যু সময় মূর্ধন্য নাড়ীটিকে ১০১টি নাড়ীর মধ্যে বাছিয়া লওয়া বিদ্বান্ পুরুষের পক্ষে অসম্ভব নহে। কারণ, (১) প্রত্যেক আত্মার যে স্বতঃবাসস্থানস্বরূপ হৃদয়েব অগ্রভাগ, তাহা প্রকাশিত অর্থাৎ আলোকিত হয়। (২) শ্রীভগবানের আরাধনা হইতে জাত যে বিদ্যা তাহা খুব শক্তিময়ী। মৃত্যু সময় বিদ্যার সামর্থ্যের ও বিদ্যার ফলস্বরূপ গতির ধ্যান থাকে। (৩) বিদ্বান্ ব্যক্তি পরমপুরুষের পরম অনুগ্রহভাজন হন—এই হেতু যে পথে গেলে অমৃতত্ব লাভ হয় সেই মূর্ধন্য নাড়ী-পথে অতি সহজে তার উৎক্রমণ হইয়া থাকে। বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, কঠ, তিন শ্রুতিতেই এই কথার সমর্থক উক্তি আছে।

৯। রশ্ম্যনুসারাধিকরণ—

সূত্র— রশ্ম্যনুসারী।। ৪/২/১৮

ছান্দোগ্য-শ্রুতি ৮/৬/৫ মন্ত্রে আছে, দেহ হইতে উৎক্রান্তির পর রশ্মি পথে ঊর্ধ্বগমন করে। ওই নাড়ী দ্বারা ঊর্ধ্বগমনকারী অমৃতত্ব লাভ করে। এই বিষয় সংশয় এই যে, রাত্রিকালে সূর্যরশ্মি থাকে না; রাত্রিতে মৃত্যু হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তি সূর্যরশ্মি কোথায় পাইবে? এই সূত্রে উত্তর দিয়াছেন। উত্তর এই যে, রাত্রিকালেও সূর্যরশ্মি থাকে।

বিদ্বান্ ব্যক্তি ওই রশ্মিপথে ঊর্ধ্বগমন করিয়া থাকে। স্বরূপতঃ সূর্যের উদয়াস্ত নাই। পৃথিবীর গতিতে এইরূপ মনে হয় মাত্র।

১০। নিশাধিকরণ—

সূত্র— **নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাদ্দর্শয়তি চ।।** ৪/২/১৯

এই সূত্রের ও উপরোক্ত সূত্রের মূল বক্তব্য একই।

১১। দক্ষিণায়নাধিকরণ—

সূত্র— **অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে।।** ১/২/২০

মৃত্যুর যে কাল নির্দেশ দেবযান পিতৃযান ইত্যাদি উহা সাধারণ লোকের জন্য। ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির জন্যে নহে। ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির মৃত্যু রাত্রিতে হউক, দিবসে হউক, কৃষ্ণপক্ষে হউক আর শুক্লপক্ষে হউক, দক্ষিণায়নে হউক, অথবা উত্তরায়ণে হউক, তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তির কোন বাধা হয় না। ওই সকল শব্দে রাত্রি, শুক্ল পক্ষ, উত্তর-দক্ষিণায়ন মৃত্যুকাল নির্দেশক নহে। উহা অভিমানী দেবতাবোধক মাত্র।

সূত্র— **যোগিনঃ প্রতি স্মর্যতে স্মার্তে চৈতে।।** ৪/২/২১

এই দুইটি পথের কথা স্মরণ রাখিলে উত্তরোত্তর আত্মোন্নতি হইতে পারে। ধূম অগ্নি ইত্যাদি শব্দ কালবোধকই নহে। অভিমানী দেবতা-বোধক মাত্র। এই অভিমানী দেবতা অর্থ যে কি তাহা আমরা যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম।

দ্বিতীয় পাদে ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির মূর্ধন্য নাড়ী পথে উৎক্রান্তির বিষয় বিচার করা হইল। তৃতীয় পাদে গন্তব্য দেবযান মার্গ বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত।

ব্রহ্মসূত্র

চতুর্থ অধ্যায় : তৃতীয় পাদ

১। অর্চিরাদ্যধিকরণ—

সূত্র— অর্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ।। ৪/৩/১

সমুদয় শ্রুতির বক্তব্য একটি মাত্র পথ। তাহার নাম দেবযান। ব্রহ্মজ্ঞানীদের এই একটি পথ। যাহারা কাম্যকর্মাদি করে তাহাদের গন্তব্য পথ পিতৃযান।

২। বায়্বধিকরণ—

সূত্র— বায়ুমব্দাদবিশেষ-বিশেষাভ্যাম্।। ৪/৩/২

দেবলোক ও বায়ুলোকে মূলতঃ একই। উৎক্রান্ত বিদ্বান্ প্রথমে বায়ুলোক গমন করেন। এই কথা শ্রুতিতে আছে। দেবলোক ও বায়ুলোক একই। বৃহদারণ্যকে আছে, যিনি প্রবাহিত হইতেছেন তিনি দেবগণের গৃহ বা বাসভূমি। "যোঽয়ং পবন এষ এব দেবানাং গৃহঃ।" সুতরাং দেবলোক ও বায়ু অভিন্ন।

৩। তড়িতোঽধিকরণ বা বরুণাধিকরণ—

সূত্র— তড়িতোঽধিবরুণঃ সম্বন্ধাৎ।। ৪/৩/৩

বিদ্যুতের সহিত বরুণের সম্বন্ধ। বিদ্যুতের অব্যবহিত পরই বর্ষণ হয়। বরুণ জলাধিপতি। সুতরাং বিদ্যুতেরই পরই বরুণেব স্থান। 'অর্চিঃ' 'অহঃ' প্রভৃতি শব্দ দেবযানের পথ প্রদর্শক।

৪। আতিবাহিকাধিকরণ—

সূত্র— আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ।। ৪/৩/৪

'আতিবাহিকা' অর্থাৎ পথপ্রদর্শক। 'অর্চিঃ' 'অহঃ' প্রভৃতি শব্দ কালবাচক নহে। উহারা অভিমানী দেবতা। উহারা বিদ্বান্ ব্যক্তিকে পথপ্রদর্শকের কার্য করেন। একে অপরের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। কাহার পর কে তাহা লইয়া শ্রুতিতে সামান্য বিরোধ দৃষ্ট হওয়ায়, ঠিক কে কাহার পরে হইবেন পূর্ববর্তী কয়েকটি সূত্রে তাহা বলিয়াছেন।

সূত্র— উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ।। ৪/৩/৫

'অর্চিঃ' প্রভৃতি শব্দ মার্গচিহ্নও নহে, ভোগস্থানও নহে। তত্তৎ অভিমানী দেবতা পথপ্রদর্শক মাত্র। পূর্বসূত্রেও এই একই কথা বলিয়াছেন। বিচার দ্বারা দেখানো যায় যে উভয় পক্ষ—চিহ্ন পক্ষ ও ভোগস্থান পক্ষ—দুইই অসঙ্গত হয়। অতএব পথপ্রদর্শক অর্থই স্থির রহিল।

সূত্র— বৈদ্যুতেনৈব ততস্তচ্ছ্রুতেঃ।। ৪/৩/৬

বিদ্যুৎ প্রাপ্তির পর ভগবানের পার্ষদরূপ অমানব বিদ্বান্ পুরুষকে ব্রহ্ম সমীপে লইয়া চলে। বরুণ, ইন্দ্র, প্রজাপতি ইঁহারাও ঐ কার্য করেন। কার্যে সহাযতা করেন মাত্র।

৫। কার্যাধিকরণ—

সূত্র— কার্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ।। ৪/৩/৭

বাদরায়ণ বলেন, অর্চিবাদী অভিমানী দেবগণ উপাসকগণকে কার্যব্রহ্মে পৌঁছাইয়া দেন। কার্যব্রহ্ম বলিতে হিরণ্যগর্ভকে বুঝায়। কারণ, ব্রহ্ম বলিতে পরব্রহ্মকে বুঝায়। গতি শব্দদ্বারা কার্যব্রহ্মেরই উপপত্তি হয়। কার্যব্রহ্ম সগুণ সুতরাং তাহার প্রাপ্তি সঙ্গত। পরব্রহ্ম সর্বাত্মভূত। তাহার প্রাপ্তি সিদ্ধই আছে। সুতরাং গতিদ্বারা তৎপ্রাপ্তি কথা সঙ্গত হয় না।

সূত্র— বিশেষিতত্বাচ্চ।। ৪/৩/৮

ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি। এস্থলে লোক শব্দের প্রয়োগ দ্বারা বুঝা যায় যিনি প্রাপ্তব্য তিনি কার্যব্রহ্ম। পরব্রহ্ম সম্বন্ধে লোক শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে না। লোক শব্দ স্থানবাচী। পরব্রহ্ম স্থান-কাল অতীত।

সূত্র— সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ।। ৪/৩/৯

শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি বলেন, 'হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্বম্'। সুতরাং তাঁহার সহিত পরব্রহ্মের সম্বন্ধ নিকট। এইজন্য হিরণগর্ভকেই বুঝাইবার জন্য ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ অসঙ্গত নয়।

সূত্র— কার্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ।। ৪/৩/১০

মুণ্ডক-শ্রুতি ৩/২/৬ মন্ত্রে বলিয়াছেন,

"তে ব্রহ্মলোকেসু যু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে।।"

ব্রহ্মলোকগত তাঁহারা হিরণ্যগর্ভের অধিকার শেষ হইলে পরমামৃত লাভ করিয়া মুক্ত হন। ইহাতে বুঝা যায় প্রথম প্রাপ্তি কার্যব্রহ্মই।

সূত্র— স্মৃতেশ্চ ।। ৪/৩/১১

গীতা বলেন 'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন'। ৮/১৬

ব্রহ্মলোকে হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় লোকই পুনরাবৃত্তিচক্রে প্রতিষ্ঠিত। কেবল আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না। ইহাতেও প্রমাণিত হয় যে প্রথম প্রাপ্তব্য হিরণ্যগর্ভ।

সূত্র— পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ ।। ৪/৩/১২

জৈমিনি মুনি বলেন আর্চিরাদি দেবযান পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত করেন। পরং ব্রহ্ম নয়তি। মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থে গ্রহণ সঙ্গত নহে। লোক-শব্দে কার্যব্রহ্ম বুঝায় না। ব্রহ্ম সর্বগত হইলেও স্বেচ্ছায় বিশেষ দেবাবর্তী হইতে পারেন। ব্রহ্মলোক নিত্য।

সূত্র— দর্শনাচ্চ ।। ৪/৩/১৩

যে সকল ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি মূর্ধন্যনাড়ী যোগে দেবযান পথে গমন করেন, তাঁহারা পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই কথা ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে স্পষ্টই উল্লেখ আছে—"পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে"। (ছান্দোগ্য, ৮/১২/৩)

সূত্র— ন চ কার্যে প্রতিপ্রত্ত্যভিসন্ধিঃ ।। ৪/৩/১৪

ব্রহ্ম উপাসক সাধকের অভিসন্ধি অর্থাৎ অন্তরের ইচ্ছা, উপাসনা কার্যব্রহ্মে পৌঁছিবার নহে। উপাসকের লালসা, চন্দ্র যেমন রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া কৃতকৃত্য হয় তদ্রূপ, শরীর ত্যাগ-পূর্বক অমৃতময় ব্রহ্মলোক লাভ করিবে। মন্ত্রে প্রজাপতি শব্দেও ব্রহ্মই বুঝাইবে। প্রজাদিগের পতিই বিশ্বেশ্বর বিশ্বপতি।

দুই আচার্যের মত আলোচনা করিয়া পরবর্তী সূত্রে বাদরায়ণ মুনির মত বলিতেছেন।

সূত্র— অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থাঽদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ ।। ৪/৩/১৫

যাঁহারা, কোনও প্রকার প্রতীকের সম্বন্ধশূন্য আচার্যদ্বয়ের হইয়া নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা— যাঁহার যেরূপ সঙ্কল্প সেই প্রকার প্রাপ্তি হয়। বাদরি ও জৈমিনি এই দ্বিবিধ মতই বাদরায়ণের অনভিপ্রেত। তাঁহার মত এই যে ব্রহ্মোপসনায় সগুণ-নির্গুণ ব্রহ্ম-ভেদে ফলের তারতম্য নাই। ব্রহ্ম একই কালে সগুণ-নির্গুণ উভয়ই।

সূত্র— বিশেষঞ্চ দর্শয়তি ।। ৪/৩/১৬

যাঁহারা জড়বস্তুর উপাসনা করেন তাঁহাদের পরিমিত ফল লাভ হয়।

পরমপুরুষার্থ লাভ হয় না। এই কথা শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সূত্রের বলদেব বিদ্যাভূষণ অর্থ করিয়াছেন—নিরপেক্ষ উপাসনা সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা শ্রুতিই দেখাইয়াছেন।

গোবিন্দভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন— "অথ নিরপেক্ষাণাং কেষাঞ্চিৎ স্বয়ং ভগবতৈব স্বপদপ্রাপ্তিরভিধীয়তে"— "এতদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে নিত্যোদ্যুক্তাঃ সংযজন্তে ন কামান। তেষামসৌ গোপরূপঃ প্রযত্নাৎ প্রকাশয়েদ্ আত্মপদং তদেব। ওঙ্কারেণান্তরিতং যো জপতি গোবিন্দস্য পঞ্চপদং মনুম্। তং তস্যৈবাসৌ দর্শয়েদাত্মরূপং তস্মাৎ মুমুক্ষুঃ অভ্যাসেৎ নিত্য শান্ত্যৈ ইতি।।"

যাঁহারা নিত্য একনিষ্ঠ হইয়া বিষ্ণুর পরম পদের উপাসনা করেন, তাঁহাদের আরাধ্য দেবতা গোপালরূপী ভগবান্ স্বধাম দেখাইয়াছেন। গীতায় বলিয়াছেন—

"তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্।।" ১২/৭

"ন চিরাৎ" অর্চিবাদী মার্গের নিরপেক্ষতা বুঝাইতেছে।

চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

ব্রহ্মসূত্র

চতুর্থ অধ্যায় : চতুর্থ পাদ

১। সম্পদ্যাবির্ভাবাধিকরণ—

সূত্র— সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন-শব্দাৎ।। ৪/৪/১

ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮/১২/৩ মন্ত্রে জানাইতেছেন "এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ।" ঠিক এই রূপে এই জীব এ দেহ হইতে বহির্গত হইযা পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হন সেই পরমাত্মায়।

এই মন্ত্রটির মধ্যে 'স্বেন' শব্দটি থাকায় বুঝা যায় মুক্ত অবস্থায় জীবের স্বরূপে অবস্থান হয়।

ভাগবত বলিয়াছেন, "মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।।" (২/১০/৬)

স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি।

সূত্র— মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ।। ৪/৪/২

'মুক্তঃ' অর্থ সাংসারিক অবস্থাত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া নিজ স্বরূপে অবস্থান। অবস্থানত্রয় হইল জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। ইহারা সত্য নহে। সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়। চতুর্থ বা তুরীয় চৈতন্যই পরম সত্য। মুক্ত জীবের অবস্থিতি পরম সত্যে।

সূত্র— আত্মা প্রকরণাৎ।। ৪/৪/৩

এই তিন অবস্থা হইতে ভিন্ন তুরীয়ই আত্মতত্ত্ব। ভাগবত বলিয়াছেন, (১০/১৪/২৩ শ্লোকে)—"একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।" আত্মা পুরাণ পুরুষ সত্যস্বরূপ স্বয়ংজ্যোতিঃ অনন্ত ও আদ্য।

২। অবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণ—

সূত্র— অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ।। ৪/৪/৪

মুক্তাত্মা পরব্রহ্মকে অবিভক্ত রূপে অনুভব করেন। পরমাত্মার সহিত একান্ত ঐক্য দর্শন করেন।

৩। **ব্রাহ্মাধিকরণ——**

সূত্র—— **ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ** ।। ৪/৪/৫

আচার্য জৈমিনি বলেন, মুক্তাত্মা ব্রহ্মসম্বন্ধী গুণসম্পন্ন হন। পরব্রহ্মের গুণ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য (৮/৭/১ মন্ত্র) কিছু বর্ণনা করিয়াছেন।

"য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ ।।"

সূত্র—— **চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ** ।। ৪/৪/৬

আচার্য ঔড়ুলোমির মত বলিতেছেন। বৃহদারণ্যক শ্রুতি, ৪/৫/১৩ মন্ত্রে জীবকে বিজ্ঞানঘন, প্রজ্ঞানঘন প্রভৃতি পদে অভিহিত করিয়াছেন। জীব চৈতন্যাত্মক ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। মুক্তিতে এই চৈতন্যময় রূপটি প্রকাশিত হয়।

সূত্র— **এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ** ।। ৪/৪/৭

ব্রহ্মসূত্রকার আচার্য বাদরায়ণ বলিতেছেন যে, পূর্বোক্ত জৈমিনি ও ঔড়ুলোমি এই উভয় আচার্যের কথাই ঠিক। কোন কোন বিশেষণ সম্বন্ধে আপাতবিরোধী মনে হইলেও যেমন ব্রহ্মে তেমনি ব্রহ্মভূত পুরুষে সকল বিরোধিতার সমাধান হয়। একটু ভাবনা করিলেই বোধগম্য হইবে যে, আচার্য মতে বিরোধিতা নাই বরং সমাধানই আছে। বিজ্ঞানঘন হইলেও মুক্তাত্মা অপহতপাপ্মা হইতে পারে। জ্ঞানস্বরূপের সহিত ভগবত্তার কোন বিরোধ নাই।

৪। **সংকল্পাধিকরণ——**

সূত্র—— **সংকল্পাদেব তু তচ্ছ্রুতেঃ** ।। ৪/৪/৮

সকল জীবের সংকল্পসিদ্ধির জন্য প্রযত্নের প্রয়োজন। মুক্তাত্মা সেরূপ নহে। মুক্তাত্মার সংকল্প মাত্রেই সিদ্ধি হয়। সূত্রে 'এব' শব্দের তাৎপর্যই এই যে কোনপ্রকার প্রযত্নই প্রয়োজন হয় না। ভগবানের যেরূপ সংকল্প মাত্রই সিদ্ধি, মুক্তাত্মারও তদ্রূপ। এই রূপ ইচ্ছামাত্রে সংকল্পসিদ্ধি শ্রেষ্ঠ যোগীগণেরও হয়। মুক্তাত্মা সম্বন্ধে আর কথা কি ? মুক্তাত্মার ভোগ্য ভোগে স্বরূপানুভূতি হয় কারণ ভোগ্য বস্তু তাঁহাদের স্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে। সাধারণ জীবের ভোগ্য বস্তু ভোক্তা হইতে পৃথক্। ঐ জন্যই তাহাদের মমত্ববুদ্ধি হয়। মুক্তাত্মার অবিদ্যা নাই সুতরাং মমত্ব বুদ্ধি নাই।

সূত্র—অতএব চানন্যাধিপতিঃ।। ৪/৪/৯

সত্যসংকল্পত্ব প্রাপ্তি হয় বলিয়া মুক্তাত্মা কাহারও অধীন নহে। ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলিয়াছেন, 'স স্বরাড্ ভবতি' (৭/২৫/২)।

সমুদয় লোকে মুক্তাত্মার স্বাতন্ত্র্য হয়। ভক্তের স্বাতন্ত্র্যের সহিত ভগবানের নিয়ন্তৃত্বের বিরোধ নাই। স্ব ও পর সেখানে স্বাতন্ত্র্য পারতন্ত্রের কোন প্রশ্নই নাই। নিত্যধামে স্ব-পর ভেদ নাই।

৫। অভাবাধিকরণ—

সূত্র— অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্।। ৪/৪/১০

মুক্তাত্মার দেহ বা কোন দেহেন্দ্রিয় নাই। ইহা আচার্য বাদরি দৃঢ়ভাবেই বলিয়াছেন। ভাগবতে ২/২/৩১ শ্লোকে বলিয়াছেন, সকল উপাধির অবসানে আনন্দস্বরূপ আত্মাই থাকে।

'তেনাত্মাত্মানমুপৈতি শান্তমানন্দমানন্দময়োঽবসানে'। অবসানে অর্থ সকল প্রকার উপাধির অবসানে।

সূত্র— ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ।। ৪/৪/১১

জৈমিনি মুনি মনে করেন, মুক্তপুরুষেরও দেহেন্দ্রিয় থাকে। না থাকিলে সুখ-দুঃখ ভোগাদি কিরূপে হয়?

সূত্র— দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ।। ৪/৪/১২

উক্ত বিষয় মুক্তপুরুষের দেহেন্দ্রিয় থাকা-না-থাকা বিষয় সূত্রকার বাদরায়ণ মীমাংসা করেন যে, উভয় রূপতাই সিদ্ধ। দেহন্দ্রিয় আছেও বলা যায়, নাইও বলা যায়। এই হেতু অর্থাৎ সত্য-সংকল্পত্বহেতু। সত্যসংকল্প বলিয়া তাঁহার পক্ষে শরীর-ধারণ বা না-ধারণের কোন পার্থক্য নাই।

সূত্র— তন্বভাবে সন্ধ্যাবদুপপত্তেঃ।। ৪/৪/১৩

সূত্র— ভাবে জাগ্রদ্বৎ।। ৪/৪/১৪

মুক্তপুরুষদের তনু থাকা-না-থাকা কোন পার্থক্য নাই। যখন না থাকে তখন বদ্ধজীব যেমন স্বপ্নে ভোগ করে সেইরূপ ভোগ হয়। যখন তনু থাকে তখন তাহা অপ্রাকৃত তনু। উহা দ্বারা শ্রীভগবানের লীলারসাদি আস্বাদন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। ছান্দোগ্য-শ্রুতি মুক্তজীবকে আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন বলিয়াছেন (৭/২৫/২)।

এই বিশেষণগুলির তাৎপর্য চিন্তনীয়। স্বয়ং ভগবান্ আত্মরতি আত্মকাম হইলেও ভক্তের দেওয়া দ্রব্যাদি গ্রহণ করেন। পত্রপুষ্প ফল

জল তিনি গ্রহণ করেন একথা গীতায় বলিয়াছেন। মুক্তাত্মারাও সেইরূপ ভগবানের প্রসাদরূপে প্রাপ্ত ভোগ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সূত্র— **প্রদীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়তি।** ৪/৪/১৫

জীবাত্মা অণু-পরিমাণ। অণু-পরিমাণ জীবের একই কালে একাধিক দেহে আত্মাভিমান কি সম্ভব? ইহার উত্তরে এই সূত্র বলিতেছেন, 'প্রদীপবৎ' সম্ভব। প্রদীপ যেমন এক স্থানে থাকিয়া প্রভা দ্বারা অন্যস্থান আলোকিত করে তদ্রূপ, আত্মার প্রভা হইল চৈতন্যস্বরূপতা। চৈতন্যময়তা একাধিক শরীরকে চৈতন্যময় করিতে পারে।

সূত্র— **স্বাপ্যয়-সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষমাবিষ্কৃতং হি।।** ৪/৪/১৬

বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন জীব পরমাত্মায় মিলিত হইলে সে বাহ্য আন্তর কিছুই বুঝিতে পারে না। তবে কি মুক্তাত্মা একেবারে জ্ঞানহীন হন? না, মুক্তাত্মার মোক্ষাবস্থাযও জ্ঞানের বিলুপ্তি হয় না। তবে যে বাহ্য আন্তর জানে না এই কথা বলা হইয়াছে; তাহা সাধারণ জীবের দৃষ্টান্তে স্বপ্নাবস্থা ও মরণ অবস্থার সঙ্গে দৃষ্টান্ত। 'স্বাপ্যয়' অর্থ সুষুপ্তি, আর 'সম্পত্তি' অর্থ মরণাবস্থা। আচার্য শঙ্কর বলেন, 'সম্পত্তি' অর্থ ব্রহ্মসম্পত্তি প্রাপ্তি। কৈবল্যাবস্থা।

৬। জগদ্ব্যাপারবর্জাধিকরণ—

সূত্র— **জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ।।** ৪/৪/১৭

মুক্তপুরুষের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির কথা উল্লেখ আছে। উহা কিন্তু 'জগদ্ব্যাপারবর্জং' অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ-রূপে কার্য একমাত্র পরব্রহ্মস্বরূপেরই। মুক্তপুরুষের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হইলেও সে জগদ্ব্যাপার লাভ করে না। জগৎ-সৃষ্ট্যাদি কার্য ব্রহ্মের অসাধারণ লক্ষণ। মুক্ত পুরুষ যদি জগৎ-স্রষ্টা হইতেন তাহা শ্রুতি কোথাও না কোথাও উল্লেখ করিতেন। এক পরমাত্মাই সমুদয় বিশ্বের নিয়ামক একথা শ্রুতি পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন। কিন্তু কোন মুক্ত জীব সম্বন্ধে ঐরূপ উক্তি কোথাও করেন নাই।

জগদ্ব্যাপার মায়ার খেলা, মায়াশক্তি দ্বারা ব্রহ্ম সৃষ্ট্যাদি-কার্য করেন। তিনি মায়াধীশ বলিয়া তাহা সম্ভব। মায়াবশ জীবের পক্ষে উহা সম্ভব নহে। মায়াধীশ ব্রহ্মই মায়াকে লইয়া খেলা করিতে পারেন।

সূত্র— প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্নাধিকারিকমণ্ডলস্যোক্তেঃ ।। ৪/৪/১৮

তৈত্তিরীয়-শ্রুতিতে (১/৫/৩) উক্ত আছে মুক্ত-পুরুষদের পূজোপহার সকল দেবগণ বহন করেন। "সর্বেঽস্মৈদেবা বলিমাবহন্তি" ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলিয়াছেন যে, মুক্তপুরুষ স্বরাট্ ও কামরূপী হন। তাহা হইলে সৃষ্টি-পালনাদি-কার্যে অধিকার থাকিবে কেন ? এই প্রশ্নের উপরোক্ত সূত্র। সূত্রের প্রথমার্ধে আপত্তি শেষার্ধে সমাধান।

শ্রীভগবানেরই বিধানানুসারে লোকপালগণ মুক্তপুরুষের স্বাচ্ছান্দ্য বিধান করেন কিন্তু জগদ্ব্যাপারে মুক্তাত্মার কোন অধিকার প্রকাশ করা সেই সকল মন্ত্রের অভিপ্রায় নহে।

সূত্র— বিকারাবর্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ।। ৪/৪/১৯

'বিকারাবর্তি' বিকারের অবর্তি— জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, অবক্ষয়, পরিণাম, নাশ এই ছয় প্রকার বিকার যাহাতে বর্তে না—তিনি পরব্রহ্ম। মুক্তপুরুষ এই সকল বিকারাতীত হন। কিন্তু তাহাতে জগদ্ব্যাপারেব কোন শক্তি মুক্তজীবে হয় না। বদ্ধজীবের ভোগ্যবস্তু নশ্বর। মুক্তপুরুষের ভোগ্য বস্তুসকলও নিত্য। মুক্তপুরুষ শ্রীভগবানে অভেদে অবস্থিতি। ভিন্ন ভিন্ন লোকেব ভোগ্যবস্তু সকল উপভোগ মুক্তপুরুষ করিতে পারেন ভগবদিচ্ছায়। কিন্তু জগদ্ব্যাপারে কোন অধিকার হয় না।

সূত্র— দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে।। ৪/৪/২০

শ্রুতি ও স্মৃতি পুনঃপুনঃ প্রতিপাদন করিয়াছেন, সমস্ত জগৎ পরব্রহ্ম হইতে জাত ও সকলই তাঁহার বিভূতির বিকাশ। কিন্তু পরম পুরুষের যে লীলা ও লীলার উপকরণ, সকলই তাঁহা হইতে অভিন্ন। সকলই নিত্য সত্য। গীতা বলিয়াছেন,

> "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
> শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।।" ১৪/২৭

তিনি ঐকান্তিক সুখের একামাত্র আশ্রয়। এই জন্য মুক্তাত্মাগণের আনন্দের আস্বাদ শাশ্বত।

সূত্র— ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ।। ৪/৪/২১

মুণ্ডকশ্রুতি বলিয়াছেন— 'নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।' ৩/১/৩

মুক্তপুরুষ ব্রহ্মসাম্যলাভ করেন। সুতরাং মুক্তাত্মার জগদ্ব্যাপারে অনধিকার কেন ? এই সূত্রে উত্তর দিতেছেন।

অগ্নির স্ফুলিঙ্গ আর বৃহদগ্নির সাম্য আছে কিন্তু তাহারা অভেদ নহে। সেইরূপ মুক্তাত্মার ভগবানের ভোগবিষয় সাম্য থাকিলেও জগদ্ব্যাপারে সাম্য নহে।

সূত্র— অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ॥ ৪/৪/২২

গীতা বলিয়াছেন—

"আব্রহ্ম ভুবনাল্লোঁকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥" ৮/১৬

আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না। এই সূত্রে তাহাই বলিয়াছেন। মুক্তাত্মার আর পুনরাবৃত্তি হয় না।

কর্মই পুনর্জন্মের কারণ। মুক্তপুরুষের সঞ্চিত প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ সর্বপ্রকার কর্মের বীজ নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং পুনর্জন্মের কারণ বিদ্যমান না থাকায় পুনর্জন্ম অসম্ভব।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট-১

বেদ-বেদান্ত : ব্রহ্মসূত্র

অধিকরণাবলী ও প্রতিটি অধিকরণের প্রতিপাদ্য বিষয়।

প্রথম অধ্যায়। প্রথম পাদ।

১। জিজ্ঞাসাধিকরণ — ব্রহ্মই জিজ্ঞাস্য। ইহাই পরম পুরুষার্থ।

২। জন্মাদ্যধিকরণ — ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দেশ। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ ব্রহ্মই।

৩। শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণ — ব্রহ্মতত্ত্ব শাস্ত্রবাক্য দ্বারাই বোধ্য। শাস্ত্রই ব্রহ্মের প্রতিপাদক।

৪। সমন্বয়াধিকরণ — পরব্রহ্মই সর্ববেদবেদ্য। বেদ ও বেদানুসারী সমুদয় শাস্ত্রই ব্রহ্মে পর্যবসান।

৫। ঈক্ষত্যধিকরণ — ব্রহ্ম বেদগ্রাহ্য হইলেও তিনি স্বপ্রকাশ। ঈক্ষণপূর্বক সৃষ্টি হওয়ায় জগৎকারণ প্রধান নহে।

৬। আনন্দময়াধিকরণ — ব্রহ্ম পূর্ণ-আনন্দময়। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ।

৭। অন্তরাধিকরণ — সূর্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী ও চক্ষু-মধ্যবর্তী পুরুষ পরব্রহ্ম। আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী পুরুষ ও অক্ষিপুরুষ ব্রহ্মই বটে।

৮। আকাশাধিকরণ — আকাশ-শব্দে ব্রহ্মই বোদ্ধব্য। পরব্রহ্ম আকাশ-শব্দবাচ্য।

৯। প্রাণাধিকরণ — ছান্দোগ্য-বর্ণিত প্রাণ-শব্দে ব্রহ্মই বোধ্য। পরব্রহ্ম প্রাণ-শব্দবাচ্য।

১০। জ্যোতিরধিকরণ — জ্যোতি বলিতে ব্রহ্মই জ্ঞাতব্য। পরব্রহ্ম জ্যোতি-শব্দবাচ্য।

১১। ইন্দ্রপ্রাণাধিকরণ — প্রাণ-শব্দে ব্রহ্মই উদ্দিষ্ট। ইন্দ্রের উপদেশে পরব্রহ্ম প্রাণ-শব্দবাচ্য।

প্রথম অধ্যায়। দ্বিতীয় পাদ।

১২। সর্বত্র প্রসিদ্ধ্যধিকরণ — ব্রহ্মই বিজ্ঞানময় পরমাত্মা।

পরমাত্মার সহিত জীবের পার্থক্য বর্ণিত। ব্রহ্মের সর্বত্র উপাস্যত্ব।

১৩। অত্ত্রাধিকরণ—ব্রহ্ম সংহারক ও ভোক্তা। হৃদয়গুহায় অবস্থিত পরমাত্মাই চরাচর জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা।

১৪। অন্তরাধিকরণ— অক্ষিস্থ পুরুষ পরমাত্মাই। ইন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠিত ও উহাদের নিয়ন্তা পরব্রহ্মই বটে।

১৫। অন্তর্যাম্যধিকরণ— অন্তর্যামী পুরুষ ব্রহ্মই। পরব্রহ্মই অন্তর্যামী।

১৬। অদৃশ্যত্বাধিকরণ — অদৃশ্যত্ব, অক্ষরত্ব, অগ্রাহ্যত্ব গুণগুলি পরমাত্মারই।

১৭। বৈশ্বানরাধিকরণ— বৈশ্বানর শব্দের দ্বারা পরব্রহ্মকেই নির্দেশ করা হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়। তৃতীয় পাদ।

১৮। দ্যুভ্বাদ্যধিকরণ— ব্রহ্মই সর্ব-পৃথিবী, অন্তরীক্ষের আশ্রয়। তিনি মুক্তির হেতু। পরব্রহ্মেই সর্বাধিষ্ঠানভূত বিশ্ব ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত।

১৯। ভূমাধিকরণ — ব্রহ্মই ভূমা। বিপুল সুখের আধারও সর্বোত্তম ভূমা। ভূমা পরমাত্মাই বটে।

২০। অক্ষরাধিকরণ — অক্ষর পুরুষ পরব্রহ্মই। পরব্রহ্মই অক্ষর-শব্দবাচ্য।

২১। ঈক্ষতি কর্মাধিকরণ— ব্রহ্মই ধ্যান-দর্শনের বিষয়। প্রণব পরব্রহ্মেরই বাচক।

২২। দহরাধিকরণ— ব্রহ্মই হৃৎপুণ্ডরীকস্থিত দহর-আকাশ। দহর-আকাশ পরব্রহ্মেরই বটে।

২৩। প্রমিতাধিকরণ — অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষ পরব্রহ্মই। পরব্রহ্ম অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র পুরুষ-শব্দবাচ্য।

২৪। দেবতাধিকরণ— দেবগণেরও ব্রহ্ম উপাস্য। দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার-নির্ণয়।

২৫। মধ্বধিকরণ — মধুবিদ্যার অধিকারী দেবতারা হইতে পারেন কিনা বিচার।

২৬। অপশূদ্রাধিকরণ— শূদ্রের বেদাধিকার আছে কিনা। শূদ্রগণের বেদাধিকার বিচার এবং শ্রুতিতে ব্যবহৃত "শূদ্র" শব্দের

প্রকৃত অর্থ-নির্ণয়।

২৭। অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাধিকরণ — পরব্রহ্মে বিশ্ব ওতঃপ্রোত থাকিলেও পরব্রহ্ম বিশ্ব হইতে ভিন্ন।

প্রথম অধ্যায়। চতুর্থ পাদ।

২৮। আনুমানিকাধিকরণ — কঠ-বর্ণিত অব্যক্ত-শব্দে সাংখ্যকথিত প্রধান নহে, রথস্বরূপ বিন্যস্ত-শরীর বুঝায়। মুখ্যার্থ কারণ- শরীরই অব্যক্ত।

২৯। চমসাধিকরণ — শ্বেতাশ্বতর কথিত অজানন্দ সাংখ্যের প্রকৃতি নহে, উহা ব্রহ্মের শক্তির দ্যোতক।

শ্রুত্যুক্ত "অজা" প্রধানবাচক নহে ইহা ব্রহ্মশক্তির বাচক।

৩০। সাংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণ — বৃহদারণ্যক-কথিত পঞ্চ-পঞ্চ শব্দে সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বুঝায় না। উহা প্রাণাদি-প্রসিদ্ধ পঞ্চ-পদার্থকে বুঝায়।

৩১। কারণত্বাধিকরণ — ব্রহ্মই বিশ্বের একমাত্র হেতু। পরব্রহ্মই পরম কারণ।

৩২। জগদ্বাচিত্বাধিকরণ — জগৎরূপ কর্ম কথিত হওয়ায় কৌষিতকী বাচ্য পুরুষ পরব্রহ্মই। পরব্রহ্মেরই কৃৎস্নজগৎকর্তৃত্ব।

৩৩। বাক্যান্বয়াধিকরণ — ব্রহ্মই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য। বৃহদারণ্যক-শ্রুতির মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে উক্ত আত্মা-পরমাত্মাই।

৩৪। প্রকৃত্যধিকরণ — ব্রহ্মই বিশ্বের একমাত্র নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ।

৩৫। সর্বব্যাখ্যানাধিকরণ — শ্রুতিতে ব্যবহৃত রুদ্র শিব প্রভৃতি সর্বই ব্রহ্মকে বুঝায়। সমুদয় বেদান্ত ব্রহ্মপর।

দ্বিতীয় অধ্যায়। প্রথম পাদ।

৩৬। স্মৃত্যধিকরণ — নিরীশ্বর সাংখ্যমত খণ্ডন।

৩৭। যোগ-প্রত্যুক্ত্যধিকরণ — পতঞ্জলির বেদান্তবিরুদ্ধ যোগ-দর্শনেরও খণ্ডন।

৩৮। বিলক্ষণত্বাধিকরণ — কপিল ও পতঞ্জলি প্রভৃতির শাস্ত্র, ভ্রম, প্রমাদ, বঞ্চনেচ্ছা ও ইন্দ্রিয়ের অপটুতা-যুক্ত জীববিশেষ-কর্তৃক

রচিত। কিন্তু বেদশাস্ত্র অপৌরুষেয়, নিত্য ও ভ্রমাদি দোষরহিত বলিয়া তাহার বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য আছে।

৩৯। অভিমানি-ব্যপদেশাধিকরণ — তেজ জল ও প্রাণাদির অভিমানী-চেতন-দেবতারূপে পরব্রহ্মই, কারণ হওয়ায় বেদের কুত্রাপি অপ্রামাণ্য নাই।

৪০। দৃশ্যতেঽধিকরণ — ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়ের মধ্যে বিরূপতা থাকিলেও ব্রহ্মই জগৎকারণ ইহা সুনিশ্চিত।

৪১। অসদিত্যধিকরণ — শক্তিমান উপাদান ব্রহ্ম হইতে উপাদেয় জগতে উৎপত্তিতে শক্তিমানের শক্তির পরিণতিই প্রকাশ পায়।

৪২। শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণ — বেদ-বিরোধী গৌতম ও কণাদাদির স্মৃতির খণ্ডন।

৪৩। ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণ — ভোক্তৃভোগ্য পরমাত্মায় অবিরোধ।

৪৪। আরম্ভণাধিকরণ — উপাদানভূত-ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত জগৎকে জানিতে পারা যায়। যেমন, মৃৎপিণ্ডকে জানিলেই সেই উপাদান হইতে উদ্ভূত ঘটাদি পদার্থকে জানিতে পারা যায়।

৪৫। ইতরব্যপদেশাধিকরণ — জীব-কর্তৃত্ববাদ খণ্ডিত হইয়াছে।

৪৬। উপসংহার-দর্শনাধিকরণ — ব্রহ্মে অচিন্ত্য শক্তিমত্ত্বা প্রযুক্ত। তাঁহাতে কিছুই অসম্ভব নহে।

৪৭। কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণ —ব্রহ্ম কর্তৃত্ববাদী উপাদেয় এবং তাহাই প্রমাণসিদ্ধ।

৪৮। প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণ — আপ্তকাম ব্রহ্মের প্রয়োজন বিনা জগৎকারকত্ব।

৪৯। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাধিকরণ — ভগবান্ বা ব্রহ্ম কল্পতরু-স্বভাব। ভক্তবৎসল হইলেও বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য তাঁহাতে স্পর্শে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়। দ্বিতীয় পাদ।

৫০। রচনানুপপত্ত্যধিকরণ — জড়া প্রকৃতি বিচিত্র জগতের উপাদান-কারণ বা নিমিত্ত-কারণ হইতে পারে না। সাংখ্যানুমত প্রধানের জগৎ-কারণত্ব খণ্ডন।

৫১। মহদ্দীর্ঘাধিকরণ — ন্যায়-বৈশেষিকের অখণ্ড-বাদ খণ্ডিত হইয়াছে। বৈশেষিকের পরমাণুবাদ খণ্ডন।

৫২। সমুদায়াধিকরণ — বৌদ্ধমত খণ্ডন পাওয়া যায়।

৫৩। উপলব্ধ্যধিকরণ — বিজ্ঞানবাদী যোগাচার কর্তৃক বৌদ্ধমত খণ্ডন।

৫৪। সর্বথানুহপপত্ত্যধিকরণ — সর্বশূন্যবাদীদের মত খণ্ডন।

৫৫। একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণ — জৈন মত খণ্ডন।

৫৬। পশুপত্যধিকরণ — পাশুপত, শৈব, গাণপত্য ও সৌরমত খণ্ডন।

৫৭। উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণ — শক্তিমত খণ্ডন।

দ্বিতীয় অধ্যায়। তৃতীয় পাদ।

৫৮। বিয়দধিকরণ — ব্রহ্ম হইতেই আকাশের উৎপত্তি।

৫৯। তেজোহধিকরণ — বায়ু হইতে অগ্নি উৎপত্তি। বায়ু উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতে। ব্রহ্মতত্ত্ব কিছু হইতে উৎপত্তি নহে।

৬০। আত্মাধিকরণ — আত্মার নিত্যত্ব স্থাপন।

৬১। জ্ঞাধিকরণ — জীবাত্মা জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞাত।

৬২। কর্ত্রধিকরণ — জীবের কর্তৃত্ব প্রতিপাদন।

৬৩। পরায়ত্তাধিকরণ — জীবের কর্তৃত্ব ভগবান্ হইতে প্রাপ্ত।

৬৪। অংশাধিকরণ — জীবের ব্রহ্মাংশত্ব প্রতিপাদন।

দ্বিতীয় অধ্যায়। চতুর্থ পাদ।

৬৫। প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণ — প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বর্গ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন।

৬৬। সপ্তগত্যধিকরণ — সাতটি প্রাণ সবই ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত।

৬৭। প্রাণাণুত্বাধিকরণ — একাদশ প্রাণ সবই অনু পরিমাণ।

৬৮। বায়ুক্রিয়াধিকরণ — মুখ্যপ্রাণ বায়ু নহে। স্পন্দন ক্রিয়াস্বরূপ নহে। উহা জীবের উপকরণ প্রধান সহায়ক।

৬৯। শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণ — মুখ্য প্রাণ ও আকাশাদি ভূতের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন।

৭০। জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানাধিকরণ — জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মের পরিচালনায় প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের কার্যশীলতা।

৭১। ইন্দ্রিয়াধিকরণ — মুখ্যপ্রাণ ইন্দ্রিয়গণ হইতে পৃথক্।

৭২। সংজ্ঞা-মূর্ত্তি ক্৯প্ত্যধিকরণ — প্রপঞ্চের নাম রূপে অভিব্যক্ত পরব্রহ্মের সংকল্পবশতঃ সংঘটিত।

তৃতীয় অধ্যায়। প্রথম পাদ।

৭৩। তদন্তর-প্রতিপত্ত্যধিকরণ — জীবের দেহান্তর ঘটে সূক্ষ্ম ভূতগণ সঙ্গে।

৭৪। কৃতাত্যয়াধিকরণ — ভুক্তকর্মের অবশেষের সহিত জীব প্রত্যাবর্তন করে।

৭৫। অ-নিষ্টাদিকার্যাধিকরণ — পাপী ব্যক্তিদের যমপুরে গমন হয়। তথায় যমদণ্ড গ্রহণের পর পুনঃ মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে।

৭৬। স্বাভাব্যাপত্ত্যধিকরণ — জীবের আকাশাদিভাবে সাদৃশ্য-প্রাপ্তিই সুসংগত।

৭৭। নাতিচিরাধিকরণ — আকাশাদি সৃষ্টি পর্যন্ত পূর্ব পূর্ব সাদৃশ্য প্রাপ্তির পর পরসাদৃশ্যপ্রাপ্তি শীঘ্র হইয়া যায়।

৭৮। অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণ — চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগত জীবের ব্রীহ্যাদি দেহের সংশ্লেষমাত্র হয়।

তৃতীয় অধ্যায়। দ্বিতীয় পদ।

৭৯। সন্ধ্যাধিকরণ — স্বপ্নসৃষ্টির মিথ্যাত্ব কথন।

৮০। তদভাবাধিকরণ — সুষুপ্তিস্থানই হৃদয়স্থ ব্রহ্মস্থান।

৮১। কর্মাণুস্মৃতি শব্দবিধ্যধিকরণ — সুষুপ্ত পুরুষই জাগরিত হয়। অন্য পুরুষ নহে।

৮২। মুগ্ধাধিকরণ — মূর্চ্ছাবস্থা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত্যবস্থা হইতে ভিন্ন।

৮৩। উভয়লিঙ্গাধিকরণ — পরব্রহ্ম উপাধি-দোষ-গুণ সংস্পর্শশূন্য।

৮৪। অহিকুণ্ডলাধিকরণ — সবিশেষ-নির্বিশেষভাব ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে অভেদ।

৮৫। পরাধিকরণ — স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন হইলেও উপাসনার জন্য তাঁহার পরিচ্ছিন্নতা।

৮৬। ফলাধিকরণ — কর্মফলোৎপত্তির প্রতি ভগবানের কর্তৃত্ব।

তৃতীয় অধ্যায়। তৃতীয় পাদ।

৮৭। সর্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণ — সমুদায় বেদান্তে ব্রহ্মই একমাত্র উপাস্য বলিয়া নির্ণীত।

৮৮। উপসংহারাধিকরণ — উপাসনায় অন্যত্র উক্ত গুণ বা কর্ম সমুদায় উপাস্য ভগবানে উপসংহার করিয়া তাহাকে এক অদ্বিতীয় তত্ত্বজ্ঞানে উপাসনা কর্তব্য।

৮৯। প্রকরণ ভেদাধিকরণ — স্বনিষ্ঠ ভক্তের পক্ষে গুণোপসংহার কর্তব্য, একনিষ্ঠের পক্ষে নহে।

৯০। সংজ্ঞাতোঽধিকরণ — ভগবানের সমুদায় মূর্তি বিভু বলিয়া যে- ভক্ত যে-রসে রসিক, তিনি তাঁহাতে সেই রসই উপভোগ করেন।

৯১। সর্বাভেদাধিকরণ — লীলা, ধাম, পরিকর, প্রভৃতি সমুদায় স্বরূপ হইতে অভেদ।

৯২। আনন্দাদ্যধিকরণ — আনন্দত্ব, সত্যত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মগুণ সমুদায় উপাসনায় উপসংহার কর্তব্য।

৯৩। কার্যাখ্যানাধিকরণ — সমুদায় ভাবই ভগবানের গোচর।

৯৪। সমানাধিকরণ — ভগবানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সকলই সাচ্চদানন্দময়।

৯৫। সম্বন্ধাধিকরণ — ব্রহ্মভাবাবিষ্ট গুরুতে ব্রহ্মগুণোপসংহার কর্তব্য।

৯৬। বেধাদ্যধিকরণ — প্রাণীগণের ক্লেশকর গুণ উপসংহার করা হইবে না।

৯৭। হান্যধিকরণ — ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর শাস্ত্রালোচনা ইচ্ছাধীন।

৯৮। ছন্দতোঽধিকরণ — মাধুর্যজ্ঞানে ও ঐশ্বর্যজ্ঞানে উপাসনায় বিরোধ নাই।

৯৯। উপপন্নাধিকরণ — রাগানুগা-ভক্ত ভগবানের জন্যই তাঁহার ভজনা করেন।

১০০। অনিয়মাধিকরণ — ধ্যান, জপ, ভজন, প্রভৃতির একটি করিলেই যথেষ্ট।

১০১। অক্ষরধ্যধিকরণ — অক্ষরসম্বন্ধী অস্থূলত্বাদি সমুদায় গুণের উপসংহার কর্তব্য।

১০২। অন্তরত্বাধিকরণ — ভক্তের পরিতৃপ্তির জন্য ভগবান্ স্বরূপ হইতে ধাম, পরিকর ও লীলা প্রকাশ করেন।

১০৩। সত্যাধিকরণ — পরাশক্তি ভগবানের স্বরূপ হইতে অভিন্ন।

১০৪। কামাদ্যধিকরণ — আনন্দানুভবের জন্য ভগবান্ নিজ

হ্লাদিনী শক্তি মূর্তিমতীরূপে প্রকটিত করেন।

১০৫। তন্নির্ধারণানিয়মাধিকরণ — রাম-কৃষ্ণাদি মধ্যে কে পরব্রহ্ম, কে নহে, তাহার কোন নিয়ম নাই।

১০৬। প্রদানাধিকরণ — গুরু ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মবিদ্যা দান করিতে পারেন।

১০৭। পূর্ববিকল্পাধিকরণ — সোঽহং জ্ঞানে উপাসনা ভক্তি-মার্গীয় উপাসনার প্রকারভেদ মাত্র।

১০৮। বিদ্যাধিকরণ — জ্ঞানপূর্বিকা ভক্তি পরমপদ লাভের উপায়।

১০৯। অনুবন্ধাধিকরণ — সাধুসেবা, ভক্তসঙ্গ, তীর্থসেবা, প্রভৃতি আনুষঙ্গিক উপায়।

১১০। প্রজ্ঞান্তরাধিকরণ — ভগবানের উপাসনা মার্গের বিভিন্নতা-হেতু প্রাপ্তিও বিভিন্ন।

১১১। পরত্বাধিকরণ — ভগবানের কৃপা অহৈতুকী হয় না, সাধকের প্রচেষ্টাও হেতু।

১১২। শরীরে ভাবাধিকরণ — শরীরের মধ্যে পরমাত্মার উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা।

১১৩। তদ্ভাবভাবিত্বাধিকরণ — যে যেভাবে ভগবানের উপাসনা করে সে সেইভাবেই প্রাপ্ত হয়।

১১৪। ভূমজ্যায়স্ত্বধিকরণ — বহুত্ব, সর্বব্যাপিত্ব, সর্বাত্মকত্ব, প্রভৃতি ভূমার গুণসমুদায় উপাসনায় উপসংহরণীয়।

১১৫। শব্দাদিভেদাধিকরণ — সাধকের অধিকার অনুসারে উপাসনা বহু প্রকার।

১১৬। বিকল্পাধিকরণ — মন্ত্র বীজ প্রভৃতি, একনিষ্ঠতা প্রয়োজন।

১১৭। কাম্যাধিকরণ — কাম্য উপাসনায় ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা করিতে পারা যায়।

১১৮। যথাশ্রয়-ভাবাধিকরণ — যে অঙ্গে যে ভাব উপযোগী, সেই অঙ্গে সেই ভাব চিন্তনই বিধেয়।

তৃতীয় অধ্যায়। চতুর্থ পাদ।

১১৯। পুরুষার্থাধিকরণ — একমাত্র বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে।

১২০। কামকারাধিকরণ — ভগবত-তত্ত্বজ্ঞানী বা ভক্ত, শাস্ত্র-

বিহিত কর্মাচরণ করুন বা না করুন তাহাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই।

১২১। পারিপ্লবাধিকরণ — উপনিষদোক্ত আখ্যানসকল বিদ্যার প্রকাশক।

১২২। সর্বাপেক্ষাধিকরণ — যজ্ঞাদি শ্রুত্যুক্ত কর্ম উপায়স্বরূপ মাত্রে প্রয়োজনীয়।

১২৩। সর্বান্নানুমত্যাধিকরণ — সকলের অন্ন-ভক্ষণের অনুমতি কেবলমাত্র অন্ন বিনা প্রাণ যাইবার উপক্রমের ক্ষেত্রেই।

১২৪। বিহিতত্বাধিকরণ — বিদ্যাবৃদ্ধির জন্য এবং আনন্দের উৎকর্ষের জন্য বিদ্বানের পক্ষেও কর্মের বিধান আছে।

১২৫। সর্বথাধিকরণ — যদি ভগবদ্ধর্ম পালন করিয়া অবসর থাকে তাহা হইলে আশ্রমধর্ম গৌণভাবে পালন করা প্রয়োজন।

১২৬। বিধুরাধিকরণ — নিরপেক্ষ সাধক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এত মহান যে, ভগবান্‌ও তাঁহাদের চরণরেণু প্রার্থনা করেন।

১২৭। ইতবাধিকরণ — অধিকারী অনুসারে নিরাশ্রমী আশ্রমী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

১২৮। স্বাম্যধিকরণ — শ্রীভগবান্‌ই ভক্তগণের সমুদায় অভাব পূরণ করিয়া থাকেন।

১২৯। সহকার্যন্তরবিধ্যধিকরণ — কর্ম অনাসক্ত ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া ঈশ্বরে অর্পিত হইলে নৈষ্কর্মসিদ্ধির কারণ হয়। সুতরাং ভগবদুপাসনাও নৈষ্কর্ম্য বলিয়া অভিহিত হইবে।

১৩০। কৃৎস্নভাবাধিকরণ — গার্হস্থ ধর্মে সকল প্রকার ধর্ম থাকাতে উহার বর্ণনা করিয়া উপনিষদের উপসংহার করার কোন প্রকার বিরোধের কারণ নাই।

১৩১। অনাবিষ্কারাধিকরণ — অধিগতবিদ্য-ব্যক্তি আপনার মহিমা লোকসমক্ষে প্রকাশ না করিয়া বালকের ন্যায় কপটহীন হইয়া কালযাপন করিবেন।

১৩২। ঐহিকাধিকরণ — প্রতিবন্ধকের অভাবে ইহজন্মেই বিদ্যাফলোৎপত্তির সম্ভাবনা কথন।

১৩৩। মুক্তিফলাধিকরণ — মুক্তির ফল ভক্তি রসানুভব। এই ভক্তিরসানুভবরূপ পূর্ণ মুক্তির ফলোৎপত্তির কোন নিয়ম নাই। ইহা ভগবদ্-ইচ্ছানুসারেই হইয়া থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়। প্রথম পাদ।

১৩৪। অবৃত্ত্যধিকরণ — উপাসনায় বারংবার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন।

১৩৫। আত্মত্বোপাসনাধিকরণ — আত্মভাবে ব্রহ্মোপসনার কর্তব্যতা বিধান।

১৩৬। প্রতীকাধিকরণ — প্রতীকোপসানায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরমাত্মার উপাসনা হয় না।

১৩৭। ব্রহ্মদৃষ্ট্যধিকরণ — সমুদায় ব্রহ্মভাব স্থাপন-পূর্বক উপাসনাই সঙ্গত।

১৩৮। আদিত্যাদিমত্যধিকরণ — ভগবানের যথাযোগ্য অঙ্গে আদিত্যাদি চিন্তার সঙ্গতি ও কর্তব্যতা প্রদর্শন।

১৩৯। আসীনাধিকরণ — আসীন হইয়া উপাসনা কর্তব্য।

১৪০। আপ্রয়াণাধিকরণ— মৃত্যুকাল পর্যন্ত উপাসনার প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন।

১৪১। তদধিগমাধিকরণ — বিদ্যালাভে পূর্বতন পাপের বিনাশ, পরভবিক পুণ্যের বিনাশ ও অসংস্পর্শ প্রতিপাদন।

১৪২। ইতরাধিকরণ — বিদ্যালাভে পূর্বতন ও পরভবিক পুণ্যের বিনাশ ও অসংস্পর্শ প্রতিপাদন।

১৪৩। অনারব্ধকার্যাধিকরণ — বিদ্যালাভে প্রারব্ধ ভিন্ন অন্য সমস্ত কর্মের ক্ষয় প্রতিপাদন।

১৪৪। অগ্নিহোত্রাদ্যধিকরণ — অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্মের করণীয়ত্ব প্রতিপাদন।

১৪৫। ইতরক্ষপণাধিকরণ — ফলদ্বারা প্রারব্ধফলক পুণ্যপাপের ক্ষয় প্রতিপাদন।

চতুর্থ অধ্যায়। দ্বিতীয় পাদ।

১৪৬। বাগধিকরণ — মৃত্যুকালে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের মনে লয় প্রাপ্তি কথন।

১৪৭। মনোঽধিকরণ — মৃত্যুকালে সমুদায় ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের প্রাণে লয়প্রাপ্তি।

১৪৮। অধ্যক্ষাধিকরণ — ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত প্রাণের জীবের অনুগমন।

১৪৯। ভূতাধিকরণ — প্রাণ সমন্বিত জীবের ভূতসম্বন্ধ কথন।

১৫০। আমৃত্যুপক্রমাধিকরণ — অর্চিরাদি মার্গ-গমনের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের উৎক্রান্তির একরূপত্ব কথন।

১৫১। পরসম্পত্ত্যধিকরণ — বিদ্বান্ ব্যক্তির দেহবীজ পঞ্চভূত ইন্দ্রিয় প্রাণ প্রভৃতির পরমাত্মায় লয় কথন।

১৫২। অবিভাগাধিকরণ — ভূতপঞ্চাদির পরমাত্মায় অবিভাগাবস্থান নিরূপণ।

১৫৩। তদোকোঽধিকরণ — বিদ্বানের উৎক্রান্তির বিশেষত্ব।

১৫৪। রশ্ম্যনুসারাধিকরণ — সূর্যরশ্মি অবলম্বনে বিদ্বানের ঊর্ধ্বগতি নিরূপণ।

১৫৫। নিশাধিকরণ — বিদ্বানের রাত্রিতে মৃত্যু হইলেও সূর্যরশ্মি সম্বন্ধ উপপাদন।

১৫৬। দক্ষিণায়নাধিকরণ — দক্ষিণায়নে মৃত বিদ্বানের ব্রহ্মপ্রাপ্তি কথন।

চতুর্থ অধ্যায়। তৃতীয় পাদ।

১৫৭। অর্চিরাদ্যধিকরণ — মৃত্যুর পর বিদ্বানের দেবযান মার্গে গমন নিরূপণ।

১৫৮। বায়্বধিকরণ — বায়ুলোকের অবস্থান নির্ণয়।

১৫৯। তড়িতোঽধিকরণ — বরুণলোকের অবস্থান নিরূপণ।

১৬০। অতিবাহিকাধিকরণ — দেবযান পিতৃযান শব্দগুলির দ্বারা তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বুঝাইবে। দিবারাত্রি ইত্যাদি পথপ্রদর্শক পূর্বপুরুষ।

১৬১। কার্যাধিকরণ — প্রতীকোপাসক ভিন্ন সগুণ বা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি কথন। তত্ত্বতঃ কালবাচক ইহাদিগকে আতিবাহিক পুরুষ বলে।

চতুর্থ অধ্যায়। চতুর্থ পাদ।

১৬২। সম্পদ্যাবির্ভাবাধিকরণ — বিদ্যালাভে স্বরূপাভিব্যক্তি প্রতিপাদন।

১৬৩। অবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণ — মুক্ত পুরুষের অভিন্নরূপে ব্রহ্মানুভূতি প্রতিপাদন।

১৬৪। ব্রাহ্মাধিকরণ — মুক্তপুরুষের পরব্রহ্মের ন্যায় চিৎস্বরূপত্ব অপহতপাপ্‌মত্বাদি গুণাবির্ভাব কথন।

১৬৫। সংকল্পাধিকরণ — মুক্তপুরুষের সংকল্পমাত্রই সিদ্ধি ও প্রাপ্তি কথন।

১৬৬। অভাবাধিকরণ — মুক্ত পুরুষের দেহভাব প্রাপ্তির সদ্‌ভাব ও অসদ্‌ভাব, তাঁহার সংকল্পমাত্রেই হয়।

১৬৭। জগদ্‌ব্যাপারবর্জাধিকরণ — মুক্তপুরুষের জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি- লয় প্রভৃতি ঈশ্বরীয় কার্য ভিন্ন অন্য ব্যাপারে ব্রহ্মসাম্যনিরূপণ।

পরিশিষ্ট - ২

বিহঙ্গম দৃষ্টিতে ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব।

১/১/১ "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। পূর্ব-মীমাংসায় ধর্মজিজ্ঞাসা উত্তর মীমাংসায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, সন্ন্যাসীগোষ্ঠী বলেন এই দুইটিতে কোন সম্পর্ক নাই। মুমুক্ষুত্ব জাগিলেই বেদান্তে প্রবেশ। বৈষ্ণবগোষ্ঠী বলেন, দুইটি নহে, একটিই গ্রন্থ। পূর্ব-মীমাংসার পর উত্তর-মীমাংসায় প্রবেশাধিকার।

১/১/২ "জন্মাদ্যস্য যতঃ।" এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লযের কর্তা ব্রহ্মা। ইহা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ।

১/১/৩ "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।" ব্রহ্ম হইতে শাস্ত্র। শাস্ত্র হইতেই ব্রহ্মের কর্তা জ্ঞাতব্য।

১/১/৪ "তত্তু সমন্বয়াৎ।" শ্রুতি বাক্যে একটি অপূর্ব সমন্বয় আছে।

১/১/৫ সাংখ্যের প্রকৃতি জগৎকারণ নহে। অবৈদিকত্ব হেতু। ৬-১১ সূত্র সমর্থক।

১/১/১০ ব্রহ্ম আনন্দঘন। ইহা ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। ১৩-২১ সমর্থক।

১/১/১২ আকাশপদে ব্রহ্মই বুঝাইবে।

১/২/১ শ্রুতিশাস্ত্রে সর্বত্র ব্রহ্মের ধ্যানের উপদেশ। ২-৪ সমর্থক।

১/২/৫ জীব উপাসক, উপাস্য নহে। ৬-৮ সমর্থক সূত্র।

১/২/৮ ব্রহ্ম সুখদুঃখ ভোগ করেন না, জীব করে।
১/২/৯ ব্রহ্ম চরাচর ভক্ষণ (অত্তা) করেন না। জীব ভোক্তা। ব্রহ্ম ভোগ করান। ১০-১৩ সমর্থক সূত্র।
১/২/১৪ চক্ষু-অভিমানী হিরণ্যাক্ষপুরুষ ব্রহ্মই। ১৫-১৭ সমর্থক।
১/২/১৮ অন্তর্যামী, সর্বনিয়ন্ত্রণকারী ব্রহ্মই।
১/২/১৯ সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ ব্রহ্মের ধর্ম, জীবের নহে। ২০-২১ সমর্থক।
১/২/২২ বৈশ্বানর পদে ব্রহ্মই লক্ষ। ২৩-২৭ সমর্থক সূত্র।
১/৩/১ নিখিল আশ্রয়ের আশ্রয় ব্রহ্ম। আধারশক্তি জীব নহে।
১/৩/২ ব্রহ্মদর্শনে সকল গ্রন্থি ছিন্ন হয়। মুক্তিলাভ হয়। ৩-৭ সমর্থক।
১/৩/৮ ভূমা পদে ব্রহ্মাই ভূমা অমৃত। ৯ সূত্র সমর্থক।
১/৩/১০ অক্ষর শব্দে ব্রহ্মই। ১১-১২ সমর্থক
১/৩/১৩ পর ও অপর ব্রহ্ম ওঙ্কারই।
১/৩/১৪ দহরাকাশ ব্রহ্মই। ১৫-১৮ সমর্থক। দহর জীব নহে। ১৯-২১ সমর্থক।
১/৩/২২ ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। ২৩-২৪ সমর্থক।
১/৩/২৫ হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ পুরুষ ব্রহ্মই।
১/৪/১৯ "আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" আত্মা পদে ব্রহ্ম।
১/৪/২৪ "অভিধ্যোপপদেশাৎ।" ব্রহ্মের সংকল্পও বহু হইতে। ইচ্ছা হইতে সৃষ্টি। সুতরাং ব্রহ্ম সৃষ্টির উপাদান, ও নিমিত্ত কারণ দুইই।
১/৪/২৬ "আত্মকৃতেঃ" "পরিণামাৎ"। নিজেকে নিজে জগদ্রূপে পরিণত করিয়াছেন।
২/১/৮ জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও জগদাতীত।
২/৩/১৩ কোন প্রয়োজন নাই তবু সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি তাঁহার লীলা মাত্র।
২/৩/১ ব্রহ্ম হইতে আকাশের উৎপত্তি।
৩/২/১১ ব্রহ্ম সবিশেষ কি নির্বিশেষ। সন্ন্যাসীগোষ্ঠী বলেন, ব্রহ্ম সর্বত্রই নির্বিশেষ। সবিশেষ-বোধক শ্রুতি ব্যাবহারিক। বৈষ্ণবগোষ্ঠী বলেন, ব্রহ্ম সর্বত্রই সবিশেষ। অরূপ প্রভৃতি শব্দ রূপের অভাববোধক নহে, অপ্রাকৃত

রূপবিশিষ্ট। ১২-২৫ চৌদ্দটি সূত্র গৌণ-সমর্থক-সূত্র।
৩/২/২৩ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন বলিয়া অব্যক্ত।
৩/২/২৪ আরাধনায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। সাক্ষাৎকারে উপলব্ধি।
৩/২/২৬ ব্রহ্ম হইতে উৎকৃষ্ট আর কোন তত্ত্ব নাই।
চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মতত্ত্ব কিছু নাই। উপাসনা ও মৃত্যুর পরে জীবের গতি বিষয়ে আলোচনা।

পরিশিষ্ট - ৩

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে যাবতীয় অবৈদিক মত খণ্ডন।

২/১/২-১০ সাংখ্যের প্রধান কারণবাদ খণ্ডন।
২/১/১১-১৭ বৈশেষিকের পরমাণুকারণবাদ খণ্ডন।
২/১/১৮-৩২ বৌদ্ধমত খণ্ডন।
২/১/৩৩-৩৬ দিগম্বর জৈনমত খণ্ডন।
২/১/৩৭-৪১ সেশ্বর সাংখ্যমত ও পাশুপতমত খণ্ডন।
২/১/৪২-৪৫ ভাগবত মতের আলোচনা— সন্ন্যাসী-গোষ্ঠীর মতে ভাগবত মত খণ্ডন ; বৈষ্ণব-গোষ্ঠীর মতে ভাগবত মতের মণ্ডন বা দৃঢ়প্রতিষ্ঠা।

পরিশিষ্ট-৪

বেদান্ত সাহিত্যের আচার্যগণ ও তাঁহাদের অবদান

ব্রহ্মসূত্রে সূত্রকার বাদরায়ণ যে সকল আচার্যগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহারা— আচার্য বাদরি (বৈদান্তিক), আচার্য কার্ষ্ণাজিনি (বৈদান্তিক), আচার্য আত্রেয় (পূর্বমীমাংসক), আচার্য ঔড়ুলোমি (ভেদাভেদবাদী), বৈদান্তিক আচার্য আশ্মরথ্য (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী), আচার্য কাশকৃৎস্ন (অদ্বৈতবাদী) ও আচার্য জৈমিনি (পূর্বমীমাংসক)। আচার্যগণের মধ্যে জৈমিনি ব্যতীত সকলেই সূত্রকারের পূর্ববর্তী।

ব্রহ্মসূত্রের আদিভাষ্যকার আচার্য শঙ্করের কাল আমাদের প্রাচীনমতে সপ্তম শতাব্দীতে (খ্রীঃ ৬৮৮-৭২০) ও আধুনিক মতে খ্রীঃ ৭৮৮-৮২০। শঙ্কর দুইজন পূর্বাচার্যের নাম করিয়াছেন— ভর্তৃহরি (খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীর প্রথম ভাগ), ইনি ব্রহ্মসূত্রের একটি টীকা করেন। এবং ভর্তৃপ্রপঞ্চ আর একজনের নাম ইঙ্গিত করিয়াছেন ইনি খুব সম্ভব পাণিনির গুরু বর্ষের ভ্রাতা উপবর্ষ বা বোধায়ন।

আচার্য	শতাব্দী	গোষ্ঠী	অবদান
আচার্য গৌড়পাদ	৭ম	সন্ন্যাসী	মাণ্ডুক্যোপনিষৎ কারিকা
গোবিন্দপাদাচার্য	৭ম	,,	অদ্বৈতানুভূতি
শ্রীশঙ্করাচার্য	৭ম	,,	শারীরকভাষ্য, গীতা-উপনিষদ্‌ভাষ্য
আচার্য পদ্মপাদ	৭ম	,,	ভাষ্যবার্তিক 'পঞ্চপদিকা'
সুরেশ্বরাচার্য (মণ্ডন মিশ্র)	৭ম	,,	ব্রহ্মসিদ্ধি, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি
সর্বজ্ঞাত্মমুনি	৮ম-৯ম	সন্ন্যাসী	সংক্ষেপ-শারীরক-ভাষ্য
শ্রীভাস্করাচার্য	৯ম-১০ম	বৈষ্ণব*	ভাস্করীয়ভাষ্য
আচার্য বাচস্পতি মিশ্র	৯ম	সন্ন্যাসী	ভামতী, ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষা
যমুনাচার্য	১০ম-১১শ	বৈষ্ণব §	সিদ্ধিত্রয়ম্‌, গীতার্থসংগ্রহ
অভিনব গুপ্তাচার্য	১১শ	শৈব	গীতার্থসংগ্রহ, শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাবাদ
নিম্বার্কাচার্য	১১শ	বৈষ্ণব*	বেদান্তপারিজাতসৌরভ-ভাষ্য
আচার্য শ্রীনিবাস	১১শ	,,	বেদান্তকৌস্তভ টীকা
আচার্য কেশব ভট্ট	১১শ	,,	কৌস্তভপ্রভা
আচার্য শ্রীযাদবপ্রকাশ	১১শ	,,	যতিধর্মসমুচ্চয়, বৈজয়ন্তী
শ্রীরামানুজাচার্য	১১শ	বৈষ্ণব §	শ্রীভাষ্য, বেদান্তসংগ্রহ
শ্রীকৃষ্ণমিশ্র যতি	১১শ	সন্ন্যাসী	প্রবোধচন্দ্রোদয়
প্রকাশাত্ম যতি	১১শ-১২শ	,,	পঞ্চপদিকাবিবরণ

বৈষ্ণব§ = শ্রী (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ), বৈষ্ণব° = ব্রহ্ম (দ্বৈতবাদ), বৈষ্ণব□ = রুদ্র (শুদ্ধাদ্বৈত বা শুদ্ধদ্বৈতবাদ), বৈষ্ণব* = সনকাদি (দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদ), বৈষ্ণব◊ = গৌড়ীয় (অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ)

আচার্য	শতাব্দী	গোষ্ঠী	অবদান
শ্রীমৎ অঘোর শিবাচার্য	১১শ-১২শ	সন্ন্যাসী	মৃগেন্দ্রসংহিতার ব্যাখ্যা
শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য	১২শ	বৈষ্ণব*	বেদান্তরত্ন-মঞ্জুষা
অদ্বৈতানন্দ বোধেন্দ্র	১২শ	সন্ন্যাসী	ব্রহ্মবিদ্যাভরণ
শ্রীহর্ষমিশ্র	১২শ	,,	খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, ঈশ্বরাভিসন্ধি
আনন্দবোধ ভট্টারকাচার্য	১২শ	,,	ন্যায়মকরন্দ, প্রমাণমালা
শ্রীমৎ দেবাচার্য	১২শ	বৈষ্ণব*	বেদান্ত-জাহ্নবী, ভক্তিরত্নাঞ্জলি
দেবরাজাচার্য	১২শ	বৈষ্ণব§	বিম্বতত্ত্বপ্রকাশিকা
শ্রীধরস্বামী	১২শ-১৩শ	বৈষ্ণব□	'সুবোধিনী' গীতাভাষ্য
শ্রীমৎ মধ্বাচার্য	১৩শ	বৈষ্ণব°	**পূর্ণপ্রজ্ঞ বা তত্ত্ববিবেকভাষ্য**
ত্রিবিক্রম আচার্য	১৩শ	,,	তত্ত্বপ্রদীপিকা টীকা
শ্রীনারায়ণ	১৩শ	,,	মণিমঞ্জরী, মাধ্ববিজয়
শ্রীপদ্মনাভাচার্য	১৩শ	,,	পদার্থসংগ্রহ, মাধ্বসিদ্ধান্তসার
আচার্য শ্রীকণ্ঠ	১৩শ-১৪শ	শৈব	**শৈবভাষ্য,** বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদ
আচার্য অমলানন্দ	১৩শ	সন্ন্যাসী	বেদান্তকল্পতরু, শাস্ত্রদর্পণ
শ্রীমৎ চিৎসুখাচার্য	১৩শ	,,	তত্ত্বপ্রদীপিকা বা চিৎসুখী
বরদার্য বা বরদাচার্য	১৩শ	বৈষ্ণব§	তত্ত্বনির্ণয় বা তত্ত্বসার
সুদর্শন ব্যাস ভট্টাচার্য	১৩শ	,,	শ্রুতিপ্রকাশিকা (শ্রীভাষ্যটীকা)
বরদাচার্য বা নড়াড়ুরম্মল	১৩শ	,,	তত্ত্বসার, সারার্থচতুষ্টয়
শ্রীবীর রাঘবদাসাচার্য	১৩শ	,,	রত্নপ্রসারিণী
গৌড় পূর্ণানন্দ কবি	১৩শ	,,	তত্ত্বমুক্তাবলী
রামানুজাচার্য (২য়)	১৩শ-১৪শ	,,	ন্যায়কুলশীলম্
বেঙ্কটনাথ বেদান্তাচার্য	১৩শ-১৪শ	,,	অধিকরণ-সারাবলী, শতদূষণী
শ্রীমল্লোকাচার্য	১৪শ	,,	তত্ত্বশেখর, তত্ত্বত্রয়
আচার্য বরদগুরু	১৪শ	,,	সপ্ততিরত্নমালিকা, তত্ত্বত্রয়চুলুক
আচার্য ভারতীতীর্থ	১৪শ	সন্ন্যাসী	বৈয়াসিকন্যায়মালা
আচার্য শঙ্করানন্দ	১৪শ	,,	ব্রহ্মসূত্রদীপিকা, গীতার টীকা
মাধবাচার্য বা বিদ্যারণ্য	১৪শ	,,	সর্বদর্শনসংগ্রহ, পঞ্চদশী
আচার্য আনন্দগিরি	১৪শ-১৫শ	,,	প্রস্থানত্রয়ীর শংকরভাষ্যটীকা
আচার্য প্রকাশানন্দ	১৫শ	,,	বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলী
আচার্য অখণ্ডানন্দ	১৫শ	,,	তত্ত্বদীপন
শ্রীমৎ কেশবাচার্য	১৫শ	বৈষ্ণব*	বেদান্তকৌস্তভের টীকা
শ্রীমৎ জয়তীর্থাচার্য	১৫শ	বৈষ্ণব°	তত্ত্বপ্রকাশিকা, ন্যায়সুধা
বরদানায়ক সূরি	১৫শ	বৈষ্ণব§	চিদচিদীশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ
অনন্তাচার্য বা অনন্তার্য	১৫শ	,,	ব্রহ্মলক্ষণনিরূপণ
শ্রীমৎ বল্লভাচার্য	১৬শ	বৈষ্ণব □	অনুভাষ্য, সুবোধিনী টীকা

আচার্য	শতাব্দী	গোষ্ঠী	অবদান
আচার্য বিঠ্‌ঠলনাথ	১৬শ	,,	শ্রীবিদ্বন্মণ্ডল
শ্রীসনাতন গোস্বামী	১৬শ	বৈষ্ণব ◊	বৃহদ্ভাগবতামৃত
শ্রীরূপ গোস্বামী	১৬শ	,,	ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, বৈষ্ণবতোষণী
শ্রীজীব গোস্বামী	১৬শ-১৭শ	,,	ষট্‌সন্দর্ভ, সর্বসম্বাদিনী
আচার্য মল্লনারাধ্য	১৬শ	সন্ন্যাসী	অদ্বৈতরত্ন বা অভেদরত্ন
আচার্য নৃসিংহাশ্রম	১৬শ	,,	ভাবপ্রকাশিকা টীকা
আচার্য নারায়ণাশ্রম	১৬শ	,,	অদ্বৈতদীপিকাবিবরণ
শ্রীমৎ রঙ্গরাজাধ্বরি	১৬শ	,,	অদ্বৈতবিদ্যামুকুর, বিবরণদর্পণ
আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত	১৬শ	,,	সিদ্ধান্তকৌমুদী, মনোরমা
আচার্য অপ্পয় দীক্ষিত	১৬শ	,,	পরিমল, সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ
আচার্য সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র	১৬শ	,,	অদ্বৈতবিদ্যাবিলাস
আচার্য নীলকণ্ঠ সূরী	১৬শ	,,	মহাভারতের টীকা
আচার্য সদানন্দ যোগীন্দ্র	১৬শ	,,	বেদান্তসার
আচার্য নৃসিংহ সরস্বতী	১৬শ	,,	সুবোধিনী টীকা
দোদ্দয় মহাচার্য	১৬শ	বৈষ্ণব §	শতদূষণীর টীকা
সুদর্শন গুরু	১৬শ-১৭শ	,,	মঙ্গলদীপিকা টীকা
আচার্য ব্যাসরাজ স্বামী	১৬শ	বৈষ্ণব°	ন্যায়ামৃত, তাৎপর্য-চন্দ্রিকা
সাংখ্যাচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু	১৬শ	সমন্বয়বাদী	বিজ্ঞানামৃতভাষ্য, গীতাভাষ্য
আচার্য মধুসূদন সরস্বতী	১৭শ	সন্ন্যাসী	বেদান্তকল্পলতিকা, অদ্বৈতসিদ্ধি
আচার্য ধর্মরাজ অধ্বরীন্দ্র	১৭শ	,,	বেদান্ত-পরিভাষা, তর্কচূড়ামণি
আচার্য রামতীর্থ	১৭শ	,,	বিদ্বন্মনোরঞ্জনী
আচার্য আপদেব	১৭শ	,,	বেদান্তসারের টীকা 'বালবোধিনী'
আচার্য গোবিন্দানন্দ	১৭শ	,,	ভাষ্যরত্নপ্রভা টীকা
আচার্য রামানন্দ সরস্বতী	১৭শ	,,	ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী টীকা
কাশ্মীরক সদানন্দ যতি	১৭শ	,,	অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি
আচার্য রঙ্গনাথ	১৭শ	,,	শারীরকভাষ্যব্যাখ্যাবৃত্তি
শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী	১৭শ	,,	অদ্বৈতসিদ্ধির টীকা
ব্যাস রামাচার্য	১৭শ	বৈষ্ণব °	ন্যায়ামৃততরঙ্গিণীর টীকা
শ্রীমৎ রাঘবেন্দ্র স্বামী	১৭শ	,,	বাদাবলীর টীকা, গীতাবিবৃতি
শ্রীনিবাস আচার্য (১)	১৭শ	বৈষ্ণব §	যতীন্দ্রমতদীপিকা
শ্রীনিবাস আচার্য (২)	১৭শ	,,	আনন্দতারতম্যখণ্ডন
শ্রীনিবাস আচার্য (৩)	১৭শ	,,	ওঙ্কার-বাদার্থ, তত্ত্ব-মার্তণ্ড
বুচ্চি বেঙ্কটাচার্য	১৭শ	,,	বেদান্ত-কারিকাবলী
ব্রজনাথ ভট্ট	১৭শ	বৈষ্ণব □	অণুভাষ্যের মরীচিকা বৃত্তি
আচার্য বেদেশ তীর্থ	১৮শ	বৈষ্ণব°	'তত্ত্বোদ্দ্যোত' টীকার বৃত্তি

আচার্য	শতাব্দী	গোষ্ঠী	অবদান
আচার্য শ্রীনিবাস তীর্থ	১৮শ	বৈষ্ণব^c	ন্যায়ামৃতের বৃত্তি 'ন্যায়ামৃতপ্রকাশ'
আচার্য কৃষ্ণানন্দতীর্থ	১৮শ	সন্ন্যাসী	সিদ্ধান্তলেশের কৃষ্ণালঙ্কার টীকা
আচার্য মহাদেব সরস্বতী	১৮শ	,,	তত্ত্বানুসন্ধান, অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তুভ
আচার্য আয়ন্ন দীক্ষিত	১৮শ	,,	ব্যাসতাৎপর্যনির্ণয়
আচার্য সদাশিবেন্দ্র	১৮শ	,,	অদ্বৈতরসমঞ্জরী
গোস্বামী পুরুষোত্তমজী	১৮শ	বৈষ্ণব[]	ভাষ্যপ্রকাশ, প্রস্থানরত্নাকর
শ্রীনিবাস দীক্ষিত	১৮শ	বৈষ্ণব§	বিরোধ-বরূথিনী-প্রমাথিনী
আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী	১৮শ	বৈষ্ণব◊	গীতা ও ভাগবতের টীকা
আচার্য বলদেব বিদ্যাভূষণ	১৮শ	বৈষ্ণব◊	গোবিন্দভাষ্য, সিদ্ধান্তরত্ন

আচার্য শঙ্কর হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ১২শত বৎসর বেদান্ত সাহিত্যের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাহাতে ৯খানি মাত্র মূল্যবান ভাষ্য লক্ষিত হয়। আর বাকী সব ভাষ্যানুভাষ্য বা প্রকরণ গ্রন্থাদি। ইহার পূর্ববর্তী ইতিহাস অত্যাচারীর অত্যাচারে দগ্ধীভূত। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী এই দুইশত বৎসরের ইতিহাসে কোন মৌলিক লেখা নাই, তবুও কিঞ্চিৎ ছিল বা আছে। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের পর অর্ধশতাব্দী বেদান্তশাস্ত্রে ভারতবাসীর দান শূন্য। ইহা জাতির উন্নতির পরিচায়ক তো নহেই, বরঞ্চ বিপরীতমুখী গতি পরিলক্ষিত হয়। বেদান্ত যাঁহাদের ধ্যান-জ্ঞান ছিল তাঁহাদের শতাধিক নামের মালিকা স্মরণার্থ নিবেদন করিলাম। তাঁহাদের স্মরণেও আমাদের জীবন পবিত্র হইবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল কার্য হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে স্মরণ করা হইতেছে।

বঙ্গভাষায়: রাজা রামমোহন রায়ের উপনিষদ্ বিষয়ক গ্রন্থাবলী, কালীবর বেদান্তবাগীশকৃত শারীরক ভাষ্য ও বেদান্তসারের অনুবাদ, মহেশচন্দ্র পালকৃত উপনিষৎ সমূহের বঙ্গানুবাদ, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার-কৃত গোপাল বসুমল্লিক ফেলোশিপ বক্তৃতামালা, শ্যামলাল গোস্বামীকৃত গোবিন্দভাষ্য ও সিদ্ধান্তরত্নের বঙ্গানুবাদ, কেদারনাথ ভক্তিবিনোদকৃত গৌড়ীয় মতের 'আম্নায়সূত্র', পঞ্চানন তর্করত্নকৃত ব্রহ্মসূত্রের শক্তিভাষ্য, পঞ্চদশীর অনুবাদ ও কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য কৃত উপনিষদের গল্প প্রভৃতি।

হিন্দীভাষায়: স্বামী অভিলাখদাস উদাসীকৃত অভিলাখ সাগর, ভগবানদাস নিরঞ্জনী কৃত অমৃতধারা, পরমহংস চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামীকৃত আত্মপুরাণ, তত্ত্বানুসন্ধানের ও অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তুভের অনুবাদ, আনন্দগিরি স্বামীকৃত আনন্দামৃতবর্ষিণী, কাম্লেবালে বাবাজীকৃত পক্ষপাতরহিত-অনুভব-প্রকাশ, গুলাপ সিংহকৃত প্রবোধচন্দ্রোদয়ের ভাষ্যানুবাদ, পরমহংস লক্ষ্যানন্দ স্বামীকৃত মোক্ষগীতা ও বিবেকবীর বিজয়, গুলাব রায়জী-কৃত মোক্ষপন্থ, স্বামী নিশ্চলদাসজীকৃত বিচারসাগর ও বৃত্তি প্রভাকর, স্বামীকৃত বিচার-মালা, পীতাম্বরদাসকৃত বালবোধিনী টীকা সহ বিচারচন্দ্রোদয়, কবিবর কেশবদাসকৃত বিজ্ঞানগীতা, স্বরূপানুসন্ধান ও যোগেশ্বর বলানাথজীকৃত মারয়াড়ী ভাষায় অনুভবপ্রকাশ প্রভৃতি উল্লেখ্য।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের অবদান: স্যার উইলিয়াম জোন্স্, চার্লস উইল্কিনস্ ও কোলব্রুক্ ১৮শ শতাব্দীর শেষ ও ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দার্শনিক ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। ইউরোপে সংস্কৃত ভাষাচর্চার পথিকৃৎ এই মনীষীত্রয়ের অনুসারী বহু পণ্ডিত এই পথে উৎসাহী হইয়াছেন। যথা, বুদ্ধচরিত অবলম্বনে *Ligt of Asia*-র স্রষ্টা এডুইন আরনল্ড, ইয়েট্স্, রাসেল, সোপেনহৌর, ডন বার্টম্যান *Philosophy of Religion* গ্রন্থের স্রষ্টা হফডিং প্রমুখ। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে বৈদিক বেদান্ত সাহিত্যে যাঁহাদের অবদান স্মরণীয় গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে আপাতত তাঁহাদের নামসমূহ স্মরণ করিব। যথা, রোয়ার, কাওয়েল, বৎলিঙ্গ, অধ্যাপক মোক্ষমূলার, ডসেন্, ওয়েবার, গার্বে, থিবো, কর্ণেল্ জেকব্, গফ্, বেনিস্, ও ম্যাকডোনাল্ প্রমুখ। ইঁহাদের মধ্যে বেদান্ত সাহিত্যে অধ্যাপক ডসেন-এর অবদান সর্বোপরি। থিবো শঙ্কর ভাষ্য ও রামানুজ ভাষ্যের অনুবাদ প্রকাশ করেন।

ব্রহ্মসূত্রের আলোচনায় তেমন কোন মৌলিক দান না থাকিলেও স্বাধীনতার পূর্বের একশতাব্দীব মধ্যে বেদান্ত ও বৈদিক বাঙ্ময়ে কতিপয় দেশীয় প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীদের দান স্মরণীয়। যথা, গঙ্গানাথ ঝা, এস্. সুব্বারাও, প্রিয়নাথ সেন, ড. রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কে. টি. তেলাঙ্গ, রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, সন্তদাস কাঠিয়াবাবাজী, স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ, মহাযোগী অনির্বাণ, মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, রামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী, গৌরগোবিন্দ ভাগবতস্বামী, রাধাগোবিন্দ নাথ, হরিদাস দাসবাবাজী, ড. বিনোদবিহারী দত্ত, সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী, রামপদ বেদান্তবিদ্যার্ণব প্রমুখ।

উনবিংশ শতাব্দীতে বেদান্তের মূল তত্ত্বকে কেন্দ্র করিয়া খৃষ্টান মত ও বৈজ্ঞানিক ভাবধারার সংমিশ্রণে প্রভাবিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ, থিয়সফি-সমাজ ও আর্য-সমাজ নামে তিনটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। ইঁহাদের অবদানও অবিস্মরণীয়।

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥" কেন, ২/৩

যে বলে জেনেছি ব্রহ্ম, সে তো ব্যর্থ কথা রটে।
যে বলে বিন্দু জানিনি, কিছু জেনেছে সে বটে॥

বেদ-বেদান্ত : পূর্বখণ্ড (ব্রহ্মসূত্র) সমাপ্ত

পরিশিষ্ট-৫

ব্রহ্মসূত্রের সূত্রানুক্রমণিকা

অধ্যায় = অ., পাদ = পা., সূত্র = সূ.

	অ.	পা.	সূ.
অকরণত্বাচ্চ ন ..	২	৪	১১
অক্ষরধিয়াং ত্বব...	৩	৩	৩৩
অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ	১	৩	১০
অগ্নিহোত্রাদি তু...	৪	১	১৬
অগ্ন্যাদিগতিশ্রুঃ...	৩	১	৪
অঙ্গাববদ্ধাস্তু...	৩	৩	৫৬
অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ	২	২	৮
অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ	৩	৩	৬১
অচলত্বং চাপেক্ষ্য	৪	১	৯
অণবশ্চ	২	৪	৭
অণুশ্চ	২	৪	১৩
অতএব চ নিত্যত্বম্	১	৩	২৯
অতএব চ স ব্রহ্ম	১	২	১৬
অতএব চ সর্বাণ্যনু	৪	২	২
অতএব চাগ্নীন্ধ...	৩	৪	২৫
অতএব চানন্যাধি	৪	৪	৯
অতএব চোপমা...	৩	২	১৮
অতএব ন দেবতা...	১	২	২৮
অতএব প্রাণঃ	১	১	২৩
অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ	৩	২	৮
অতশ্চায়নেঽপি..	৪	২	২০
অতস্ত্বিতরজ্জ্যা...	৩	৪	৩৯
অতিদেশাচ্চ	৩	৩	৪৬
অতোঽনন্তেন তথা...	৩	২	২৬
অতোঽন্যাঽপি হ্যে..	৪	১	১৭
অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ	১	২	৯
অথাতো ব্রহ্ম..	১	১	১

	অ.	পা.	সূ.
অদৃশ্যত্বাদিগুণ...	১	২	২১
অদৃষ্টানিয়মাৎ	২	৩	৫১
অধিকং তু ভেদ...	২	১	২২
অধিকার-রূপ...	২	৩	১৩
অধিকোপদেশাত্তু...	৩	৪	৮
অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ	২	২	৩৯
অধ্যয়নমাত্রবতঃ	৩	৪	১২
অণবশ্চ	২	৪	৯
অনভিভবং চ...	৩	৪	৩৫
অনবস্থিতের...	১	২	১৭
অনারব্ধকার্যে...	৪	১	১৫
অনাবিষ্কুর্বন্নন্বয়াৎ	৩	৪	৫০
অনাবৃত্তিঃ শব্দাদ...	৪	৪	২২
অনিয়মঃ সর্বেসাম...	৩	৩	৩১
অনিষ্টাদিকারিণাম...	৩	১	১২
অনুকৃতেস্তস্যাচ...	১	৩	২২
অনুজ্ঞাপরিহারৌ..	২	৩	৪৮
অনুপপত্তেস্তু ন..	১	২	৩
অনুবন্ধাদিভ্যঃ	৩	৩	৫০
অনুষ্ঠেয়ং বাদরা...	৩	৪	১৯
অনুস্মৃতের্বাদরিঃ..	১	২	৩১
অনুস্মৃতেশ্চ	২	২	২৫
অনেন সর্বগতত্ব.	৩	২	৩৭
অন্তর উপপত্তেঃ	১	২	১৩
অন্তরা চাপি তু...	৩	৪	৩৬
অন্তরা ভূতগ্রামবৎ..	৩	৩	৩৫
অন্তরা বিজ্ঞান.	২	৩	১৬
অন্তর্যাম্যধিদৈবা..	১	২	১৮

	অ.	পা.	সূ.
অন্তবত্তমসর্বজ্ঞতা	২	২	৪১
অন্তস্তদ্ধর্মোপদে..	১	১	২০
অন্ত্যাবস্থিতে...	২	২	৩৬
অন্যত্রাভাবাচ্চ...	২	২	৫
অন্যথাত্বং শব্দা...	৩	৩	৬
অনাথানুমিতৌ...	২	২	৯
অনাথাহনমেয়মিতি	২	১	১২
অন্যথা ভেদানুপপত্তি...	৩	৩	৩৬
অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ	১	৩	১২
অন্যাধিষ্ঠিতেষু...	৩	১	২৪
অন্যার্থং তু জৈমিনিঃ...	১	৪	১৮
অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ	১	৩	২০
অন্বয়াদিতি চেৎ...	৩	৩	১৭
অপরিগ্রহাচ্চাত্য..	২	২	১৭
অপি সপ্ত	৩	১	১৫
অপি চ স্মর্যতে	১	৩	২৩
অপি চ স্মর্যতে	২	৩	৪৫
অপি চ স্মর্যতে	৩	৪	৩০
অপি চ স্মর্যতে	৩	৪	৩৭
অপি চৈবমেকে..	৩	২	১৩
অপি সংরাধনে...	৩	২	২৪
অপীতৌ তদ্বৎপ্রস...	২	১	৮
অপ্রতীকালম্ব ..	৪	৩	১৫
অবাধাচ্চ	৩	৪	২৯
অবিভাগো বচনাৎ	৪	২	১৬
অভাবং বাদরিরাহ...	৪	৪	১০
অভিধ্যোপদেশাচ্চ	১	৪	২৪
অভিমানিব্যপদে..	২	১	৫
অভিব্যক্তেরিত্যা...	১	২	৩০
অভিসন্ধ্যাদি...	২	৩	৫২
অভ্যুপগমেঽপ্যা..	২	২	৬
অম্বুবদগ্রহণাত্তু..	৩	২	১৯
অরূপবদেব হি...	৩	২	১৪
অর্চিরাদিনা তৎ..	৪	৩	১

	অ.	পা.	সূ.
অর্ভকৌকস্ত্বা.	১	২	৭
অল্পশ্রুতেরিতি..	১	৩	২১
অবস্থিতিবৈশে.	২	৩	২৪
অবস্থিতেরিতি...	১	৪	২২
অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ	৪	৪	৪
অবিভাগো বচনাৎ	৪	২	১৬
অবিরোধশ্চন্দনবৎ	২	৩	২৩
অশুদ্ধমিতিচেন্ন...	৩	১	২৫
অশ্মাদিবচ্চ তদ...	২	১	২৩
অশ্রুতত্বাদিতি...	৩	১	৬
অসতি প্রতিজ্ঞোপ..	২	২	২১
অসদিতি চেন্ন...	২	১	৭
অসদ্ব্যপদেশান্নেতি...	২	১	১৭
অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ	২	৩	৪৯
অসম্ভবস্তু সতো...	২	৩	৯
অসার্বত্রিকী	৩	৪	১০
অস্তি তু	২	৩	২
অস্মিন্নস্য চ...	১	১	১৯
অস্যৈব চোপপত্তে...	৪	২	১১
অংশো নানাব্যপদে...	২	৩	৪৩
আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ	১	১	২২
আকাশে চাবিশেষাৎ	২	২	২৪
আকাশোঽর্থান্তর.	১	৩	৪৩
আচারদর্শনাৎ	৩	৪	৩
আতিবাহিকাস্ত..	৪	৩	৪
আত্মকৃতেঃ...	১	৪	২৬
আত্মগৃহীতিরিতর..	৩	৩	১৬
আত্মনি চৈবং..	২	১	২৮
আত্মশব্দাচ্চ	৩	৩	১৫
আত্মা প্রকরণাৎ	৪	৪	৩
আত্মেতি তূপগ..	৪	১	৩
আদরাদলোপঃ	৩	৩	৪০
আদিত্যাদিমতয়..	৪	১	৬

	অ.	পা.	সূ.
আধ্যানায় প্রয়ো.	৩	৩	১৪
আনন্দময়ো .	১	১	১২
আনন্দাদয়ঃ .	৩	৩	১১
আনর্থক্যমিতি ..	৩	১	১০
আনুমানিকমপ্যে.	১	৪	১
আপঃ	২	৩	১১
আপ্রায়ণাত্তত্রাপি .	৪	১	১২
আভাস এব চ	২	৩	৫০
আমনন্তি. .	১	২	৩২
আর্ত্বিজ্যমিত্যৌ...	৩	৪	৪৫
আবৃত্তিরসকৃদুপ...	৪	১	১
আসীনঃ সম্ভবাৎ	৪	১	৭
আহ চ তন্মাত্রম্	৩	২	১৬
ইতরপরামর্শাৎ.	১	৩	১৮
ইতরব্যপদেশাদ্ধি. .	২	১	২১
ইতরস্যাপ্যেবমসং...	৪	১	১৪
ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বা...	২	২	১৯
ইতরেত্বর্থসামান্যাৎ	৩	৩	১৩
ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ	২	১	২
ইয়দামননাৎ	৩	৩	৩৪
ঈক্ষতিকর্মব্যপদে .	১	৩	১৩
ঈক্ষতের্নাশব্দম্	১	১	৫
উৎক্রমিষ্যত এবং .	১	৪	২১
উৎক্রান্তিগত্যাগ .	২	৩	২০
উত্তরত্র চৈত্ররথেন	১	৩	৩৬
উত্তরাচ্চেদাবির্ভূত	১	৩	১৯
উত্তরোৎপাদে চ	২	২	২০
উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ	২	২	৪২
উদাসীনানামপি .	২	২	২৭
উপদেশভেদান্নেতি	১	১	২৭
উপপত্তেশ্চ	৩	২	৩৫
উপপদ্যতে চাপ্যুপল	২	১	৩৭

	অ.	পা.	সূ.
উপপন্নস্তল্লক্ষণা...	৩	৩	৩০
উপপূর্বমপি ত্বেকে...	৩	৪	৪২
উপমর্দং চ	৩	৪	১৬
উপলব্ধিবদনিয়মঃ	২	৩	৩৭
উপসংহারদর্শনা...	২	১	২৪
উপসংহারোঽর্থাভে .	৩	৩	৫
উপস্থিতেঽতস্তদ্ব .	৩	৩	৪১
উপাদানাৎ	২	৩	৩৫
উভয়থা চ দোষাৎ	২	২	১৬
উভয়থা চ দোষাৎ	২	২	২৩
উভয়থাপি ন কর্মা.	২	২	১২
উভয়ব্যপদেশাত্ত্ব..	৩	২	২৭
উভয়ব্যামোহাত্ত..	৪	৩	৫
উভয়েঽপি হি	১	২	২১
ঊর্ধ্বরেতঃ সু চ .	৩	৪	১৭
এক আত্মনঃ শরীরে. .	৩	৩	৫৪
এতেন মাতরিশ্বা .	২	৩	৮
এতেন যোগঃ..	২	১	৩
এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা...	২	১	১৩
এতেন সর্বে ব্যাখ্যাতা..	১	৪	২৯
এবং চাত্মাঽকা	২	২	৩৪
এবং মুক্তিফলা	৩	৪	৫২
এবমপ্যুপন্যাসাৎ.	৪	৪	৭
ঐহিকমপ্যপ্রস্তুত	৩	৪	৫১
কম্পনাৎ	১	৩	৪১
করণবচ্চেৎ	২	২	৪০
কর্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ	২	৩	৩৩
কর্মকর্তৃব্যপদেশাচ্চ	১	২	৪
কল্পনোপদেশাচ্চ...	১	৪	১০
কামকারেণ চৈকে	৩	৪	১৫
কামাচ্চ নানুমান .	১	১	১৮

	অ.	পা.	সূ.
কামাদীতরত্র..	৩	৩	৩৯
কাম্যাস্তু যথা...	৩	৩	৬১
কারণত্বেন চাকা..	১	৪	১৪
কার্যং বাদরিরস্য.	৪	৩	৭
কার্যাখ্যানাদপূর্বম্	৩	৩	১৮
কার্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ .	৪	৩	১০
কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু...	২	৩	৪২
কৃতাত্যয়েঽনুশয়...	৩	১	৮
কৃৎস্নপ্রসক্তির্নি...	২	১	২৬
কৃৎস্নভাবাত্তু...	৩	৪	৪৮
ক্ষণিকত্বাচ্চ	২	২	৩১
ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চ	১	৩	৩৫
গতিশব্দাভ্যাং...	১	৩	১৫
গতিসামান্যাৎ...	১	১	১০
গতেরর্থবত্ত্বমুভয়...	৩	৩	২৯
গুণসাধারণ্য...	৩	৩	৬৫
গুণাদ্বা লোকবৎ	২	৩	২৫
গুহাং প্রবিষ্টাবা..	১	২	১১
গৌণশ্চেন্নাত্ম...	১	১	৬
গৌণ্যসম্ভবাৎ	২	৩	৩
গৌণ্যসম্ভবাৎ...	২	৪	২
চক্ষুবাদিবত্তু তৎ. .	২	৪	১০
চমসবদবিশেষাৎ	১	৪	৮
চরণাদিতি চেন্ন..	৩	১	৯
চরাচরব্যপাশ্রয়...	২	৩	১৭
চিতি তন্মাত্রেণ..	৪	৪	৬
ছন্দতঃ, উভয়া..	৩	৩	২৮
ছন্দোভিধানান্নে...	১	১	২৫
জগদ্বাচিত্বাৎ	১	৪	১৬
জগদ্ব্যাপারবর্জং...	৪	৪	১৭
জন্মাদ্যস্য যতঃ	১	১	২

	অ.	পা.	সূ.
জীবমুখ্যপ্রাণ...	১	৪	১৭
জীবমুখ্যপ্রাণ ..	১	১	৩২
জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ	১	৪	৪
জ্ঞোঽত এব	২	৩	১৯
জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠা.	২	৪	১৪
জ্যোতিরূপক্রমাত্তু	১	৪	৯
জ্যোতির্দর্শনাৎ	১	৩	৪২
জ্যোতিশ্চরণাভি...	১	১	২৪
জ্যোতিষি ভাবাচ্চ	১	৩	৩২
জ্যোতিষৈকেষাম. .	১	৪	১৩
ত ইন্দ্রিয়াণি...	২	৪	১৭
তচ্ছ্রুতেঃ	৩	৪	৪
তড়িতোঽধিবরুণঃ...	৪	৩	৩
তত্তু সমন্বয়াৎ	১	১	৪
তৎপূর্বকত্বাদ্বাচঃ	২	৪	৪
তৎপ্রাক্শ্রুতেশ্চ	২	৪	৩
তত্রাপি চ তদ্ব্যাপা...	৩	১	১৬
তথাচ দর্শয়তি	২	৩	২৭
তথা চৈকবাক্যপো...	৩	৪	২৪
তথান্যপ্রতিষেধাৎ	৩	২	৩৬
তথা প্রাণাঃ	২	৪	১
তদধিগম উত্তর. .	৪	১	১৩
তদধীনত্বাদর্থবৎ	১	৪	৩
তদনন্যত্বমার	২	১	১৪
তদন্তরপ্রতিপত্তৌ.	৩	১	১
তদভাবনির্ধারণে ..	১	৩	৩৮
তদভাবো নাড়ীষু...	৩	২	৭
তদভিধ্যানাদেব. .	২	৩	১৪
তদব্যক্তমাহ হি	৩	২	২৩
তদাঽপীতেঃ সংসার...	৪	২	৮
তদুপর্যপি বাদরা.	১	৩	২৬
তদোকোঽগ্রজ্বলনং...	৪	২	১৭
তদ্‌গুণসারত্বা ..	২	৩	২৯

	অ.	পা.	সূ.
তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ	১	১	১৪
তদ্ভূতস্য তু...	৩	৪	৪০
তদ্বতো বিধানাৎ	৩	৪	৬
তন্নির্ধারণানিয়ম ..	৩	৩	৪২
তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষো	১	১	৭
তন্মনঃ প্রাণ ..	৪	২	৩
তদভাবে সন্ধ্য..	৪	৪	১৩
তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদ.	২	১	১১
তস্য চ নিত্যত্বাৎ	২	৪	১৬
তানি পরে তথা হ্যাহ	৪	২	১৫
তুল্যং তু দর্শনম্	৩	৪	৯
তৃতীয়শব্দাবরোধঃ...	৩	১	২১
তেজোঽতস্তথাহ্যাহ	২	৩	১০
ত্রয়াণামেব চৈব..	১	৪	৬
ত্র্যাত্মকত্বাত্তু...	৩	১	২
দর্শনাচ্চ	৩	১	২০
দর্শনাচ্চ	৩	২	২১
দর্শনাচ্চ	৩	৩	৪৮
দর্শনাচ্চ	৩	৩	৬৭
দর্শনাচ্চ	৪	৩	১৩
দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্য..	৪	৪	২০
দর্শয়তি চ	৩	৩	৪
দর্শয়তি চ	৩	৩	২২
দর্শয়তি চাথো..	৩	২	১৭
দহর উত্তরেভ্যঃ	১	৩	১৪
দৃশ্যতে তু	২	১	৬
দেবাদিবদপি লোকে	২	১	২৫
দেহযোগাদ্বা সোঽপি	৩	২	৬
দ্যুভ্বাদ্যায়তনং	১	৩	১
দ্বাদশাহবদুভয়বিধং..	৪	৪	১২
ধর্মং জৈমিনিরত এব	৩	২	৪০
ধর্মোপপত্তেশ্চ	১	৩	৯
ধৃতেশ্চ মহিম্নো...	১	৩	১৬
ধ্যানাচ্চ	৪	১	৮
ন কর্মাবিভাগাদিতি...	২	১	৩৬
ন চ কর্তুঃ করণম্	২	২	৪৩
ন চ কার্যে প্রতি...	৪	৩	১৪
ন চ পর্যায়াদপ্য...	২	২	৩৫
ন চ স্মার্তমতদ্ধ...	১	২	১৯
ন চাধিকারিকমপি..	৩	৪	৪১
ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ	২	১	৯
ন তৃতীয়ে তথো...	৩	১	১৮
ন প্রতীকে ন হি...	৪	১	৪
ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ	২	১	৩২
ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ	২	২	৩০
ন ভেদাদিতি চেন্ন..	৩	২	১২
ন বক্তুরাত্মোপদেশা...	১	১	২৯
ন বা তৎসহভাবা...	৩	৩	৬৬
ন বা প্রকরণভেদা...	৩	৩	৭
ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগু...	২	৪	৯
ন বা বিশেষাৎ	৩	৩	২১
ন বিয়দশ্রুতেঃ	২	৩	১
ন বিলক্ষণত্বাদস্য...	২	১	৪
ন সংখ্যোপসংগ্রহাদ্.	১	৪	১১
ন সামান্যাদপ্য..	৩	৩	৫২
ন স্থানতোঽপি...	৩	২	১১
নানুরতচ্ছ্রুতেরিতি..	২	৩	২২
নাতিচিরেণ বিশেষাৎ	৩	১	২৩
নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বা..	২	৩	১৭
নানা শব্দাদিভেদাৎ	৩	৩	৫৯
নানুমানমতচ্ছব্দাৎ	১	৩	৩
নাভাব উপলব্ধেঃ	২	২	২৮
নাবিশেষাৎ	৩	৪	১৩
নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ	২	২	২৬
নিত্যমেব চ ভাবাৎ	২	২	১৪

	অ.	পা.	সূ.
নিত্যোপলব্ধ্যনু...	২	৩	৩২
নিয়মাচ্চ	৩	৪	৭
নির্মাতারং চৈকে .	৩	২	২
নিশি নেতি চেন্ন. .	৪	২	১৯
নেতরোঽনুপপত্তেঃ	১	১	১৬
নৈকস্মিন্দর্শয়তো হি	৪	২	৬
নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ	২	২	৩৩
নোপমর্দেনাতঃ	৪	২	১০
পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ব্য. .	২	৪	১২
পটবচ্চ	২	১	২০
পত্যাদিশব্দেভ্যঃ	১	৩	৪৫
পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ	২	২	৩৭
পয়োঽম্বুবচ্চেত্তত্রাপি	২	২	৩
পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ	৪	৩	১২
পরমতঃ সেতুন্মান .	৩	২	৩১
পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ	২	৩	৪১
পরাভিধ্যানাত্তু...	৩	২	৫
পরামর্শং জৈমিনির...	৩	৪	১৮
পরেণ চ শব্দস্য...	৩	৩	৫২
পরিণামাৎ	১	৪	২৭
পারিপ্লবার্থা ইতি...	৩	৪	২৩
পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য..	২	৩	৩১
পুরুষবিদ্যায়ামিব	৩	৩	২৪
পুরুষার্থোঽতঃ শব্দা	৩	৪	১
পুরুষাশ্মবদিতি...	২	২	৭
পূর্বং তু বাদরায়...	৩	২	৪১
পূর্ববদ্বা	৩	২	২৯
পূর্ববিকল্পঃ প্রকর..	৩	৩	৪৫
পৃথগুপদেশাৎ	২	৩	২৮
পৃথিবী	২	৩	১২
প্রকরণাচ্চ	১	২	১০
প্রকরণাচ্চ	১	৩	৬
প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ	৩	২	১৫
প্রকাশাদিবচ্চাবৈশে	৩	২	২৫
প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ	২	৩	৪৬
প্রকাশাশ্রয়বদ্বা.	৩	২	২৮
প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা.	১	৪	২৩
প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি.	৩	২	২২
প্রজ্ঞান্তর-পৃথক্ত্ব .	৩	৩	৫১
প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ	১	১	৯
প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গ.	১	৪	২০
প্রতিজ্ঞাঽহানিরব্য...	২	৩	৬
প্রতিষেধাচ্চ	৩	২	৩০
প্রতিষেধাদিতি. .	৪	২	১২
প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসং..	২	২	২২
প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি...	৪	৪	১৮
প্রথমেঽশ্রবণাদিতি...	৩	১	৫
প্রদানবদেব তদুক্তম্	৩	৩	৪৩
প্রদীপবদাবেশস্তথা. .	৪	৪	১৫
প্রদেশাদিতিচেন্না...	২	৩	৫৩
প্রবৃত্তেশ্চ	২	২	২
প্রসিদ্ধেশ্চ	১	৩	১৭
প্রাণগতেশ্চ	৩	১	৩
প্রাণভৃচ্চ	১	৩	৪
প্রাণবতা শব্দাৎ	২	৪	১৫
প্রাণস্তথানুগমাৎ	১	১	২৮
প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ	১	৪	১২
প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রা..	৩	৩	১২
ফলমতঃ, উপপত্তেঃ...	৩	২	৩৮
বহিস্তুভয়থাপি..	৩	৪	৪৩
বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ	৩	২	৩৩
ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ	৪	১	৫
ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরূপ.	৪	৪	৫
ভাক্তং বানাত্ম...	৩	১	৭
ভাবশব্দাচ্চ	৩	৪	২২

	অ.	পা.	সূ.
ভাবং জৈমিনির্বিক...	৪	৪	১১
ভাবং তু বাদরায়...	১	৩	৩৩
ভাবে চোপলব্ধেঃ	২	১	১৫
ভাবে জাগ্রদ্বৎ	৪	৪	১৪
ভূতাদিপাদব্যপদে...	১	১	২৬
ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ	৪	২	৫
ভূমা সম্প্রসাদাদ..	১	৩	৮
ভূম্নঃ ক্রতুবজ্জ্যা...	৩	৩	৫৮
ভেদব্যপদেশাচ্চ	১	১	১৭
ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ	১	১	২১
ভেদব্যপদেশাৎ	১	৩	৫
ভেদশ্রুতেঃ	২	৪	১৮
ভেদান্নেতি চেদেক...	৩	৩	২
ভোক্ত্রাপত্তেরবিভা...	২	১	১৪
ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ	৪	৪	২১
ভোগেন ত্বিতরে...	৪	১	১৯
মধ্বাদিষ্বসম্ভবা...	১	৩	৩১
মন্ত্রবর্ণাৎ	২	৩	৪৪
মন্ত্রাদিবদ্বাঽবিরোধঃ	৩	৩	৫৭
মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্ব...	২	২	১১
মহদ্বচ্চ	১	৪	৭
মাংসাদি ভৌমং ..	২	৪	২১
মান্ত্রবর্ণিকমেব...	১	১	১৫
মায়ামাত্রং তু...	৩	২	৩
মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ	৪	৪	২
মুক্তোপসৃপ্যব্যপ ..	১	৩	২
মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ	৩	২	১০
মৌনবদিতরেষামপ্যু	৩	৪	৪৯
যত্রৈকাগ্রতা তত্রা...	৪	১	১১
যথা চ তক্ষোভয়থা	২	৩	৪০
যথা চ প্রাণাদি	২	১	২১
যদেব বিদ্যয়েতি হি	৪	১	১৮

	অ.	পা.	সূ.
যাবদধিকারমব...	৩	৩	৩২
যাবদাত্মভাবিত্বা...	২	৩	৩০
যাবদ্বিকারং তু..	২	৩	৭
যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ.	২	১	১৮
যোগিনঃ প্রতি স্মর্যতে	৪	২	২১
যোনিশ্চ হি গীয়তে	১	৪	২৮
যোনেঃ শরীরম্	৩	১	২৭
রচনানুপপত্তেশ্চ	২	২	১
রশ্ম্যনুসারী	৪	২	১৮
রূপাদিমত্ত্বাচ্চ...	২	২	১৫
রূপোপন্যাসাচ্চ	১	২	২৪
রেতঃসিগ্‌যোগোঽথ	৩	১	২৬
লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ...	৩	৩	৪৪
লিঙ্গাচ্চ	৪	১	২
লোকবত্তু...	২	১	৩৪
বদতীতিচেন্ন ..	১	৪	৫
বাক্যান্বয়াৎ	১	৪	১৯
বাঙ্‌মনসি...	৪	২	১
বায়ুমব্দাদবিশেষ...	৪	৩	২
বিকরণত্বান্নেতি...	২	১	৩২
বিকল্পোঽবিশিষ্ট...	৩	৩	৬০
বিকারাবর্ত্তি চ ..	৪	৪	১৯
বিকারশব্দান্নেতি...	১	১	১৩
বিজ্ঞানাদিভাবে বা. .	২	২	৪৪
বিদ্যাকর্মণোরিতি...	৩	১	১৭
বিদ্যৈব তু নির্ধা...	৩	৩	৪৭
বিধির্বা ধারণবৎ	৩	৪	২০
বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমো...	২	৩	১৫
বিপ্রতিষেধাচ্চ	২	২	৪৫
বিপ্রতিষেধাচ্চ	২	২	১০
বিভাগ শতবৎ	৩	৪	১১
বিরোধঃ কর্মনীতি...	১	৩	২৭

	অ.	পা.	সূ.
বিবক্ষিতগুণোপ...	১	২	২
বিশেষঞ্চ দর্শয়তি	৪	৩	১৬
বিশেষণভেদব্যপ. .	১	২	২৩
বিশেষণাচ্চ	১	২	১২
বিশেষাণুগ্রহশ্চ	৩	৪	৩৮
বিশেষিতত্বাচ্চ	৪	৩	৮
বিহারোপদেশাৎ	২	৩	৩৪
বিহিতত্বাচ্চা...	৩	৪	৩২
বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্ব...	৩	২	২০
বেধাদ্যর্থভেদাৎ	৩	৩	২৫
বৈদ্যুতেনৈব ততস্ত...	৪	৩	৬
বৈধর্ম্যাচ্চ ন...	২	২	২৯
বৈলক্ষণ্যাচ্চ	২	৪	১৯
বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদ...	২	৪	২২
বৈশ্বানরঃ সাধারণ...	১	২	২৫
বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন...	২	১	৩৫
ব্যতিরেকস্তদ্ভাবা...	৩	৩	৫৫
ব্যাতিরেকানবস্থিতে...	২	২	৪
ব্যতিরেকো গন্ধবৎ	২	৩	২৬
ব্যতিহারো বিশি...	৩	৩	৩৭
ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়া...	২	৩	৩৬
ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্	৩	৩	৯
শক্তিবিপর্যয়াৎ	২	৩	৩৮
শব্দ ইতিচেন্না...	১	৩	২৮
শব্দবিশেষাৎ	১	২	৫
শব্দশ্চাতো...	৩	৪	৩১
শব্দাচ্চ	২	৩	৪
শব্দাদিভ্যোঽন্তঃ...	১	২	২৭
শব্দাদেব প্রমিতঃ	১	৩	২৪
শমদমাদ্যুপেতঃ..	৩	৪	২৭
শারীরশ্চোভয়েঽপি...	১	২	২০
শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপ.	১	১	৩১
শাস্ত্রযোনিত্বাৎ	১	১	৩

	অ.	পা.	সূ.
শিষ্টেশ্চ	৩	৩	৬৩
শুগস্য তদনাদর..	১	৩	৩৪
শেষত্বাৎ পুরুষাথ...	৩	৪	২
শ্রবণাধ্যয়নার্থ...	১	৩	৩৮
শ্রেষ্ঠশ্চ	২	৪	৮
শ্রুতত্বাচ্চ	১	১	১১
শ্রুতত্বাচ্চ	৩	২	৩৯
শ্রুতেশ্চ	৩	৪	৪৬
শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ	২	১	২৮
শ্রুতোপনিষৎকগত্য...	১	২	১৬
শ্রুত্যাদিবলীয়...	৩	৩	৪৯
স এব তু কর্মানু...	৩	২	৯
সংজ্ঞাতশ্চেত্তদুক্তম...	৩	৩	৮
সংজ্ঞামূর্তিক্লৃপ্তিস্তু...	২	৪	২০
সংযমনে ত্বনুভূয়ে...	৩	১	১৩
সংস্কারপরামর্শাত্ত...	১	৩	৩৭
সঙ্কল্পাদেব তু...	৪	৪	৮
সত্ত্বাচ্চাপরস্য	২	১	১৭
সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি	৩	২	৬
সপ্তগতের্বিশেষিত...	২	৪	৫
সমন্বারম্ভণাৎ	৩	৪	৫
সমবায়াভ্যুপগম্য...	২	২	১৩
সমাকর্ষাৎ	১	৪	১৫
সমাধ্যভাবাচ্চ...	২	৩	৩৯
সমান এবং চাভেদাৎ...	৩	৩	১৯
সমাননামরূপত্বা...	১	৩	৩০
সমানা চাসৃত্যুপ .	৪	২	৭
সমাহারাৎ	৩	৩	৬৪
সমুদায় উভয়হে...	২	২	১৮
সম্পত্তেরিতি জৈমি...	১	২	৩২
সম্পদ্যাবির্ভাবঃ...	৪	৪	১
সম্বন্ধাদেবমনা ..	৩	৩	২০
সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ	২	২	৩৮

	অ.	পা.	সূ.
সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্য...	৩	৩	২৩
সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি...	১	২	৮
সর্বত্র প্রসিদ্ধো...	১	২	১
সর্বথানুপপত্তেশ্চ	২	২	৩২
সর্বথাপি ত এবোভ...	৩	৪	৩৪
সর্বধর্মোপপত্তেশ্চ	২	১	৩৮
সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ং..	৩	৩	১
সর্বান্নানুমতিশ্চ...	৩	৪	২৮
সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞা ..	৩	৪	২৬
সর্বাভেদাদন্যত্রেমে	৩	৩	১০
সর্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ	২	১	৩১
সহকারিত্বেন চ	৩	৪	৩৩
সহকার্যন্তরবিধিঃ...	৩	৪	৪৭
সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ...	১	৪	২৫
সাক্ষাদপ্যবিরোধং...	১	২	২৯
সা চ প্রশাসনাৎ	১	৩	১১
সাভাব্যাপত্তিরূপ...	৩	১	২২
সামান্যাত্তু	৩	২	৩২
সামীপ্যাত্তু...	৪	৩	৯
সাম্পরায়ে তর্তব্যা...	৩	৩	২৭
সুকৃতদুষ্কৃতে এবেতি..	৩	১	১১
সুখবিশিষ্টাভিধা..	১	২	১৫
সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভে .	১	৩	৪৪
সূক্ষ্মং তু তদর্হত্বাৎ	১	৪	২
সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ. .	৪	২	৯
সূচকশ্চ হি শ্রুতেরা..	৩	২	৪
সৈব হি সত্যাদয়ঃ	৩	৩	৩৮
সোঽধ্যক্ষে তদুপগ.	৪	২	৪
স্তুতয়েঽনুমতির্বা	৩	৪	১৪
স্তুতিমাত্রমুপাদা...	৩	৪	২১
স্থানবিশেষাৎ...	৩	২	৩৪
স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ	১	২	১৪
স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ ...	১	৩	৭

	অ.	পা.	সূ.
স্পষ্টো হ্যেকেষাম্	৪	২	১৩
স্মরন্তি চ	২	৩	৪৭
স্মরন্তি চ	৩	১	১৪
স্মরন্তি চ	৪	১	১০
স্মর্যতে চ	৪	২	১৪
স্মর্যতেঽপি চ...	৩	১	১৯
স্মর্যমানমনুমানং...	১	২	২৬
স্মৃতেশ্চ	১	২	৬
স্মৃতেশ্চ	১	৩	৪০
স্মৃতেশ্চ	৪	৩	১১
স্মৃত্যনবকাশদোষ...	২	১	১
স্যাচ্চৈকস্য...	২	৩	৫
স্বপক্ষদোষাচ্চ	২	১	১০
স্বপক্ষদোষাচ্চ	২	১	৩০
স্বশব্দোন্মানা...	২	৩	২৩
স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ	২	৩	২১
স্বাধ্যায়স্য তথা...	৩	৩	৩
স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যো...	৪	৪	১৬
স্বভাব্যাপত্তিরু...	৩	১	২২
স্বাপ্যয়াৎ	১	১	৯
স্বামিনঃ, ফলশ্রুতেঃ...	৩	৪	৪৪
হস্তাদয়স্তু স্থিতে...	২	৪	৬
হানৌ তূপায়ন...	৩	৩	২৬
হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনু ..	১	৩	২৫
হেয়ত্বাবচনাচ্চ	১	১	৮

গ্রন্থপঞ্জী

১। অষ্টাধ্যায়ী — ভগবান্ পাণিনি
২। উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী — স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত
৩। কালিদাস গ্রন্থাবলী — বসুমতী সাহিত্য মন্দির
৪। কৌষীতকি ও গোপালতাপনী উপনিষদ্ — ঐ
৫। গায়ত্রী রহস্য — শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়
৬। গীতবিতান — শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭। চণ্ডীচিন্তা — মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
৮। পূর্বমীমাংসা দর্শন — আচার্য জৈমিনি
৯। বরাহপুরাণ : মাধবভাষ্য
১০। বিজ্ঞানামৃতভাষ্য — বিজ্ঞানভিক্ষু
১১। বিষ্ণুপুরাণ — ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস
১২। বেদসংহিতা — রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত
১৩। বেদান্তরত্নজাহ্নবী — দেবাচার্য
১৪। বেদান্ত সাহিত্যের ইতিহাস — স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী
১৫। ব্রহ্মসংহিতা — ভগবান্ শ্রীব্রহ্মা
১৬। ব্রহ্মসূত্র : শারীরকভাষ্য — আচার্য শংকর
১৭। ব্রহ্মসূত্র : শ্রীভাষ্য — আচার্য রামানুজ
১৮। ব্রহ্মসূত্র : পূর্ণপ্রজ্ঞভাষ্য — আচার্য মধ্ব
১৯। ব্রহ্মসূত্র : বেদান্তপারিজাতসৌরভভাষ্য — আচার্য নিম্বার্ক
২০। ব্রহ্মসূত্র : গোবিন্দভাষ্য — আচার্য বলদেব বিদ্যাভূষণ
২১। ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত — শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, বেদান্তবিদ্যার্ণব
২২। মনুসংহিতা — ভগবান্ মনু
২৩। যোগসূত্র — মহর্ষি কপিল
২৪। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত — শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ
২৫। শ্রীশ্রীরামচরিতমানস — গোস্বামী তুলসীদাস
২৬। শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধুসুন্দরের প্রেমের বাণী
২৭। সত্যার্থ প্রকাশ — স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী
২৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — মহর্ষি বেদব্যাস।
২৯। The Bible : New Testament
৩০। The Rigveda — Macdonel
৩১। The Secret of the Veda — SriAurobindo

জয় জগদ্বন্ধু হরি

ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির গ্রন্থ-সম্ভার

১. শ্রীমদ্ভাগবত (১০ম স্কন্ধ, ৫ খণ্ডে)
২. গীতাধ্যান (৬ খণ্ডে/সমগ্র) / হিন্দী
৩. উপনিষদ্ ভাবনা (২ খণ্ডে)
৪. বেদ-বেদান্ত : পূর্বখণ্ড (ব্রহ্মসূত্র)
৫. বেদ-বেদান্ত : উত্তর খণ্ড (বেদ-বিচিন্তন)
৬. গৌরকথা (৩ খণ্ডে/অখণ্ড)
৭. উদ্ধব সন্দেশ/বাংলা ও হিন্দী
৮. চণ্ডী চিন্তা
৯. ব্রহ্মচর্য তত্ত্ব-জ্যোতিঃ
১০. সনাতন ধর্ম
১১. মানবধর্ম/বাংলা, হিন্দী ও ইং
১২. পাঁচটি ভাষণ
১৩. শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণস্মরণমঙ্গল
১৪. শ্রীশ্রীগৌরস্মরণমঙ্গল
১৫. শ্রীশ্রীবন্ধুস্মরণমঙ্গল
১৬. শ্রীশ্রীহরিপুরুষ-ধ্যানমঙ্গল
১৭. গোপীমন্ত্র-মাধুরী/বাংলা ও সংস্কৃত
১৮. ব্রহ্মসূত্রম্ গৌরপরভাষ্যম্ (দ্বাদশসূত্রী)
১৯. মা দুর্গার কাঠামো / Eng.
২০. শ্রীমহেন্দ্রলীলামৃত
২১. মহাকীর্ত্তন-মাধুরী
২২. প্রেম-সম্পূট
২৩. ধর্মপ্রসঙ্গে মিশনারী ও ভারতীয় সাধু
২৪. জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণের শেষ উপদেশ
২৫. ঈশ্বর নাই! ঈশ্বর আছেন!!
২৬. শ্রীগৌর সন্দর্ভ
২৭. শ্রীশ্রীবন্ধুলীলামাধুরী
২৮. ভাঃ দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা
২৯. 'নৌকাডুবি' পারমার্থিক কথা সবই
৩০. জগজ্জননী কালীমাতার তত্ত্ব
৩১. গৌরাঙ্গ লীলামাধুরী
৩২. হরিদাস প্রশস্তি
৩৩. পরশমণির পরশে
৩৪. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (মূল ও অনুবাদ)
৩৫. পদ্যগীতা (অমিত্রাক্ষর ছন্দে)
৩৬. গীতাসার
৩৭. অক্রুর সংবাদ
৩৮. রামবাগানের কথা
৩৯. শিক্ষা প্রসঙ্গে
৪০. বাণী ও উপদেশ
৪১. বেদের কথা
৪২. মহানামব্রত রচনা সম্ভার
৪৩. ভগবল্লীলা চিন্তামণি/বাং ও হিন্দী
৪৪. মহামৃত্যুরঙ্গের 'মহাসঞ্জীবনী ভাষ্য'
৪৫. চন্দ্রপাতমাধুর্যবিন্দুর 'মধুভাষ্য'
৪৬. লীলা-স্মরণিকা (স্মরণিক)
৪৭. প্রিয়াজীপাদসেবনম্ (,,)
৪৮. প্রেমের বাণী (,,)
৪৯. ভক্তপাথেয় (,,)
৫০. Chicago Lectures...
৫১. Lords Grace in my Race
৫২. Vaishnava Vedanta / বাংলা
৫৩. Sri Krishna Chaitanya...
৫৪. Spiritual Discourses
৫৫. An Introduction to Bhagabatam
৫৬. রাসপঞ্চাধ্যায়ী (হিন্দী) ইত্যাদি

প্রাপ্তিস্থান : প্রকাশক, শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন, রঘুনাথপুর, কলি : ৫৯। মহানাম প্রচার সমিতির গাড়ি, শিয়ালদা স্টেশন চত্বর। মহাউদ্ধারণ মঠ, ৫৯, মাণিকতলা মেন রোড, কলি : ৫৪। জগদ্বন্ধুধাম, ডাহাপাড়া, মুর্শিদাবাদ। মহানাম মঠ, পোড়ামাতলা, নবদ্বীপধাম, নদীয়া। মহেশ লাইব্রেরী, ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি : ৭৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কলি : ৬। জয়গুরু পুস্তকালয়, ১২/১বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি : ৭৩। সঞ্চয়ন, কোচবিহার।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর।
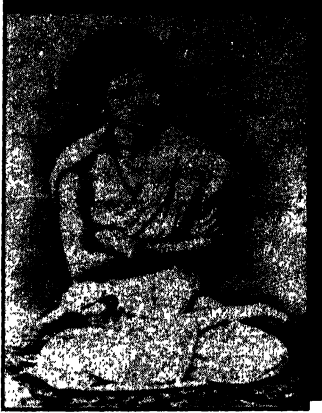
ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তখন হারবার্ট। তাঁর নজরে পড়ল বুনো বাগদিরা। তাদের খৃস্টান করার জন্য হারবার্ট সাহেব প্ররোচিত করলেন পাদ্রী রেভারেণ্ড এ. সিলাস মিডকে। একদিন নীল চাষের জন্য, রাস্তা তৈরির জন্য এসেছিল সাঁওতাল, কোন কুলির দল, আজ তাদের পরিচয় বুনো বাগদি হিসেবে। ওইসব বাগদিকে খৃস্টান করার উদ্যোগপর্ব যখন প্রায় শেষ, তখনই এগিয়ে এলেন একজন। বুনোদের সর্দার রজনীকে বুকে টেনে নিয়ে বলছেন, "রজনী, খৃস্টান হবে কেন? মনে রেখ, তোমরা বুনোরা মোটেই হীন নও, ছোট নও। তোমরা শ্রীহরির দাস, আমার অতি প্রিয়জন। আজ থেকে তোমরা আর বুনো নও, তোমরা মোহান্ত সম্প্রদায়। ভুবনমঙ্গল হরিনাম কর, সকলে ধন্য হও।" আলোড়ন উঠল চারিদিকে। বুনোরা খৃস্টান না হয়ে হলেন মোহান্ত। হরিনামের তোড়ে ভেসে গেল তাঁদের জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা। আইন হাজার চেষ্টাতেও যা পারেনি, হরিনামে তাই সম্ভব হল মুহূর্তে। রজনী সর্দার হ'ল হরিদাস মোহান্তে—প্রসিদ্ধ পদ-কীর্তনীয়া হিসাবে খ্যাতি অর্জন করলেন যিনি অচিরে।

পরের ঘটনা, উত্তর কলকাতার রাম বাগানে ডোমপল্লীর অবহেলিত মানুষগুলিকেও তিনি টেনে নিলেন বুকে। আখ্যাত করলেন তাঁদের 'ব্রজজন' হিসেবে। তাঁর প্রেরণায় ওই মানুষগুলি হয়ে উঠল উত্তম খোলবাদক আর কীর্তন গায়ক।

সে'কালীন সমাজ কাঠামোয় এমনিভাবে পতিত উদ্ধারে যিনি এগিয়ে এসেছিলেন, তিনিই প্রভু জগদ্বন্ধু। সমতল গামিনী স্রোতস্বিনীর মত যিনি পতিত উদ্ধারেই নিয়োজিত করেন নিজেকে। শুধু নামের গুণে বশ করেন অতি দুর্বিনীতকেও। ১৩২২ সালের শ্রাবণের 'ভারতবর্ষ' বলছে তাঁর সম্পর্কে, "জগদ্বন্ধু বক্তৃতা করেন না, মুদ্রিত পুস্তিকা বিতরণ করিয়া মত প্রচার করেন না। তিনি ভেলকি জানেন না। যাদু জানেন না। ভবিষ্যৎ গুণিয়া অদৃষ্ট পরীক্ষা করেন না এবং তুক্‌তাক্ মন্ত্র বা ঔষধ কবচের ভান করেন না। কিন্তু তাঁহার ক্ষুদ্র আশ্রম (ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গন) লোকারণ্য কেন? এ রহস্য কে বুঝাইয়া দিবে? তিনি নিত্য শুদ্ধ মুক্তপুরুষ। তাঁহার ত্যাগ আছে, সাধনা আছে, সুকৃতি আছে, প্রাণ আছে। তাই তিনি নীরব হইয়াও কর্মশীল, মৌনী হইয়াও প্রচারক। আমরা আমাদের সমাজের কল্যাণের জন্য সংসারে শুভ বাক্যের আচরণে প্রাণহীন চপলতা দেখিতে চাই না। জগদ্বন্ধুর ন্যায় নীরব সাধনাপূত সন্ন্যাসজীবন চাই, যেখানে ক্ষণমাত্র দাঁড়াইয়া প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে পারি।"

প্রভু জগদ্বন্ধু। সর্বদাই নামে বিভোর। অথচ দৃষ্টি পতিত উদ্ধারে। সমাজ সংস্কার বা ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর তখনও আবির্ভাব হয়নি। সেই সময়ই প্রভু জগদ্বন্ধু বুনো বাগদিদের প্রকৃত হরিজন করে তোলেন, হরিনাম প্রচারের মধ্য দিয়ে। তাঁর সেই প্রেমময় রূপ দেখে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ এবং প্রেমানন্দ ভারতী তাঁকে 'নব গৌরাঙ্গ' বলে প্রচার

করেন। কিন্তু যিনি নিজেকে অন্তরালে রেখে কাজ করতে চান, সেই জগদ্বন্ধু বলেন, "আমাকে শিশির ও ভারতী যেন লোকের কাছে প্রকাশ না করেন। বাতির আলোকে সূর্য প্রকাশ করিতে হয় না, সূর্য স্বপ্রকাশ।" তাঁর কথা, "**হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ। চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র হা কীটপতন।। (প্রভু প্রভু প্রভু হে) (অনন্তানন্তময়)।**" নিজের সম্পর্কে তাঁর উক্তি, "আমি ভিন্ন কিছু নাই। আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অ্যামব্রোসিয়া (অমৃত)। আমি ঝাড়ুদার, ঝাড়ু দিয়া পবিত্র করার জন্য এসেছি।" "অন্যদির আদি গোবিন্দ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ। এই শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা, এই দুই লীলার সর্ব সমষ্টি শক্তিসম্পন্ন যিনি, তিনিই শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধু। আমি সেই রে সেই, জানলি?" তিনি এসেছিলেন দণ্ড দিতে নয়, মুক্তি দিতে। তাই বলেন, "আমি দণ্ডদাতা নহি, উদ্ধারণ বটী।" একারণেই মহাউদ্ধারণের ব্রতে তিনি ছিলেন ব্রতী। তাঁর কথা, "হরি নাম লও ভাই, আর অন্য গতি নাই, হের প্রলয় এল প্রায়।" সেই প্রলয় থেকে রক্ষা পেতে "ব্রহ্মচর্য কর, করাও।" তিনি বলেন, "তারকব্রহ্ম হরিনামই মহাউদ্ধারণ মন্ত্র, ইহা গুপ্ত নহে, সর্বদা প্রকাশ্য। তোমরা দেশে দেশে সর্বদা হরিনাম প্রচার কর। হরিনামে সৃষ্টি রক্ষা পাবে। তোমাদের বন্ধুর এই ভিক্ষা।"

জাতিকে রক্ষা করতেই তাঁর সব সাধনা। তাই ঠুনকো জাতিভেদ তিনি মানতেন না। তিনি বলতেন, "অমি জানি সমগ্র মানব একটি জাতি। তাহার নাম নরজাতি। এই জাতির দুই ভাগ—মহাজাতি আর অপজাতি। যাঁহারা হরিভক্ত, তাঁহারা মহাজাতি। যাহারা ভক্তিহীন, তাহারা অপজাতি।

নামে বিভোর জগদ্বন্ধুসুন্দরের জীবনধারাও ছিল বিচিত্র। তিনি দীর্ঘদিন মৌন অসূর্যম্পশ্য থেকে তিনি অন্ধকার মহাগম্ভীরা গুম্ফায় থেকে করে গেছেন লীলা আস্বাদন। বালক স্বভাবে দেখিয়েছেন নানাভাবের অলৌকিক ঘটনা। তাঁর ভাবে আবেগে নিয়তই ঘটেছে নানা অলৌকিকতার প্রকাশ। অথচ সে সম্পর্কে তিনি ছিলেন নীরব।

১৮৭১ সালের ১৭ মে, সীতানবমীর মাহেন্দ্রক্ষণে মুর্শিদাবাদের ডাহাপাড়ায় জগদ্বন্ধুসুন্দরের জন্ম। বাবা দীননাথ চক্রবর্তী ন্যায়রত্ন, মা বামা দেবী। বাল্যেই মাতৃবিয়োগ ঘটলে বাবা দীননাথ জগদ্বন্ধুকে নিয়ে আসেন স্বগ্রাম গোবিন্দপুরে। পরে ফরিদপুরের ব্রাহ্মণকান্দায় তাঁরা চলে আসেন। ভর্তি হন জেলা স্কুলে। কিন্তু একদিন যাঁর কোষ্ঠী দেখে এক তিব্বতী সাধক বলেছিলেন, এ হবে এক মহাপুরুষ, যাঁকে দেখে অন্য এক সাধু বলেছিলেন, এ হবে যোগের রাজা—তিনি সাংসারিক নিয়মে বাঁধা থাকতে পারেন? তাই বাল্যেই ভাবজগতে ঘটল বিপ্লব। কখনো মৌন, কখনও বা ধ্যানস্থ। ব্রহ্মচর্যসাধন ও নামকীর্তনের পথে এগিয়ে চলেন তিনি। জীবের মহাউদ্ধারণের জন্য দিলেন মহানাম মন্ত্র। ১৩২৮ সালের ১ আশ্বিন তিনি প্রবিষ্ট হন অমৃতময় মহামৃত্যুদশায় থেকে নিত্য লীলা আস্বাদনে।

—**পরিব্রাজক**। 'যুগান্তর' পত্রিকা (৫.৮.১৯৮১)-র সৌজন্যে।

ড. শ্রীমন্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজি

বছর পঁচিশ আগের কথা। আমেরিকায় চিকাগো থেকে বেশ কিছু দূরে কেন্টাকীর লুইভিলে একটি আশ্রম। জনা চল্লিশেক মার্কিন সাধু মৌন থেকে ভারতীয় ধারার সাধনা করছেন। আশ্রম প্রধান লুইবাবা (রবার্ট মেরটন)। কৌতূহলী প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর ভাষণই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে ভারতীয় ধর্ম ও সাধনার দিকে। কিন্তু কে এই ডঃ ব্রহ্মচারী? তা জানার আগে যেতে হবে আরও পিছিয়ে। সেটা ১৯৩৩ সাল। চিকাগোতে হল বিশ্বধর্ম সম্মেলন। এই সেই চিকাগো—যেখানে এর ৪০ বছর আগে ১৮৯৩ সালে হয়েছিল পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়ন অথবা বিশ্বধর্ম মহাসভার অধিবেশন। সেবার স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে। আর এবার বিশ্বধর্ম সম্মেলন বা 'ওয়ার্ল্ড ফেলোশিপ্ অব্ ফেইথস্।' এবারে আর ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে নয়, মানুষের সাধারণ বিশ্বাস ও সমস্যা নিয়েই হ'ল আলোচনা। সেদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক জোন ডিউরি বক্তৃতা দিলেন। হল তখন কানায় কানায় ভরা। এরপরই ভারতের মহানাম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে ভাষণ দিলেন সাদা খদ্দরের ধুতি চাদর পরিহিত ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। বললেন, সনাতন হিন্দু ধর্মের কথা। বললেন ভারতীয় সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দান, প্রভু জগদ্বন্ধুর জীবনাদর্শের কথা। শ্রোতারা মুগ্ধ। আবার ঘোষিত হল হিন্দুধর্মের সর্বজননীতার কথা। তাঁর ভাষণে মুগ্ধ ওয়ার্ল্ড ফেলোশিপ্ অব্ ফেইথস্-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি চার্লস্ এফ্ ওয়েলার্ পরে মন্তব্য করেন, "ভারতের আচার পদ্ধতি, অবস্থা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সম্পদ্ নিয়ে যে অপূর্ব সমন্বয়, তৎসহ শান্ত ও নিরহঙ্কার আত্মনির্ভরতা, বিরাট মানবপ্রীতি এবং উল্লেখযোগ্য তথ্যবহুল ও উদ্দীপনাময় বাগ্মিতায় আমি মুগ্ধ এবং ভ্রাতৃীয় অনুরাগে অনুপ্রাণিত হয়েছি।"

প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় শুধু ইষ্টনামে ভরসা রেখে ডঃ ব্রহ্মচারী পাড়ি দিয়েছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পথে। সেখানে তাঁর থাকার অনুমতি ছিল মাত্র তিন মাসের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছ বছর তিনি কাটান সেখানে। এবং কাটান আত্মমর্যাদার সঙ্গে। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক তাঁকে খদ্দরের ধুতি চাদর ছেড়ে কোট প্যান্ট পরতে বললে তিনি বিনীত অথচ তেজের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন, "স্যার, এই খদ্দর তো আমার এককক্ষণের জন্য ত্যাগ করার উপায় নেই। ইহা যে আমার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক।" চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে অর্জন করেন পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি। এই বিশাল মহাদেশের ৬৩টি বড় বড় শহরে তিনি ৩৫৪টি ভাষণ দেন। ২৯টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে অতিথিরূপে আহূত হন এবং বক্তৃতা দেন অসংখ্য হাই স্কুল, সামাজিক ও নাগরিক সমিতিতে। প্রচার করেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম তথা শ্রীচৈতন্যের কথা, জগদ্বন্ধুসুন্দরের উদার ধর্মনীতির সমন্বয়ের কথা। শোনালেন, ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই দেহশুদ্ধি, আর শুদ্ধ দেহে অবিরাম হরিনামের মধ্য দিয়েই পাওয়া যায় শ্রীভগবানের কৃপা, হয় ঈশ্বর দর্শন। স্বামী বিবেকানন্দের পর আরেকবার আমেরিকা আলোড়িত হ'ল ভারতীয় ধর্মের কথায়।

জ্ঞান ও ভক্তি—এই দুই-ই মহানামব্রতের জীবনবেদ—এই দুয়ের পথেই তিনি অগ্রসর হয়েছেন তাঁর সাধন পথে। জ্ঞান অর্জন এবং জ্ঞান বিতরণের মহাব্রত নিয়ে আজও তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, দেশ থেকে দেশান্তর। তাঁর কৃষ্ণকথা বর্ণনার অপূর্ব ভঙ্গী সেই সঙ্গে কৃষ্ণকথার দার্শনিক ব্যাখ্যা শুনে হাজার হাজার মানুষ মুগ্ধ বিস্ময়ে ছুটে আসে তাঁর কাছে। শুধু কৃষ্ণকথা নয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, উপনিষদ্, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতির নতুন অসাধারণ ব্যাখ্যায় তিনি কলিহত জীবনকে শুনিয়েছেন মুক্তির কথা।

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুপ্রভুর নির্দেশিত পথে গুরু মহেন্দ্রজীর ওপর অচলা ভক্তি রেখে তিনি মেতে আছেন সাধন ভজনে। অবিরাম নামজপ করে চলেছেন তিনি। জ্ঞান তাঁর ভক্তিকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে নি। তাই বিভিন্ন গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে অনায়াস হয়েও তিনি কখনই স্বতন্ত্র কোন ধারা সৃষ্টি করেন নি। বরং গুরু এবং আরাধ্য দেবতা প্রভু জগদ্বন্ধুর বাণী এবং আদর্শকেই প্রচার করে চলেছেন অনলসভাবে। সেই আদর্শের মূলকথা, নাম জপ, নাম জপ। ব্রহ্মচর্যের পথে চালিত কর জীবনকে। ভালবাস সব মানুষকে। তবেই আসবে শান্তি এবং শান্তিই মানুষকে নিয়ে যাবে মুক্তির পথে, তার মনে জাগাবে ঈশ্বরচিন্তা। তাঁর কথা, সাধু সঙ্গ কর, এড়িয়ে চল অসৎসঙ্গ। সব সময় মনে কর শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ এবং বন্ধুহরির লীলাকথা। আর সব সময়, সব অবস্থায় করে যাও নাম জপ। তিনি বলেছেন, তোমার কথায় বা কাজে কেহ যাতে কষ্ট না পায় বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সংসার করিয়া চলিবে। কাহারও বেদনার কারণ হইলে নিজেকে অপরাধী জানিয়া ক্ষমার্থী হইবে। ডঃ ব্রহ্মচারী বলেন, অহিংসা, অচৌর্য, শুচিতা, সংযম ও সত্য এই পাঁচের সমাহারেই জাগে মনুষ্যত্ব। নিজে মনুষ্যত্ব লাভ করিবে এবং অপরকে মানুষ হইতে সাহায্য করিবে। ইহাই শ্রেষ্ঠ মানুষ সেবা।

বিলাসিতা বর্জনের কথা তিনি সব সময় বলেন। কিন্তু ওইসঙ্গে বলেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে। কেননা সেটা সাধনের অনুকূল। বলেছেন, আহার-বিহারে সংযমী হতে। আহার-বিহারে অসংযমী হলেই দেহে আসে ব্যাধি। আর সংযমী হলে পরিবার পরিকল্পনার জন্য হাসপাতালের দ্বারস্থ হতে হয় না।

পরমভাগবত মহানামব্রতের জন্ম বরিশালের খলিশাকোটা গ্রামে ১৯০৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর। পূর্বাশ্রমে তাঁর নাম ছিল বঙ্কিমচন্দ্র দাসগুপ্ত। দশ বছর বয়সে প্রভু জগদ্বন্ধুর নাম শুনে আসেন ফরিদপুরের শ্রীঅঙ্গনে। তাঁর দর্শনে। বছর সতের বয়সে পিতৃবিয়োগের পরই তিনি সংসার ত্যাগ করে চলে আসেন আশ্রমে, আশ্রয় নেন জগদ্বন্ধুসুন্দরের প্রদর্শিত বৈষ্ণব ধর্মাদর্শ, ব্রহ্মচর্য, হরিনাম তথা প্রেমধর্মের। মঠের ব্রহ্মচর্যজীবন, কৃচ্ছ্রসাধন, সংযম এবং নানা ধরনের সেবাকাজের মধ্যেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সংস্কৃত ও দর্শনে এম. এ. পাশ করেন কৃতিত্বের সঙ্গে। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পান পি. এইচ. ডি.। পরে অর্জন করেন ডি. লিট. ডিগ্রিও। ১৯৩৮ সালে আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে এলে ফজলুল হক তাঁকে বরিশালে কলেজের অধ্যক্ষ হবার অনুরোধ করলে তিনি সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে ধর্মসাধনা ও ধর্ম প্রচারকেই জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। এবং এখনও তিনি সেই ব্রতাচারীই। মানবসমাজের কাছে তাঁর একটাই শ্লোগান, 'তোমরা মনুষ্যত্ব লাভ কর।' যে মনুষ্যত্ব লাভ করেছে সেই পারে সমাজকে কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে।... মানবধর্মই সর্বধর্মের সারমর্ম। এরই নাম সনাতনধর্ম।... আগে ভাল মানুষ হও, ভদ্র হও—তারপর তুমি জ্ঞানী হও, কর্মী হও, ভাল হও।'

—পরিব্রাজক। 'যুগান্তর' পত্রিকার সৌজন্যে।

মহামহোপাধ্যায় ভাগবত গঙ্গোত্তরী ড. ব্রহ্মচারীজির বর্তমান ঠিকানা ও তাঁহার লিখিত ধর্ম গ্রন্থাদির প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ও মহানাম প্রচার সমিতি।

শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন, রঘুনাথপুর, ভি. আই. পি. রোড! কলিকাতা-৭০০ ০৫৯,

ফোন : ৫৫৯-৪৪৬৬

ব্রহ্মচারীজির লিখিত অমূল্যগ্রন্থ—শ্রীমদ্ভাগবত, গীতাধ্যান, উপনিষদ্ ভাবনা, বৈষ্ণব বেদান্ত, ঈশ্বর নাই! ঈশ্বর আছেন!!, উদ্ধব সন্দেশ, গৌর কথা, চণ্ডীচিন্তা, ব্রহ্মগায়ত্রী, ব্রহ্মচর্য, মানবধর্ম ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করে ধন্য হোন।